উত্তরসূরী

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি অপ্রকাশিত ছড়া ॥ দুখানি প্রাচীন বাংলা পত্রিকার খণ্ড প্রতিলিপি ॥ রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপি ॥

অন্নদাশংকর রায় : আত্মচিন্তা, সত্য বিশ্বাস ও শিল্পদৃষ্টি ॥ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : একালের কয়েকটি সাময়িক পত্র ॥ সুনীল মুখোপাধ্যায় : রাষ্ট্র ও শিল্পী ॥ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী : কথাটের দাসকুটমতবাদ ও দর্শন ॥

অমিয় চক্রবর্তী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, বটকৃষ্ণ দাস, পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য, আলোক সরকার, চিত্ত ঘোষ ও তরুণতরদের কবিতা ॥

জিতেন্দ্রমোহন সেন ও প্রফুল্ল দাস কর্তৃক সংগীত আলোচনা ॥ একাধিক বিদেশী কবিতার অনুবাদ ॥ সমালোচনা সাহিত্য ও আলোচনা ॥

ষষ্ঠ বর্ষ নব পর্যায় প্রথম সংখ্যা

কার্তিক-পৌষ ১৩৬৫

উত্তরসূরী

ষষ্ঠ বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা ॥ কার্তিক-পৌষ ॥ ১৩৬৫

একটি অপ্রকাশিত ছড়া : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ১ ॥

দুখানি প্রাচীন বাংলা পত্রিকার খণ্ড প্রতিলিপি

প্রবন্ধাবলী :

সুনীল মুখোপাধ্যায় : রাষ্ট্র ও শিল্পী । ৭ । নরগোপাল সেনগুপ্ত : একালের কয়েকটি সাময়িক পত্র । ১৯ । অন্নদাশঙ্কর রায় : আত্মচিন্তা, সত্য বিশ্বাস ও শিল্পসৃষ্টি । ৩৫ । অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় : কবি-পরিচিতি । অরুণ মিত্র : । ৪০ । যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী কর্ণাটে'র দাসকূট মতবাদ ও দর্শন । ৪৯ ।

কবিতাবলী

অমিয় চক্রবর্তী অরুণ মিত্র রাম বসু আলোক সরকার কল্যাণ সেনগুপ্ত অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় চিত্ত ঘোষ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অরুণ ভট্টাচার্য (২৫-৩৪) ॥ সঞ্জয় ভট্টাচার্য বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত নবেন্দু চক্রবর্তী পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য মানস রায়চৌধুরী সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায় বটকৃষ্ণ দাস কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (৫৫-৬৭) ॥

সমালোচনা সাহিত্য

কয়েকটি কবিতার বই : কমলেশ চক্রবর্তী ॥ পূর্ববাংলার সমকালীন সেরা গল্প : সুধীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ॥ (৬৮-৭৮)

বিদেশী কবিতা

ভিয়েৎনামের লোক কবিতা : বটকৃষ্ণ দে ॥ আরবী কবিতা : আবদুস সাত্তার ॥ পুশকিন : বিনয় মজুমদার (৭৯-৮১)

শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গ

রাগসঙ্গীতে ঘরোয়ানার বৈশিষ্ট্য জিতেন্দ্রমোহন সেন ॥ রবীন্দ্রসংগীতে রাগ-প্রয়োগ : প্রফুল্লকুমার দাশ

স্বরলিপি

রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বরলিপি : অনাদিকুমার দস্তিদার

আলোচনা

প্রাচীন বাংলা পত্রিকা : যূথিকা গুপ্ত

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৯বি-৮ কালীচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা ২

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য

অনেক কৃতী ছাত্র



মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখিয়া সুস্থমনে পড়াশুনা করিবার জন্য

বাথগেটের ক্যাষ্টর অয়েল

ব্যবহার করিয়া বিশেষ সুফল পাইয়াছেন। ইহার নিয়মিত ব্যবহার, চুলের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করে।

BATHGATE & CO., LTD.
17-19, OLD COURT HOUSE ST.
CALCUTTA-1

UPCO-B

উত্তরসূরী

৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা ॥ কার্তিক-পৌষ ॥ ১৩৮৭

অবনীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত ছড়া

[অবনীন্দ্রনাথের সাধনার তিনটি ধারা পাশাপাশি লক্ষ্যণীয়। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় যদিও এদেশে ও বহির্ভারতে সর্বাগ্রে স্বীকৃত, তথাপি তার শিল্পচেতনা ও পাণ্ডিত্যের কথা বাঙালী পাঠকের কাছে অজ্ঞাত নয়—তাঁর বাগীশ্বরী প্রবন্ধাবলী শুধু শিল্পজিজ্ঞাসা কেন, নন্দনতত্ত্বের মুখবন্ধ ও অবশ্যপাঠ্য বই হিসেবে উত্তরকালেও সমাদৃত হবে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের আরও এক মহৎ পরিচয় আমরা তার জীবনের শেষ অংকে পেয়েছি যখন তিনি বয়সনির্বিশেষে সকলেরই অবন ঠাকুর। তার রচিত অজস্র শিশু সাহিত্য যেমন চিরন্তন রসের যোগানদার তেমনি তার বিভিন্নমুখী প্রতিভারও নিশ্চিত স্বাক্ষর। নানা প্রদেশের ছড়া রূপকথা উপকথার সঙ্গে তার জীবনের নিগূঢ় যোগাযোগের কথা আমাদের অজানা নয়। তাছাড়া বাংলাদেশের শিল্পসাহিত্যের ঐতিহ্যে তাঁর আস্থা শেষ জীবন পর্যন্ত ফলবতী ছিল। এই বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগেও যাত্রা লিখবার দুঃসাহস তাঁর ছিল—একমাত্র তাঁরই ছিল। বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত রচনাটির কোন নামকরণ তিনি করে যাননি। নানা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রচনার মধ্য থেকে, প্রায় খসড়া হিসেবেই, লেখাটিকে উদ্ধার করা হয়েছে। এটিকে ছড়াজাতীয় রচনা বলেই মনে হয়, যদিও তা সম্ভবত লোকগীতির মেজাজে পরিকল্পিত। নৃত্যগীতের আভাষ রয়েছে এবং কথোপকথনের মধ্য দিয়ে যে নাটকীয় রসের অবতারণা আছে তাও উপেক্ষণীয় নয়। কয়েকটি বানান্ সম্বন্ধে পাঠকদের সচেতন হতে বলি যেখানে তিনি কথ্যভাষায় যথাযথ উচ্চারণভঙ্গি বজায় রেখেছেন। সঃ উত্তরসূরী]

একটি অপ্রকাশিত ছড়া : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(মাদোল) ও একরত্তি চাঁদের কোনা
দিনে দিনে বাড়িলোরে
দিনেকে দিনে
দিনে দিনে
ঘরের পাশে
পিপুল চারা
সে তারে চিনে
দিনেকে দিনে।
বাড়লো শোভা
মনোলোভা
যেন নতুন ধানের
চিকণ চাউল
দিচ্ছে আভা।
চাঁদের রূপ ঝলে
আকাশ তলে
নদী জলে
বনের ধারে
পথের শেষে।

(বাঁশী) মরি মরি রাতের দেবা
রাতারাতি গড়তেছিল
এই পুতলী।
আসতে দিবা
আদুল গায়ে
জড়িয়ে দিল
নীলাম্বরী
তাড়াতাড়ি।
ঘুমঘোরে বা

একটি অপ্রকাশিত ছড়া

ভুল করে বা
রং ধরানো
এমন নীলি
কাজলনীলি
উজলনীলি।

পুরুষ : আরে না জানি নীল পাহাড়ে
কোন সে বনে
কেমনতরো ফল ধরেছে
কোন বা গাছে।

মেয়ে : না জানি নদীর চরে
বালির তলে
কেমন ধারা
জল চলেছে
কোন খানেতে
কিবা আছে
পাথর চাপা।

(মাদোল) ভালো মন্দ কালো সুন্দর
মিঠা তিতা ফল ফলেছে
জল চলেছে রকম রকম।

পাখী কওতো মিষ্টি কথা—
পাহাড়তলীর
এ কোন্ গাঁয়ের
মিষ্টি কথা কও
জানিয়ে দিয়ে যাও
কোথায় এমন পাও
মিষ্টি বুলি
অ বুলবুলি
বলে দিয়ে যাও
কমনে তুমি রও

মিষ্টি লতার
বুলবুলিটি
মিষ্টি কথা কও।

মেয়ে : আরে জানতে যদি পাই
তোমার দেশের
মিষ্টি কথা
শিখতে চলে যাই।

পুরুষ : বলতো একটি কথা
(মাদোল) মনের মতন
একটি কথা

মেয়ে : বনের টিয়া
বন ছাড়িয়া
চলতেছে উড়ে
মাঠে হোতে
ধানের ঝরি
আনতেছে তুলে।

(বাঁশী) রাঙা ঠোঁটে চুরি করে।

পুরুষ : মানস করি
ডানা মেলে
অমনি করেই
উড়ে পড়ি
তোমার পাশে
এই বাতাসে
উড়িয়ে চলি
ধানের ঝরি।

(মাদোল) নতুন নতুন ধানের ঝরি

মেয়ে : আমার ছাঁওয়া
আমার আগে

একটি অপ্রকাশিত ছড়া

তোমার ছাঁওয়া
তোমার পাছে
এমনি করেই চলতে আছে
মিলতে মানা কাছে কাছে।

পুরুষ : ছাঁওয়া আমার
ধুলায় পড়ে
ছাঁওয়া তোমার—

(মাদোল) মিলতে মানা কাছে কাছে
ছাঁওয়ায় ছাঁওয়ায় পাশে পাশে।

পুরুষ : হাটের বাটে
চলে ছাঁওয়া

মেয়ে : নদীর জলে
টলে ছাঁওয়া।

(বাঁশী) যায় যায় ফিরে চায়
পায় পায় ফিরে যায়
দূরে দূরে দূরে!

মেয়ে : নতুন কলস নয়ন জলে
ভরে নিলেম

পুরুষ : ময়না কাঁটার মালা বুকে
দুলিয়ে নিলেম।

সকলে : রাতের কোকিল পালিয়ে চলে
রাত থাকিতে
আমাদেরও চলতে হল
ধান কাটিতে
চাল ঝাড়িতে।

(বাঁশী) মরি মরি মনের খেদে
চান্নি রাতে কেঁদে মরি।
মউলি পাতার

বাস লাগিল
মনের দুঃখ
কইতে নারি।

পুরুষ : চলনা পালিয়ে চলি !
হাতে হাতে সাথে সাথে
একলা বাটে একলা চলি !

মেয়ে : সরবে খেতের নতুন পাতায়
পায়ের চিনা রাখবে ধরে।
নদী পারের ভিজে কাদায়
চলার চেনা রইবে পড়ে।
লুকিয়ে যাবো কেমন করে ?

পুরুষ : যদি যাও একলা রেখে
মরিব।

মেয়ে : মরিব মুখ না দেখে।

পুরুষ : দেখি দেখি এল নাকি
মোনাল পাখী।
মনের বনে বাসা নিল কি
বন লতায় মোনাল পাখী ?

(শেষ)

চোখের পাতা কাঁপছে যেন
বাঁশ পাতাটি ধীর বাতাসে।
মাদার ফুলের রং লেগেছে
হাসি মুখের হাসির পাশে।
নীল আকাশে ঢেউ দিয়েছে
রাতারাতি একরত্তি।

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রকাশিত। অবনীন্দ্রনাথের এই অপ্রকাশিত রচনাটি উদ্ধারকার্যে ও সম্পাদনায় শ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শ্রীসনৎকুমার গুপ্তও আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

সঃ উত্তরসূরী।

রাষ্ট্র ও শিল্পী

সুনীল মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর ভারতীয় রাষ্ট্র গত দশ বারো বছরের মধ্যে সাহিত্য চিত্রকলা সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় উদ্যোগী হয়েছেন। এই রাষ্ট্রিক পৃষ্ঠপোষকতাকে সাহিত্য অথবা সঙ্গীত নাটক একাডেমীর মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানগত রূপ দেওয়ার চেষ্টাও হয়েছে। এই প্রচেষ্টার ফলাফল সম্পর্কে অনেকেই নানারূপ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এই সমস্ত ব্যাপারে একটা বিসদৃশ জিনিষ সহজেই চোখে পড়ে; সেটা হ'চ্ছে এই যে রাষ্ট্রের যাঁরা কর্ণধার তাঁদের মনে এই ধারণা আসা স্বাভাবিক যে সাহিত্য শিল্প সঙ্গীতের বিচারে তাঁদের একটি স্বাভাবিক দক্ষতা আছে। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধারণার প্রকৃত কোন ভিত্তি নেই। জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে শিল্পীরা যখন রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভে ইচ্ছুক হ'ন, তখনই রাষ্ট্রের কর্ণধারদের সাহিত্য শিল্প সম্পর্কে অজ্ঞতার একটা প্রভাব শিল্প-কর্মের উপর এসে পড়তে বাধ্য। এর ফল অবশ্যই মারাত্মক, যথার্থ শিল্প বিচারের ক্ষমতা যে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকদের নেই তা ইতিমধ্যেই সঙ্গীত নাটক অথবা সাহিত্য একাডেমীর কার্যকলাপের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার আর একটি কুফল এই যে শিল্পীরা তাঁদের কঠিন নিরলস ও নিঃসঙ্গ সাধনার ক্ষেত্র থেকে সরে এসে অশিল্পীজনোচিত ব্যবহারের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। উপরোক্ত আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রের সঙ্গে শিল্পের কিরূপ যোগাযোগ থাকা উচিৎ, এই সমস্যার একটি দিকের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা।

কিন্তু এই সমস্যার আরও কতগুলি দিকে আছে যে গুলির গুরুত্ব সমধিক। রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে বৃহত্তর সমাজের একটি অংশ মাত্র। এই সমাজের দ্বারা স্বীকৃত জীবনদর্শনের ও মূল্যবিচারের প্রতিফলন আমরা রাষ্ট্রের সংগঠন, রাষ্ট্র কর্তৃক অনুসৃত মূলনীতি ও রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কার্যকলাপের মধ্যে দেখতে পাই। শিল্পীরাও এই বৃহত্তর সমাজ-বহির্ভূত কোন জগতে বাস করেন না।

সুতরাং তাঁদের শিল্পকর্মের মধ্যেও সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত জীবনদর্শন ও মূল্য-বিচারের প্রতিফলন পরিলক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক। মনুষ্য জীবন, মনুষ্য প্রকৃতি, মানুষের করণীয়, বিশ্বপ্রকৃতিতে ও মানবসমাজে মানুষের স্থান ইত্যাদি সম্পর্কে প্রত্যেক সমাজেরই কতগুলি বিশিষ্ট নিজস্ব ধারণা ও আদর্শ থাকে। এগুলি সমাজে সর্বজনস্বীকৃত হওয়ার দরুণ প্রায় স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মর্যাদা লাভ করে। মানুষ যেমন জীবিতকালের প্রতিমুহূর্তেই নিশ্বাসের সঙ্গে বাতাস গ্রহণ করে তেমনই শৈশব ও যৌবনে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সমাজে সর্বজনস্বীকৃত ধারণা ও আদর্শগুলি মানুষের চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তি, কল্পনা ও স্বপ্নের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িয়ে যায়।

কিন্তু তাই যদি হয়, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, যুক্তিশীলতা, কল্পনা বাস্তবিকই যদি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কঠিন শাসনের উর্দ্ধে উঠতে অপরাগ হয়, তাহলে স্বভাবতই এই প্রশ্ন ওঠে যে নতুন চিন্তা, নতুন জীবনাদর্শ, প্রাকৃতিক শক্তিকে সামাজিক উপযোগে প্রযুক্ত করার নতুন নতুন কৌশল, মানবজীবনের উদ্দেশ্য ও মূল্য সম্পর্কে নানা অভিনব স্বপ্ন প্রভৃতির উদ্ভব হয় কি প্রকারে বা সামাজিক প্রগতি ও বিবর্তনই কি প্রকারে সম্ভব? এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে সর্বাগ্রে মনে রাখা দরকার যে এমনতর বহু সমাজ ও সভ্যতার নিদর্শন ইতিহাসে মিলবে দীর্ঘ শতাব্দী ধরে যারা নিজেদের অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখতে সক্ষম হলেও, যাদের মধ্যে বিবর্তনের অথবা প্রাণচাঞ্চল্যের কোন লক্ষণ দেখা যায় নি। নীল নদের তীরবর্তী নিতান্ত প্রতিকূল ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্ম হয়, এবং এই সভ্যতার প্রথম কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস একটি বিপুল সৃজনীশক্তি ও নবনবোন্মেষশালিনী যৌথ সামাজিক প্রতিভার দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল। কিন্তু তার পরেই এই মিশরীয় সমাজই এমন একটি জড়ত্বের অভিশাপগ্রস্ত অচলায়তনে পরিণত হল যে সুদীর্ঘ দু'হাজার বছর ধরে আর এই সমাজে বিবর্তনের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না, নতুন চিন্তা বা কর্মের প্রয়াস পর্যন্ত সেখানে নিঃশেষে অবলুপ্ত হল। এ্যাসিরীয় পারসিক হিব্রু চৈনিক গ্রীক বা রোমক সমাজের ইতিহাসে এই একই ধারার পুনরাবৃত্তি আমরা লক্ষ্য করতে পারি। কয়েক শতাব্দীর বিপুল বেগবান সৃষ্টিমুখর প্রাণশক্তির উচ্ছ্বাস আর তারপরেই মৃত ঐতিহ্যের রোমন্থনের মধ্যে অপমৃত্যু।

এই কারণে সমাজে প্রাণশক্তি ও সৃষ্টি ক্ষমতা সজীব থাকে কোন কোন অবস্থার মধ্যে, তাই নিয়ে বর্তমানকালে সমাজবিজ্ঞানীরা নানামুখী অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন। যে সকল সমাজে সমাজের সর্বজনস্বীকৃত জীবনাদর্শ, রীতি নীতি, ও মূল্যবিচারকে ব্যক্তি মানুষের প্রশ্ন করার এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তিশীলতার ভিত্তিতে তাদের অমান্য করার অধিকার এবং ব্যক্তিমানুষ কর্তৃক নতুন নতুন জীবনাদর্শ রূপায়নের দুঃসাহস মোটামুটি স্বীকৃত হয়, সেই সব সমাজেই মানুষের সৃষ্টিশীলতা সজীব ও অক্ষুণ্ণ থাকে। এই সকল সমাজে রাষ্ট্রের প্রভাব ও কর্মকাণ্ড একটি সংকীর্ণ চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। এর কারণ এই যে আমরা দেখেছি ব্যক্তিমানসের উপর সমাজের প্রভাব প্রায় দূরপনেয়; এর সঙ্গে যদি রাষ্ট্রের শাসন ব্যক্তিমানুষের স্বাধীন চিন্তাকে খর্ব করতে উদ্যোগী হয়, তাহলে মানুষের সৃজনী প্রতিভার অপমৃত্যু প্রায় অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে পড়ে। সেই জন্যই আমাদের দেশে সাম্প্রতিক কালে রাষ্ট্র কর্তৃক সাহিত্য সঙ্গীত চিত্রকলা প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতাকে প্রত্যেক যথার্থ শিল্পীর—তা তিনি সাহিত্যিকই হোন বা সঙ্গীতকারই হোন, চিত্রশিল্পী বা ভাস্করই হোন—সযত্নে পরিহার করে চলা প্রায় অবশ্য কর্তব্য। কারণ পৃষ্ঠপোষকতার অন্তরালেই রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের দণ্ড উদ্যত থাকে। আমাদের একথা স্মরণ রাখা দরকার যে বৃটিশ শাসনের আঁওতায় রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতিরেকেই ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বংলা দেশে, সাহিত্য ও শিল্প প্রতিভার এক বিস্ময়কর অভাবনীয় পরিস্ফুরণ সম্ভব হয়েছিল।

তাছাড়া এ সম্পর্কে আমাদের আরও একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। ভারতীয় সমাজ উপরিবর্ণিত একদা জীবন্ত কিন্তু অধুনা মৃত সভ্যতাগুলির অন্যতম নিদর্শন। এই সমাজে ব্যক্তিমানুষের পক্ষে সামাজিক অনুশাসনকে মেনে নেওয়াই স্বাভাবিক; সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ এ সমাজে অনন্য সাধারণ ব্যতিক্রম মাত্র। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিদ্রোহীদের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব ছিল এতই প্রখর ও প্রবল যে ভারতীয় সমাজ তাঁদের অবহেলা করতে পারেনি, কিন্তু নানা সূক্ষ্ম, পরোক্ষ উপায়ে সামাজিক রীতিনীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধের উপর তাঁদের প্রভাবকে শক্তিহীন করতে সমর্থ হয়েছে। Non-Conformity ভারতীয় সমাজে বরাবরই অপাংক্তেয় বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় অভ্যুত্থানের সুযোগ নিয়ে

নানাপ্রকারের non-conformity কিছু কিছু মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতা অর্জিত হবার পর তাদের অধিকাংশেরই অবলুপ্তি ঘটেছে। সামাজিক অচলায়তনকে এখন ভারতের বর্তমান রাষ্ট্র নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করবার চেষ্টায় ব্যাপৃত। সাম্যবাদী দল প্রমুখ যে সমস্ত রাজনৈতিক সংস্থা অদূর ভবিষ্যতে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের জন্য সচেষ্ট তারাও যেহেতু non-conformityর ঘোরতর পরিপন্থী, সেহেতু তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করতে সমর্থ হলে, সামাজিক অচলায়তনের শক্তি বহুগুণে বর্দ্ধিত হবে। বরঞ্চ যেহেতু এই সকল দল ডিক্টেটরী শাসনের দ্বারা পরিচালিত অর্থনীতিক পরিকল্পনায় বিশ্বাসী, সেহেতু বর্তমান রাষ্ট্রের শাসনে যতটুকু স্বাধীন চিন্তার অবকাশ আছে, ততটুকুও উপরোক্ত রাজনৈতিক দল সমূহের দ্বারা শাসিত রাষ্ট্রে অবশিষ্ট থাকবে না। সাম্যবাদী চীনের ক্ষেত্রে এই সত্যের একটি সাম্প্রতিক নিদর্শন আমাদের চোখের সামনে রয়েছে; হয়ত শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে যে চীনে সাম্যবাদী নেতৃত্বে প্রাচীন নৈতিক সভ্যতাই নবকলেবর ধারণ করবে মাত্র।

এত গেল ভবিষ্যতের কথা। বর্তমান কংগ্রেসী শাসনের আওতায় পরিবর্দ্ধিত সমাজ ও রাষ্ট্রের চেহারাটাও আমাদের একটু তলিয়ে পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য। আপাতদৃষ্টিতে আধুনিক ভারতীয় সমাজে স্বাধীন চিন্তা, কল্পনা ও উদ্যমের অপর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে এই সমাজে চিন্তার গতানুগতিকতা, কল্পনার দৈন্য ও সামাজিক উদ্যমের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, তার কারণ বোধ হয় উপরোক্ত সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অমোঘ প্রভাব। এবং এই কারণেই বোধ হয় উইণ্ডহাম লিউইস্ তাঁর "The Writer and the Absolute" নামক গ্রন্থে আধুনিক ভারতীয় সমাজকে "closed society"র অন্যতম নজির হিসেবে গ্রহণ করেছেন। লিউইস্ এর মতের স্বপক্ষে কিছু কিছু কারণ আগেই দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। দুঃখের বিষয় বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সমাজের একক বিদ্রোহী চিন্তানায়ক মানবেন্দ্রনাথ রায় স্বকীয় non-conformist চিন্তাধারার প্রবর্তন করে গেলেন, সেই চিন্তাকে পরিবর্দ্ধিত ও সম্প্রসারিত করবার বিশেষ কোন চেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। যাঁরা মানবেন্দ্রনাথের এই চিন্তাকে পরিবর্দ্ধিত ও সম্প্রসারিত করতে পারতেন, তাঁরা ভারতে সাম্যবাদী ডিক্টেটরী শাসনের সম্ভাবনার মূলোচ্ছেদ করবার কাজে

এতই ব্যস্ত যে বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রকে মন্দের ভাল হিসেবে তাঁরা আঁকড়ে ধরতে চাইছেন। তার ফলে তাঁদের চিন্তা ও কল্পনার মধ্যে যে স্বকীয়তা ও দুঃসাহস ছিল তা ইদানীন্তন স্তিমিত হয়ে এসেছে। তাঁদের চিন্তা ও ভাবনাতেও ভারতীয় সমাজের সর্বগ্রাসী ব্যাপক ও প্রবল conformist আকর্ষণের প্রভাব ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, যদিও এই প্রভাব এখন পর্যন্ত তাঁদের চিন্তার রাজনৈতিক স্তরে সীমাবদ্ধ হ'য়ে রয়েছে। বলা বাহুল্য বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী যে cold war চলেছে, আদর্শ ও চিন্তার দিক থেকে তার প্রভাব ভারতীয় সমাজের জড়ত্বকেই শক্তিশালী করছে এবং ভারতীয় সমাজে নতুন চিন্তা ও কল্পনার সম্ভাবনাকে সুদূরপরাহত করে তুলছে। রাষ্ট্রের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত, শিল্পীদের প্রতি রাষ্ট্র ও সমাজের কিরূপ ব্যবহার কাম্য, রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি শিল্পীদের মনোভাবই বা কিরূপ হওয়া উচিত ইত্যাদি প্রশ্নগুলি অতিশয় জটিল। এগুলির রাজনৈতিক সরলীকরণের ফলে সমস্যাগুলির গুরুত্বকেই হয়ত লাঘব করা হবে। রাষ্ট্রের totalitarian সংগঠন মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা হরণ করে মানুষকে রাষ্ট্রের ক্রীড়নকে পরিণত করবে; এইরূপ সমাজ কখনই শিল্পীর কাম্য হতে পারে না, কারণ এই ধরণের সমাজ শিল্পীর প্রতিভার পরিস্ফুরণের পরিপন্থী হবে; সুতারং এই ধরণের সমাজ প্রবর্তনের প্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে বাধা দেওয়া শিল্পীর অবশ্যকর্তব্য—এই প্রকারের সরল যুক্তির যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। প্রথমেই বলা যেতে পারে যে শিল্পীর দ্বারা উপরোক্তরূপ রাজনীতিক মতবাদ ও কার্যক্রমকে সচেতনভাবে পোষণ ও অনুসরণ হয়ত শিল্পীর যে বিশেষ সৃষ্টির কাজ তাকে ব্যাহত করবে। কারণ প্রত্যেক রাজনীতিক মতবাদ, আদর্শ ও কার্যক্রমই শিল্পীর দৃষ্টির পরিধিকে সংকীর্ণ করে আনে এবং শিল্পীজনোচিত অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা ও প্রসারকে ক্ষুণ্ণ করে। গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য যে anti-totalitarian সংগ্রাম, তাতে শিল্পীদের অংশগ্রহণ করার পরামর্শ হয়ত সুপরামর্শ নাও হতে পারে। কারণ শিল্পীর যা প্রধান কাজ তা হচ্ছে শিল্পসৃষ্টি এবং এই কাজের জন্য প্রয়োজন অখণ্ড মনোযোগ, কঠিন পরিশ্রম আর সর্বপ্রকার বিদ্বেষমুক্ত স্বচ্ছ মর্মভেদী অন্তর্দৃষ্টি।

তাছাড়া রাষ্ট্র ও শিল্পীর পারস্পরিক সম্পর্কের উপরোক্ত রূপ রাজনৈতিক

সরলীকরণের আর একটি কুফল আছে। এই ধরণের সরলীকরণের ফলে আমরা অনেক সময় ভুলে যাই যে totalitarian রাষ্ট্রে শিল্পীর প্রতি যে অবিচার করা হয়, সেই ধরণের অবিচার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও একেবারে অসম্ভব নয়। বিভিন্ন totalitarian রাষ্ট্রে দেখা যায় যে অনেক সময় রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে শিল্পীর কণ্ঠরোধ করা হয়। যেমন রাষ্ট্রের নির্দেশে রাষ্ট্রের বিরাগভাজন সাহিত্যিকের রচনা প্রকাশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হতে পারে। অনেক সময় totalitarian জীবনযাত্রার প্রতি গভীর বিরাগবশত সাহিত্যিক ও কবি ধীরে ধীরে নীরব হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও এমন হতে পারে যে পাঠক সমাজের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এভাবে যুক্ত থাকতে পারেন যে, কোন দলের নির্বাচনী সংগ্রামে পরাজয়ের ফলে পাঠকসমাজের যে অংশ ঐ রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করতেন, সেই অংশ তাকে সমর্থন না করে ভিন্ন একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে গেলেন। এর ফল কিন্তু পরাজিত দলের সমর্থক লেখকের পক্ষে মারাত্মক ; কারণ যে পাঠকসমাজের কাছে তাঁর রচনার সমাদর ছিল সেই পাঠকসমাজ এখন অন্যদলভুক্ত কোন সাহিত্যিকের অনুরাগী হ'য়ে পড়েছেন। পাঠকসমাজের সঙ্গে সাহিত্যিকের এই বিচ্ছেদ কিন্তু সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক কারণপ্রসূত ; সাহিত্যিক মূল্যবিচারের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। **The Writer and the Absolute** গ্রন্থে উইণ্ডহাম লিউইস্ বলেছেন যে ফ্রান্সের অনেক শক্তিমান প্রতিভাশালী লেখককে এই ভাবে নীরব হ'য়ে যেতে হয়েছে। ইংলণ্ডেও দেখা গেছে যে ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত ফ্যাসিবিরোধী রুশ সমর্থক মনোভাবের প্রসারের দরুণ বহু সাহিত্যিক ও কবিকে অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে কালাতিপাত করতে হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে শিল্পীর প্রতি রাষ্ট্রের ব্যবহার সম্পর্কিত সমস্যার সঙ্গে নানারূপ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্ন জড়িত। দেশের সংস্কৃতি ও সমাজের অবস্থাই রাষ্ট্রের গঠন ও আদর্শ নির্ধারিত করে। এই কারণে শিল্পীকে সমাজ যেরূপ মর্যাদা দেয় রাষ্ট্রও শিল্পীকে ততটুকুই মর্যাদা দেবে, আবার শিল্পীর প্রতি রাষ্ট্রের সম্মানজনক ব্যবহার বহুলাংশে শিল্পীর সততা নিষ্ঠা ও চিন্তার বলিষ্ঠতা ও স্বকীয়তার উপর নির্ভর করে। এমনকি শিল্পী তাঁর চিন্তা ও ব্যবহারের দ্বারা রাষ্ট্রের আদর্শ ও রীতিনীতিকেও প্রভাবিত করতে পারেন। ভারতবর্ষে

রাষ্ট্র ও শিল্পী

বিশেষ ক'রে এখন রাষ্ট্রের ব্যবহার ও রীতিনীতি ভারতীয় শিল্পীর পক্ষে একটা সমস্যা নয়। যেটুকু সমস্যা আছে সেটুকু শিল্পীরই সৃষ্টি, কেননা বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্র শিল্পীদের যে পৃষ্ঠপোষকতা সুরু করেছেন তাকে অগ্রাহ্য করলেই এই সমস্যার সমাধান সহজেই সম্ভব হতে পারে। উপস্থিত ভারতবর্ষে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্যে শিল্পী সাহিত্যিকদের দলবদ্ধ প্রচেষ্টার বোধ হয় বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই। তার থেকে শিল্পী সাহিত্যিকেরা যদি চিন্তার বলিষ্ঠতা অর্জনে, আঙ্গিকের উৎকর্ষ বিধানে ও অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা সাধনে আপনাদের মনোযোগ ও পরিশ্রম নিয়োজিত করেন, তাহলেই শিল্পীর প্রতি রাষ্ট্রের ব্যবহার সম্পর্কিত সমস্যার মূলগত প্রশ্নগুলির সমাধান সহজ হবে। বিশেষ করে ভারতবর্ষের সামাজিক অচলায়তনের দার্শনিক ও ভাবগত ভিত্তিকে দুর্বল করার কাজে যদি তাঁরা অগ্রসর হ'তে পারেন, তাহলে ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্য অতিশয় উপকৃত হবে। এই অচলায়তনকে নাড়া দেওয়ার অর্থ প্রচলিত দার্শনিক চিন্তা ও সামাজিক আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা এবং সমাজের সব কিছুকেই মেনে-না-নেওয়ার সৎসাহস অর্জন করা।

এই মেনে-না-নেওয়ার কাজটি খুব সামান্য নয় এবং এর ফলাফলও খুব দূরপ্রসারী। এর সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্যের কতগুলি বড় অভাবের কারণ জড়িত। বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার দারিদ্র্য সর্বজনবিদিত। সামাজিক কারণপ্রসূত অদৃষ্টবাদ আমাদের চিন্তাভাবনার সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গেছে যে সাহিত্যেও এর প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী। সাহিত্য সমালোচনার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সাহিত্যকর্মের ও সাহিত্যরসাস্বাদের উৎকর্ষ বিধান। কিন্তু যে সমাজে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উন্নতি ও শুভ পরিবর্তনের সম্ভাবনা মাত্র অন্তর্হিত হয়েছে, সে সমাজের মানুষের পক্ষে ভাল মন্দ, সুন্দর অসুন্দর, কল্যাণ অকল্যাণ, সব কিছুর প্রতিই সুগভীর ঔদাসীন্য বিধানের আশাই হচ্ছে জ্ঞানার্জনে উৎসাহের উৎস। এই আশার দ্বারা অনুপ্রাণিত না হলে, সব কিছুকে বিশ্লেষণ করবার, সব কিছুর কারণ অনুসন্ধান করার, সর্ববিধ সমস্যা ও প্রশ্নের নিরসন করার তাগিদ সামাজিক মানুষ বোধ করে না। তাই যে কারণে আমাদের দেশে বিজ্ঞান অনগ্রসর, ঠিক সেই কারণে সাহিত্য সমালোচনাও আজ পর্যন্ত তার শৈশব অতিক্রম করতে পারল না; যতদিন মানুষ বাঁচবে ততদিন সে কিছু না কিছু সাহিত্য রচনা

করবেই, আবার কিছু না কিছু লোক এই সাহিত্য পাঠ করবেই। এর ভেতরে যে কোন সমস্যা আছে তা আমাদের সুগভীর হতাশাপ্রসূত আলস্য জানতেই দেয় না। একথা বিশদ করে বলবার প্রয়োজন নেই যে সমাজে যখন উন্নতি-বিধানের সর্ববিধ আশা অন্তর্হিত, তখন রূঢ় বাস্তবকে মেনে নেওয়াই উৎকৃষ্ট পন্থা কিন্তু মেনে নেওয়ার মানে বিশ্লেষণ করার এবং কারণ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টাকে বর্জন করা। এবং এই মেনে নেওয়ার অভ্যাস থেকেই আমাদের সমালোচনা সাহিত্যের দারিদ্রের উদ্ভব, যেমন এর থেকেই উদ্ভূত হয়েছে আমাদের দেশে ব্যক্তিপূজার উৎকট ও অশোভন আতিশয্য। আমাদের সাহিত্যে সমালোচনার নামে ব্যক্তিপূজার প্রাদুর্ভাবের কথা সকলের বিদিত।

কিছুকাল আগে জনৈক খ্যাতনামা বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক জনৈক বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে সখেদে বলেছিলেন যে পশ্চিমী উপন্যাসের ব্যাপকতা ও গভীরতা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে অনুপস্থিত। এর কারণও বোধ হয় আমাদের সাহিত্যিকদের মেনে নেওয়ার অভ্যাস। কিছুকাল যাবৎ আমাদের সমাজের ফিউদাল সংগঠন ও কাঠামোকে ভেঙ্গে শিল্পায়নের ভিত্তিতে একটি আধুনিক প্রগতিশীল সমাজ সৃষ্টির চেষ্টা চলেছে। এই প্রচেষ্টা বেশ কিছুদূর অগ্রসরও হয়েছে। এবং এর ফলে আমাদের সমাজের শ্রেণীগত সংগঠনেও কিছু আলোড়ন ঘটেছে। এই আলোড়নের সংগে সংশ্লিষ্ট বহু নরনারীর চরিত্রে, ভাবনায়, চিন্তায়, ব্যবহারে, জীবনের মূল্যায়নে অবশ্যই কিছু পরিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটছে। অথচ সমাজের, ব্যক্তিচরিত্রের ও ব্যক্তিমানসের এই পরিবর্তনের কোন বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ আলেখ্য আমাদের উপন্যাস সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যাবে না। এর কারণ মনে হয় এই যে আমরা যেমন ফিউদাল সমাজব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছিলাম, ঠিক তেমনিই এই সমাজব্যবস্থার রূপান্তর ও অন্তর্ধানকেও আমরা মেনে নিচ্ছি;— এই সামাজিক আলোড়নকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখবার, এর প্রকৃত মানবিক চেহারাটিকে আবিষ্কার করার কোন তাগিদ আমরা বোধ করছি না। অর্থাৎ এই সামাজিক রূপান্তরের ফলে আমাদের সমাজে প্রাণসঞ্জিবনী নবীন কোন আশার সঞ্চার হচ্ছে না, সেই একই অদৃষ্টবাদী মনোবৃত্তি নূতন এক সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করে যাচ্ছে মাত্র; এই একই কারণে বোধ হয় ইউরোপের ইতিহাসে নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যেও নানা নতুন চিন্তাভাবনা

ও আদর্শের যে নাটকীয় সংঘাত পরিলক্ষিত হয় ভারতবর্ষে কি সুদূর প্রাচ্যের ইতিহাসে তার একান্ত অভাব।

ঐ একই আলাপ প্রসঙ্গে উক্ত বিদেশী সাংবাদিক বাংলা সাহিত্যে ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের অভাব সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন। খুব উঁচুদরের সাহিত্য না হলেও উৎকৃষ্ট সাহিত্য ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের মাধ্যমে সৃষ্টি করা যে অবশ্যই সম্ভব, ইংরাজী সাহিত্যে Conan Doyle, Bentley, Chesterton, Christie, Allingham, Sayers, Carr প্রভৃতির রচিত ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসগুলি তার জাজ্বল্য প্রমাণ। পশ্চিমী ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসগুলির মধ্যে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে তাদের ঘটনা সংস্থানের আশ্চর্য ও অফুরন্ত বৈচিত্র্য এবং তাদের প্লটের বিস্ময়কর অভিনবত্ব। অর্থাৎ সোজা কথায় পশ্চিমী ঔপন্যাসিকদের সমৃদ্ধ ও উদ্ভাবনী কল্পনা এখন পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যিকরা আয়ত্ত করতে পারেন নি। কল্পনার এই শোচনীয় দারিদ্র্যের কারণ অবশ্যই সামাজিক। যে সমাজে জীবন ও আশার প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয় না, যে সমাজ গতিশীল পরিবর্তনের কথা চিন্তা করতে পারে না, সে সমাজের উপন্যাসে ঘটনা সংস্থানের বৈচিত্র্য ও প্লটের অভিনবত্ব আশা করা অন্যায়। সামাজিক নৈরাশ্যপ্রসূত মেনে নেওয়ার অভ্যাস কল্পনার এই দারিদ্র্যের জন্য অবশ্যই বহুলাংশে দায়ী। যে সামাজিক অবস্থা ও ঘটনা সংস্থানের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় তারই অল্প হেরফের আমাদের উপন্যাসে দেখা যাবে। সমাজ যেখানে স্থাণু এবং অপরিবর্তিত, যে সমাজে অভিনব পরীক্ষা নিরীক্ষা করার তাগিদই অনুপস্থিত, সে সমাজের ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসে কল্পনার শোচনীয় দারিদ্র্য অনিবার্য কারণেই দেখা দেবে। কল্পনার এই দারিদ্র্যের আরও একটি কারণ আছে। সেটি হচ্ছে এই যে ভারতবর্ষের অধিবাসীরা এক রাষ্ট্রের নাগরিক হলেও তারা একই সমাজে বাস করে না। ভারতীয় উপসমাজগুলির সীমা বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার ভৌগোলিক ব্যাপ্তির দ্বারা সুনির্দ্ধারিত। এই উপসমাজগুলির মধ্যে যোগাযোগ ও সংস্পর্শ একান্তই সামান্য। বাঙালী সাহিত্যিক প্রায়শই বাংলার বাইরে বিশেষ যান না, তামিল সাহিত্যিক বেশীর ভাগ দক্ষিণেই কালাতিপাত করেন, মারাঠী সাহিত্যিকের জীবনের অধিকাংশ দিন মহারাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই অতিবাহিত হয়। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ও এই বিশাল দেশের সর্বত্র পরিভ্রমণ যদি ভারতীয় সাহিত্যিকদের

পক্ষে সাধ্যায়ত্ত ও স্বাভাবিক হ'ত এবং এই দেশের বিচিত্র উপসমাজগুলির মধ্যে যোগাযোগ যদি অবাধ ও অবারিত হত, তাহলে এই দেশের সর্বস্তরের সাহিত্যে কল্পনার দারিদ্র্য বহুলাংশে দূরীভূত হ'ত।

সুতরাং সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে দেখা যাচ্ছে যে শিল্পীর প্রতি রাষ্ট্রের আচরণের প্রশ্ন ভারতীয় সমাজে শিল্পীর দায়িত্বে এসে পর্যবসিত হচ্ছে। সত্য সত্যই এই দায়িত্ব সুমহান এবং গুরুতর। একদিক থেকে বিচার করলে এই দায়িত্ব একটি মহাসুযোগও বটে। কারণ ভারতীয় সমাজের বাহ্যিক সংগঠন এবং বহিরঙ্গ এখন অর্থনীতিক কারণে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির সংঘাতে নিশ্চিতরূপে পরিবর্তিত হচ্ছে। এই ভাঙাচোরার মধ্য দিয়ে যে সমাজ গঠিত হবে সে সমাজে মানুষের সৃজনী প্রতিভার বিকাশের অবারিত সুযোগ থাকবে কিনা সেটাই আসল প্রশ্ন। ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের পূর্ণ নিরাপত্তা ও আশ্বাস কোন সমাজ সংগঠনই দিতে পারে না। স্বাধীন চিন্তা ও মানব প্রতিভার স্বাধীন মূর্তি নির্ভর করে মানুষের মর্যাদা, মনুষ্যপ্রকৃতি, মানুষের স্থান, মানব জীবনের সার্থকতা ও উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্পর্কে কি প্রকারের চিন্তা ভাবনা ও আদর্শ সমাজে সর্বগ্রাহ্য নীতি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে, তার উপর। আগামী দিনের ভারতীয় সমাজে এই সকল বিষয় যাতে স্বাধীন চিন্তা ও ব্যক্তি মানুষের মৌল মর্যাদার পরিপূরক মূলনীতি ও আদর্শ স্বীকৃতি পায়, তার দায়িত্ব কিছু পরিমাণে অবশ্যই বর্তমান শিল্পী ও সাহিত্যিকদের উপর বর্তাচ্ছে। ভারতীয় সমাজে স্বীকৃত যে জীবনদর্শনের ফলে আমাদের দেশে মানুষের মর্যাদা নানাভাবে প্রপীড়িত ও পদদলিত হয়, ভারতীয়দের ধ্যানধারণা, চিন্তা ও মানসে কল্পনা অনুভূতির উপর সেই জীবনদর্শনের অভিশপ্ত প্রভাব অপসারিত করার দায়িত্বের কতকাংশ ভারতীয় শিল্পী ও সাহিত্যিকদের দ্বারা অবশ্য পালনীয়। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা রক্ষার নামে কতগুলি মামুলি বুলি আউড়ে গেলেই এই কর্তব্য পালন করা হয় না, যেমন হয় না সাহিত্যে অথবা শিল্পে মানুষের যৌন অভিজ্ঞতার বাস্তব ও নগ্ন চরিত্র অঙ্কিত করে; তাই যদি হ'ত তাহলে এই দায়িত্ব পালনের প্রশ্নই আজ উঠত না, কারণ প্রাচীন ভারতীয় শিল্পী ও সাহিত্যিকরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট বাস্তবাভিমুখী দুঃসাহসিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় শিল্পী ও সাহিত্যিকদের যৌনানুভূতি ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে এই সাহস

ও সত্যনিষ্ঠা ভারতীয় সমাজকে অদৃষ্টবাদী জড়ত্বের অভিশাপ থেকে রক্ষা করতে পারে নি। বরঞ্চ মনে হয় গভীর সামাজিক হাতাশা মানুষকে যৌনানুভূতি অনুশীলনে তৎপর করে এবং এদিকে খুব বেশী মনোযোগ দেওয়ার অর্থ সমাজের আসল ব্যাধিকে সযত্নে এড়িয়ে চলা। স্মরণ রাখা দরকার যে ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ডি. এইচ. লরেন্স একক ও অনন্য এবং তাঁর মত প্রতিভাশালী লেখকের দ্বারা রচিত উপন্যাসও বোধ হয় বিশ্ব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির সমান সার্থকতা লাভ করেতে পারেনি। জেমস জয়েস্ এর সৃষ্টির মধ্যেও যৌনানুভূতির ও অভিজ্ঞতার স্থান অবশ্যই গৌণ। ভারতের শিল্পী ও সাহিত্যিকরা উপরোক্ত দায়িত্ব পালন করতে তখনই সক্ষম হবেন যখন তাঁরা ভারতবর্ষের সর্বস্তরের মানুষের আচার ব্যবহার, পারস্পরিক সম্পর্ক, চিন্তা ভাবনা, কল্পনা অনুভূতি প্রভৃতিকে সদাজাগ্রত নিষ্ঠা, সহানুভূতি ও সততার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ ক'রে, এদেশের মানুষের জীবনকে বলিষ্ঠ কল্পনা ও মননের মধ্যে বিধৃত করতে পারবেন এবং এদেশের মানুষের দ্বারা অর্জনীয় জীবন ঐশ্বর্য ও কীর্তির সম্ভাবনাকে তাদের বাস্তব জীবনের কঠোর পরিপ্রেক্ষিতে আরোপিত করতে পারবেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ এই কাজ বহুদূর অগ্রসর ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু জাতীয়তাবাদী গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের তলায় তাঁদের সেই বিরাট সাধনার ধারা প্রায় অবলুপ্ত হ'তে চলেছে। তাঁদের অর্দ্ধসমাপ্ত কাজকে সমাপ্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব বর্তমান শিল্পী ও সাহিত্যিকের 'পর ন্যস্ত হ'য়েছে।

বলা বাহুল্য এই দায়িত্ব পালন করতে তৎপর হওয়ার অর্থ ই হচ্ছে বিদ্রোহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। কোন সমাজই কোনদিন বিদ্রোহীকে সুনজরে দেখে না। কিন্তু উপরে উপরে সামাজিক প্রশস্তিদানের মধ্য দিয়ে বিদ্রোহীর সাধনাকে ভিতরে ভিতরে ব্যর্থ করে দেওয়ার এক অদ্ভুত কৌশল আমাদের সমাজ রপ্ত করে নিয়েছে। বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্র কর্তৃক শিল্পী ও সাহিত্যিককে জীবনব্যাপী দারিদ্র্যের অভিশাপ বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। ইংলণ্ডের মত অগ্রসর দেশেও উইণ্ডহ্যাম লিউইস্ সেখানকার শিল্পী ও সাহিত্যিকদের এই পরামর্শ দিতে বাধ্য হয়েছেন (দ্রষ্টব্য : The Writer and the Absolute)। আমাদের দেশে এই পরামর্শের যৌক্তিকতা আরও প্রবল। তাছাড়া স্মরণীয় যে আধুনিক ডিক্টেটারী রাষ্ট্রে শিল্পী সাহিত্যিক

একটি বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পরিণত হ'য়েছেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা ও সৃষ্টির স্বাধীনতাও হারিয়েছেন। উপরন্তু যদি সরকারী আমলাতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন, তাহলে শিল্প সাহিত্যের গুরুতর ক্ষতি হতে বাধ্য। সুতরাং রাষ্ট্র ও সরকারী আমলাতন্ত্রের সান্নিধ্য ও সংস্পর্শ সযত্নে পরিহার করে চলাই মনে হয় ভারতীয় শিল্পী ও সাহিত্যিকের অবশ্যকর্তব্য।

ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রে শিল্পীর স্থান এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা সংরক্ষণে তার দায়িত্ব সম্পর্কে উপরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল। পরিশেষে আর একটি বক্তব্য পেশ করে এই আলোচনার উপসংহার করব। শিল্পী সাহিত্যিক যখন সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা সংরক্ষণের নিমিত্ত রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন, তখন তাঁদের সঙ্গে অন্যান্য নাগরিকদের কোন প্রভেদ নেই, কেননা তখন তাঁরা সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্র থেকে সরে এসেছেন। সুতরাং প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত অন্যান্য নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্র যে রকম ব্যবহার করেন, ঠিক সেইরূপ ব্যবহারই রাজনীতিক কার্যকলাপে লিপ্ত শিল্পীদের আশা করা উচিত। শিল্পী ও সাহিত্যিকের যেমন মানুষের মর্যাদা প্রাপ্য, অন্যান্য সাধারণ নাগরিকদের তেমনই অনুরূপ মর্যাদা প্রাপ্য। স্বাধীন চিন্তার অধিকার যেমন সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে প্রয়োজন, তেমনই সাধারণ নাগরিকদের সুস্থ ও মর্যাদাসম্পন্ন জীবন যাপনের জন্যও এই অধিকার অপরিহার্য। কিন্তু শিল্পী অথবা সাহিত্যিক যখন তাঁদের সৃষ্টি নিয়ে সমাজের সামনে উপস্থিত হবেন তখন তাঁরা অবশ্যই নাগরিক সাধারণের কাছ থেকে বিশেষ ধরণের মনোযোগ দাবী করতে পারেন, যেমন দাবী করতে পারেন বৈজ্ঞানিক অথবা চিকিৎসক অথবা এঞ্জিনীয়ার। রাজনীতিক আন্দোলনে স্বশ্রেণীর জন্য বিশেষ মর্যাদা দাবী করা শিল্পী সাহিত্যিকদের পক্ষে কেবলমাত্র যে অযৌক্তিক তাই নয়, এই ধরণের দাবী শেষ পর্যন্ত inequality ও privilege এর স্তরে গিয়ে পৌঁছোয়।

একালের কয়েকটি সাময়িক পত্র

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

বছর ত্রিশ আগে যখন আমি প্রথম সাময়িক পত্রে রচনা প্রকাশ সুরু করি, তখন নূতন লেখকের পক্ষে সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ এখনকার চেয়ে সহজ ছিল। বাজারের বড় ও বিখ্যাত কাগজগুলি অবশ্য নবাগতকে ঢোকবার সুযোগ দিত না। কিন্তু ছোট-ছোট মাসিক সাপ্তাহিক ছিল অনেক এবং তার বেশীর ভাগই চালাতেন সাহিত্যিকরা। তাঁরা নূতন লেখকের মধ্যে শক্তির সন্ধান পেলে সানন্দে তাঁকে লুফে নিতেন। আর ছোট ও অনিয়মিত সময়ে প্রকাশিত হলেও, এই সব কাগজে লেখা ছাপা হলেও, লেখকের খ্যাতিমান হওয়া দুষ্কর ছিল না। কারণ সাময়িক পত্রিকার তখন ক্রেতা কম থাকলেও, পাঠক বেশী ছিল। তাঁরা পড়তেন, উপভোগও করতেন।

দেশ থেকে সাহিত্যের সেই মেজাজটা আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে। এখন পড়ুয়া বেড়েছে, বইয়ের বিক্রীও বেড়েছে। কিন্তু পত্রিকার আদর কমেছে। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় চালিত পত্র-পত্রিকা অবশ্য বেশ চলছে, চলবেও। কিন্তু নিছক সাহিত্যনিষ্ঠা ও যৎসামান্য পুঁজি নিয়ে আজ কোন কাগজ টিঁকিয়ে রাখা কঠিন। প্রথমত লেখককে আজ কিছু পারিশ্রমিক না দিলে চলে না, যা সেদিন চলত। মুদ্রন ও উৎপাদনের ব্যয়ও আজ অতিশয় বেড়েছে। এই খরচ কুলাতে হলে যে পরিমাণ বিজ্ঞাপন পাওয়া দরকার, তা ছোট কাগজরা পায় না। দ্বিতীয়ত সংবাদপত্রের সাহিত্য বিভাগ আজ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে সাময়িক পত্রের। তাই সাময়িক পত্রিকার জগৎ ক্রমে কৃশ হয়ে আসছে।

এমন কালে বিগত দিনের যে সব 'ছোট' কাগজ বড় লেখক সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে, তার কাহিনীর একটু আলোচনা করে দেখা মন্দ কি? বলা বাহুল্য আমি ইতিহাস লিখছি না। একটু স্মৃতিকথার অবতারণা করছি মাত্র। কাজেই সাল তারিখ ও তথ্য বিচার কিছু থাকবে না এ লেখায়। হাতের কাছে যে কথাগুলো আসছে, তাই লিপিবদ্ধ করে রাখছি এখানে। উপযুক্ত

সময় ও সুযোগ মিললে ভবিষ্যতে এই প্রসঙ্গ নিয়ে একটু ইতিহাসই লিখতে চেষ্টা করব। কারণ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সে ইতিহাস অনেকটা জড়িত।

অনেকে বোধহয় জানেন, শরৎচন্দ্রের প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা 'বড়দিদি' ভারত। পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং লেখার সঙ্গে লেখকের নাম না থাকায় অনেকে তা রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে ভুল করেছিলেন। অনামী প্রথম লেখার ব্যাপার যাই হ'ক, শরৎচন্দ্রের প্রথম নাম সঙ্কলিত লেখা প্রকাশিত হয় যমুনা পত্রিকায়। তখনকার দিনে প্রবাসী, ভারতবর্ষ, সবুজপত্র, এই তিনখানি খ্যাতনামা পত্রিকা থাকতে যমুনার মতো স্বল্পখ্যাত ও ক্ষীণায়তন কাগজে শরৎচন্দ্রের লেখা প্রথম প্রকাশিত হল কেন, এ প্রশ্ন হয়ত মনে হবে অনেকের।

কারণ আর কিছুই নয়, প্রথম আমলে শরৎচন্দ্রের লেখায় অনেকে দুর্নীতির গন্ধ আবিষ্কার করতেন। তখনকার ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্যে তাঁর লেখায় যে সমস্ত ব্যঙ্গ ও বক্রোক্তি নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তা-ই সম্ভবত প্রবাসীতে তাঁর প্রবেশের পথ বন্ধ করে। আর শুনেছি, ভারতবর্ষ পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা নিয়ে যখন ব্যস্ত ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল, সেই সময় অনুমোদনের জন্যে তাঁর হাতে আসে চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি, এবং তা পড়ে তিনি নাকি বলেন, যে বইয়ের নায়িকা একজন হোটেলের ঝি, আমার সম্পাদিত কাগজে তা ছাপা হবে? প্রমথ চৌধুরী মহাশয় স্বয়ং শরৎচন্দ্রের অনুরাগী ছিলেন এবং তাঁর মুখেই শুনেছি, উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে পত্রালাপ চলত। কিন্তু সবুজপত্র গোষ্ঠীর আর সকলে শরৎচন্দ্রকে যথেষ্ট পরিমাণ বিদগ্ধ লেখক মনে করতেন না।

কাজেই যমুনা ছাড়া উপায় কি ছিল তাঁর? কিন্তু জনপ্রীতি ও ব্যাপক পরিচিতি লাভে বাধা হয় নি তাঁর, ক্ষীণস্রোতা যমুনাতে নৌকা ভাসিয়েও। এই যমুনা পত্রিকা বাংলা দেশের আর একজন বিশিষ্ট কবিকেও পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছে। তিনি হলেন এঞ্জিনিয়ার কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রথম মফস্বলের এঞ্জিনিয়ার যতীন্দ্রনাথের কবিতার খাতা আবিষ্কার করেন এবং তিনিই তা থেকে জোর করে যমুনার পৃষ্ঠায় একে একে অনেকগুলি কবিতা প্রকাশ করেন, সম্পূর্ণ নূতন ভাষা ও নূতন সুরে এই কবিতার রচয়িতাও নজর এড়িয়ে যাননি বাঙালী পাঠকের।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরবর্তীকালের সমস্ত কবিতাও প্রকাশিত হয়েছে

P27223

আর একখানি ক্ষীণায়তন ও স্বল্পতর খ্যাতির অধিকারী পত্রিকায়। সে হল কবি সাবিত্রী প্রসন্নের উপাসনা পত্রিকা। যতীন সেনগুপ্তের একমাত্র গদ্যগ্রন্থ কাব্য পরিমিতিও প্রথম প্রকাশ করে উপাসনা-ই। আর একজন আজকের বিখ্যাত লেখক প্রথম খ্যাতিমান হলেন উপাসনাতে লিখেই। আমি বলছি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। তাঁর প্রথম উপন্যাস চৈতালী ঘূর্ণি এবং পরবর্তীকালের বহু প্রশংসিত রাইকমল (প্রথম প্রকাশকালে এর নাম ছিল মালা চন্দন) উপাসনাতে-ই প্রকাশিত হয়।

১৯২৫-৩০ এর মধ্যে যে নূতন লেখকদলের আবির্ভাব হয়, তাঁদের প্রধান পত্রিকা ছিল কল্লোল, এবং কল্লোলের পাশাপাশি ছিল কালিকলম ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রগতি। শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল, জীবনানন্দ দাশ সবাই ছিলেন এই তিন পত্রিকার লেখক। এঁদের খ্যাতি যতটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রচনার গুণে, তার চেয়ে অনেক বেশী সহায়তা করেছে এদের খ্যাতিবৃদ্ধিতে শনিবারের চিঠি, যা দিনের পর দিন বেছে বেছে প্রতি লেখকের রচনা থেকে তথাকথিত অশ্লীল বা দুর্নীতিপূর্ণ অংশ খুঁজে বের করত এবং সরস টীকা টিপ্পনী সহ তা প্রকাশ করত। অর্থাৎ ঐতিহাসিক দিক থেকে শনিবারের চিঠি আধুনিক সাহিত্য প্রচারে সহায়তা করেছে বিরোধিতার ছদ্মবেশে। বলা যেতে পারে তার এই ভূমিকা ছিল অনেকটা নেতি মূলক। তবে শনিবারের চিঠি-ও বাংলা ভাষায় প্রধান একজন সমালোচককে উপস্থিত করেছে। সত্যসুন্দর দাসের ছদ্মনামে কবি মোহিতলাল মজুমদার শনিবারের চিঠি-তেই প্রথম ধারাবাহিক সাহিত্য সমালোচনা সুরু করেন।

এই সময়ের দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্যিকের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, যাদের কথা আজ অনেকের মনে নেই। প্রথমটি হল বিজলী, আর দ্বিতীয়টি হল আত্মশক্তি। বিজলী নজরুলের প্রচারণায় যেমন বিশেষ সহায়তা করেছে, তেমনি নলিনীকান্ত গুপ্ত সুরেশ চক্রবর্তী প্রমুখের রচনাও ধারাবাহিক ভাবে তুলে ধরেছে দেশের সামনে। শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের কিছু রচনাও বিজলীর পৃষ্ঠায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল। আত্মশক্তি প্রধানত নবীনদলেরই কাগজ ছিল। অর্দ্ধ-রাজনৈতিক, অর্দ্ধ সাহিত্যিক এই পত্রিকাটি একদা সাহিত্যাদর্শ নিয়ে তরুণ প্রবীণের লড়াইয়ের তরুণ পথের যুদ্ধ শিবির হয়ে উঠেছিল। অনেকে বোধহয় জানেন না যে একদা

শিবরাম চক্রবর্তী এই আত্মশক্তিতেই কবিতা নাটক ও প্রবন্ধ লিখে যশস্বী হয়েছিলেন। পরে তাঁর খ্যাতি প্রসার লাভ করেছে শিশুসাহিত্যিক রূপে। কিন্তু আদিতে তিনি বয়স্কদের সাহিত্যিকই ছিলেন।

একটা কথা এই সূত্রে বলে রাখা দরকার যে তখনকার বড় ও বিখ্যাত পত্রিকা যেগুলি ছিল, নবীন লেখকরা তাতে অধিকাংশই ছিলেন অপাংক্তেয়। বসুমতী ত আগাগোড়াই রক্ষণশীল পক্ষের কাগজ। প্রবাসী এবং ভারতবর্ষের ছুতমার্গ তত প্রবল না থাকলেও, নবীনদের বিশেষ আমল দিতেন না তাঁরাও। কাজেই তরুণেরা নিজেদের কাগজপত্র নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু খ্যাতিমান হতে বাধা হয়নি তাতেও। যখন বিচিত্রা প্রকাশিত হল, তখন তা নবীন প্রবীণের মিলন ক্ষেত্র হবে বলে ঘোষিত হল। কিন্তু কার্য্যত প্রবীণেরাই বিচিত্রার আসর জাঁকিয়ে বসলেন। নবীনদের মধ্যে অন্নদাশঙ্করের একটু সম্ভ্রম স্বীকৃত ছিল বিচিত্রায়। অচিন্ত্যকুমারও যুক্ত ছিলেন তাঁর সঙ্গে। কিন্তু বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কোন নূতন বড় লেখককেই প্রতিষ্ঠিত করেনি বিচিত্রা। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল বিচিত্রায় এবং তা বেরতো শেষের দিকে এবং কেমন যেন একটু অযত্নের সঙ্গে। বোধ হয় বিচিত্রা গোষ্ঠী রচনাটির গুণপনা সম্বন্ধে নিঃসংশয় ছিলেন না। বিচিত্রার সঙ্গেই উল্লেখযোগ্য উত্তরার নাম। প্রবাসী বাঙালীর মুখপত্ররূপে উত্তরার দান কম নয়। নবীন সাহিত্যিকদের জন্যেও তার আসর অবারিত।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম লেখা বিচিত্রায় প্রকাশিত হলেও, তাঁর প্রথম বিখ্যাত রচনা কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় পূর্ব্বাশায়। পূর্ব্বাশাই তাঁর 'পদ্মানদীর মাঝি' প্রকাশ ক'রে তাঁকে বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত করে। কল্লোলোত্তর কালে পূর্ব্বাশা আধুনিক সাহিত্যের ব্যাপ্তি ও প্রচারে নিতান্ত কম সহায়তা করেনি। পূর্ব্বাশার পর একটি স্বল্পস্থায়ী মাসিক ও একটি সাপ্তাহিক কিছুদিনের জন্যে বেশ খানিকটা জনপ্রিয়তা আহরণ করেছিল। আমি বলছি মাসিক ভবিষ্যত ও সাপ্তাহিক অগ্রগতির কথা। ভবিষ্যতের কর্ণধার ছিলেন সুতো ঠাকুর। তিনি তখন শিল্পী নন, সাহিত্যিক। অগ্রগতিতে ছিলেন আশু চট্টোপাধ্যায়, বিরাম মুখোপাধ্যায়, দিনেশ দাস প্রভৃতি। দিনেশ দাস কবি খ্যাতি লাভ করেছেন অগ্রগতি থেকেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে বাংলা দেশে এল যে নূতন কাব্য আন্দোলন, তার প্রভাবে বেরুলো একে একে তিনখানি কবিতা পত্রিকা—কবিতা, নিরুক্ত, একক। নিরুক্ত অল্পদিনের মধ্যেই নিরুক্ত হয়ে গেল। অন্য দুখানি এখনো আছে। কবিতা পত্রিকা বাংলা দেশে কয়েকজন নবীন কবিকে পরিচিত করিয়েছে, যার মধ্যে সত্যিকার শক্তিমান কবি হলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু সমগ্রভাবে কবিতা পত্রিকা নূতন কবিতার ভাষা ও কাব্যবস্তু নিয়ে যে আন্দোলন করেছে তার দামই বেশী।

ত্রৈমাসিক-এর প্রসঙ্গে পরিচয় পত্রিকার কথাও ভুলে গেলে চলবে না। সবুজপত্রের পর পরিচয়ই একমাত্র যা জনপ্রিয় সাহিত্য পরিবেষণ না করে সাহিত্যে বিদ্যাবৈদগ্ধ্যের বনিয়াদ দৃঢ় করার কাজে মন দেন। ইতিহাস, অর্থনীতি দর্শন, সাহিত্য, শিল্পতত্ত্ব, জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা বিভাগের বহু নূতন দিক উদ্ঘাটিত করে দেয় পরিচয়। কিছু ভাল কবিতা ও কয়েকটি গল্পও পাওয়া যায় তার কাছে। ত্রৈমাসিক থেকে মাসিকে রূপান্তরিত হয়েও পরিচয় তার বৈশিষ্ট্য বেশ কিছুদিন অব্যাহত রেখেছিল। তার পর তা হস্তান্তরিত হল এবং এখানকার পরিচয় আগেকার পরিচয় থেকে স্বতন্ত্র ধারায় চালিত হয়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধের যে একটা নূতন মর্য্যাদা স্বীকৃত হয়েছে, তার মূলে পরিচয়ের দান কম নয়। যদিও পরিচয়ের অনেক প্রবন্ধকার যতবড় পণ্ডিত ছিলেন, ততবড় লিখিয়ে ছিলেন না এবং সেই জন্যেই সাহিত্যে সম্পদ বলে গণ্য হতে পারে এমন স্থায়ী রচনা তাঁরা বেশী দিতে পারেন নি। তবু পরিচয় একদিকে যেমন বাঙালী লেখকের দৃষ্টি বিশ্ববৈদগ্ধ্যের দিকে আকৃষ্ট করেছে, অন্যদিকে তেমনি তাঁর রচনা থেকে কাব্যিকতা অপসারিত ক'রে, তার মধ্যে নিরাভরণ পৌরুষের অবতারণা করতে সহায়তা করেছে। এ দান নগণ্য নয়।

আমি এই প্রসঙ্গে গোড়া থেকেই সাহিত্যিকদের স্বকীয় উদ্যমে পরিচালিত ছোট ও মাঝারি কাগজের কথা বলেছি। বহু ব্যয়ে ও প্রভূত হৈ-চৈ সহকারে বেরিয়েছে যেসব কাগজ এবং যার প্রধান লক্ষ্য ছিল সাহিত্য প্রচার নয়, সাহিত্যাশ্রিত ব্যবসা করা, তার কথা বলিনি। আমার ধারণা সেসব কাগজে ভাল লেখা যথেষ্ট বেরুলেও এবং শক্তিশালী লেখকরা তার কোন না কোনটার সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও, সেসব কাগজ কোন নূতন মত, পথ বা সাহিত্যাদর্শও

প্রতিষ্ঠা করেনি। মানসী ও মর্ম্মবাণী, বঙ্গবাণী, নারায়ণ, পঞ্চপুষ্প, বঙ্গশ্রী, উদয়ন, অলকা, একে একে অনেক নাম করতে পারি। এর মধ্যে নারায়ণ সম্বন্ধে একটু বক্তব্য আছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত এই পত্রিকা একদা রবীন্দ্রনাথকে প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই নিষ্ঠুর ভাষায় আক্রমণ করত এবং কৌতুকের কথা, কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে চিত্তরঞ্জনের শ্রেষ্ঠতার কথাই এতে প্রচার করতেন কোন বিদগ্ধ সমালোচক।

এই পর্যন্ত এসেই আমি আপাতত পূর্ণচ্ছেদ টানতে চাই। কারণ এর পরের যে অধ্যায়, তা এখনো চলছে। এবং যা হালের ও হাতের কাছের, তা পুরোনো কথায় স্থান পাবার বিষয় নয়। তবে একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি যে বাংলা দেশে সংবাদপত্র সর্বগ্রাসীরূপে দেখা দিয়েছে। সপ্তাহ ভোর কোনদিন শিশু বিভাগ, কোনদিন মহিলা বিভাগ, কোনদিন শিল্প সাহিত্য ও ব্যবসা বানিজ্য বিভাগ, এইভাবে সাময়িক পত্রিকার অন্যান্য দিকগুলিকে গ্রাস করে নিয়েছে সংবাদপত্র। তার ফলে মাসিক সাপ্তাহিক আজ আপন জোরে চলে না, তাকে চালাতে হয় গায়ের জোরে, ব্যাপকভাবে পাঠক সমাজকে স্পর্শ করে না।

এর ফল হয়েছে দুটি। বিজ্ঞান ও কারিগরী শিল্পের দিকে সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্রমশ উৎপাদনমূলক শ্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ছে। আর সাহিত্য থেকে ক্রমেই রসের ঐশ্বর্য কমে গিয়ে তাতে বাড়ছে উপযোগিতার অংশ। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে সাহিত্য Colourful Journalism বা রং-চঙে সাংবাদিকতা হয়ে দাঁড়াবে। যেমন গান হয়েছে গ্রামোফোনের আওতায় এবং অভিনয় হয়েছে সিনেমেটোগ্রাফীর পাল্লায় পড়ে। অবশ্য এতদূর পর্যন্ত তাকিয়ে দেখছেন না এখনো অনেকে। তাই এখনো ক্ষণজীবী মাসিক সপ্তাহিক বেরুচ্ছে, উঠে যাচ্ছে। ভালো কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু বৃহৎ শিল্পের দিনে কুটীরশিল্প কি টিঁকবে বেশীদিন? সে সন্দেহ জেগেছে বলেই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে কয়েকখানা উঠে-যাওয়া বা অধুনা মহিমাভ্রষ্ট কাগজের কথা লিখে রাখলাম।

কাহিনী

অমিয় চক্রবর্তী

"তোমার পান্থ সে তীর্থপথে যেতে যদি
হঠাৎ তৃষ্ণায় জল চেয়ে থাকে,
স্বর্গদূতী, তাকে দয়া করেছ না-দিয়ে
বিন্দু তৃপ্তি। অমর্ত তিয়াষা
জাগাতে চেয়েছ। পান্থ সেও শেষ জানে
বুকে সেই তৃষা ভালো যার অবসান
কোনো ছায়াদিঘি কোনো কুয়ো কোনো ঘরের কলসে
নেই। প্রেমঝারি আছে ঘরে ঘরে, তার দান
হৃদয়ের স্মৃতিদ্বারে কখনো দাঁড়িয়ে দাহ খনে
নেব উৎসর্জিত প্রাণে, দূর শূন্যে কারো না-দেয়ার
পূর্ণের স্বরূপী সুধা মেঘাদ্রি তোরণে
দীপ তটে ছোঁবে দিন, রাত্রে চক্ষুতরা
শেষ ধ্রুবতারা অলুবে, স্পর্শাঙ্কিত, পরজে ধ্যানিত
নিরভ্র সোনায় জাগা নতুন সহরে
রাঙা জনপদ ডেকে নেবে
দিগন্তরে।"

"এক ইচ্ছা বলি।
যতদিন সৌরলয়ে পথ-চলন্তিকা
ঈপ্সিতের ডোরে বাঁধা এই জীবনের
গতি না শান্ত হয়, অগণ্য চিহ্নিত
সংসারে একান্ত যেন ধরি মূর্তি সেই

এক যুগ্মতার রূপ, চেনার অন্তিমে
হৃদয়ের দুইপারে,—কত পারাপার।
মর্ত্তের যাত্রিনী শুধু জানি, তুমি জানো,
বাধা ঘটেছিল জীবনের,
তবু অনির্বান
মাটির দেয়ালি জ্বালা' অভগ্ন আলোয়॥"

একটি দোকান

অরুণ মিত্র

কেরাসিনের কুপি ধরিয়ে দোকানটা তারার মতো ফুটে ওঠে এবং চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়ার পরও মিটমিট করে। অন্ধকারের মধ্যে তার কথা বলা খুব নীচু পর্দায় বাঁধা, সমস্ত স্নায়ুকে উন্মুখ না করলে তা হারিয়ে যায়। তা-ই করতে হয়। এমন এক মর্মান্তিক বিন্দুতে তার স্ফুরণ যে তাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। বিস্তর লোক রোজ ঢেউ ঠেলতে ঠেলতে তাকে খুঁজে নিয়ে পথের একটা আন্দাজ করে। যদিও কোনো অমোঘ আশীর্বাদ তাদের উপর ঝরে না তবু এটা স্পষ্ট যে ঐ ইশারাটুকু না থাকলে তারা তলিয়ে যেত।

চারদিকের দূরত্বকে মাপবার চেষ্টা করা এক বিড়ম্বনা। এতগুলো এলোমেলো দিন সেখানে তোলপাড় করে যে কোথায় তার আরম্ভ আর কোথায় শেষ তা স্মৃতিতে বা চিন্তায় ধরা দুঃসাধ্য। ক্ষুদকুঁড়ো তেলনুন কাঠের টুকরো এই সব হাতে নিতে গিয়ে সবাই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এই চিহ্নগুলো ব'য়ে নিয়ে জীবনের তীরে পৌঁছনো যাবে কি? সোনার ভাঁড়ারে এ সব জমা ক'রে দেবার সময় থাকবে কি?

কারো জানা নেই ঠিক কতদূরে সেই ডাঙা যার উপর জয়ের তোরণ উঠবে। নজর সে পর্যন্ত চলেনা। কেরাসিনের কুপিটা যদি উল্টে প'ড়ে আকাশময় আগুন লাগায় তবেই তা দেখা যেতে পারে মনে হয়।

একটি মজার লোক

রাম বসু

লোকটা মজার, তার প্রতিপদে কাঁটার শক্রতা
কথা বলতে গেলে শব্দ যাদুমন্ত্রে যেন রামধনু
সে অবাক চেয়ে থাকে মোহমুগ্ধ প্রেমিকের মত।

হিতৈষী বন্ধুর পাল উদ্ধারের দায় কাঁধে নিয়ে
অবিরাম খোঁচা মারে, অবিরাম রক্ত ঝরে তার
মাঠের গর্ভের মধ্যে যেন এক সজারু শীকার
সে বলে : তবুও রাত্রে পরী নাচে পাহাড়ের ধারে।

বলে আর রক্ত ঝরে, রক্ত ঝরে, বসে থাকে একা
রক্ত তার বিকেলের নদী হয়ে নক্ষত্রের দিকে
এখুনি শূন্যের মেঘ জলে নেমে মাতাবে গোধূলি
ফোটার আগের ফুল বুক তার নিপুন ব্যথার।

কাঁসার ঘড়ার মত ঝক্‌ঝকে মেয়েদের দল
সর্বাঙ্গ নাচিয়ে বলে : তুমি নাকি মজার মানুষ ?
টাকার ধ্বনির মত হাসির লালসা তুলে যায়।

লোকটা তখন থাকে ভুঁইচাপা পশ্চিম আকাশ
রূপের বর্ণায় তার চোখ দুটো গলে যাবে যেন।

একদিন অন্ধ হয়ে অন্ধকারে মৃত্যু হলে তার
ইঁদুর শেয়াল এল, অবশিষ্ট মাংস প'চে মাটী
হাড় কটা অকস্মাৎ পদ্ম হয়ে সেখানে বিভোর
মৌমাছি ও ভোমরার নাম-গানে মুখর নির্জন।

উত্তরস্থরী

দিগন্তের থেকে এল তীর্থযাত্রী অপরূপ নারী
জুঁই-এর চেয়েও শুভ্র দেহ তার বেহাগের সুর
সেই ফুল বুকে তুলে কেঁদে কেঁদে বলেছে সহসা :
এঁকে আমি নিয়ে যাবো এইবার দেবতার কাছে।

ভিড়

আলোক সরকার

হঠাৎ ভিড়ের মতো অহেতুক আলো
সমস্ত রাস্তায়।
নদীর পারের দেশ ?
নাকি সেই ছোটবেলাকার বড়ো ছাদ।
বাড়ি ফিরে যাবো শান্ত সংহত স্পর্ধায় ?

উত্তরদিকের লাল প্রাসাদের মাথার উপরে
স্থির কালো মেঘ।
পাতায় পাতায় মুখ-ফেরানোর মতো নীল আলো
এবং হাওয়ার শান্ত আন্তরিক স্বরে।
বিষণ্ণ মালার মতো ফুটপাথ, প্রতীক্ষার কালো
দেয়াল তীব্রতা যেন আমাদের বৈশাখের মাঠ।

এবং হাজার সাপ গাছের শরীর
সাপের মতন—পাতায়-পাতায় মুখ-ফেরানোর মতো নীল আলো
যতো দেখি।
বাড়ি ফেরবার পথে, সুদূরিমা, কোন বাঁশি আলো।
কী ভীষণ দ্রুত মেঘ সাহজিক নিয়ম অস্থির।
ট্রেণ ছাড়বার আগে আর একবার স্টেশনে নামার
যন্ত্রণা নেবো না আমি ট্রেণের গতির অন্ধ হবো।

ভিড়

বৃষ্টি এলো, দেখো বৃষ্টি এলো
অভিমান।
ওই তো ওই তো যায় পথগুলো সব এলোমেলো।
ভালোবাসা, অন্ধকার আকাশের চৈত্রের দুপুর
কোন পরিত্যক্ত মাঠে রুক্ষচূড়া তোমার সম্মান!
আকাশ রেখেছো আর সমারোহ অন্তমন প্লাবিত নির্জনে
রাত্রিবেলা। নিশ্চিত সুদূর
মালতী হয়েছে বিকশিতা বলে কেন কারো অপমান?
বেদনা তোমার জানি, তিমির যামিনী ভ'রে
অসহায় গতির গোপনে।

শূন্য কোরক

কল্যাণ সেনগুপ্ত

কবে তাকে বলেছিলে সে তোমার বুকের সুরভি,
সে-অভিমানিনী আজ হাওয়ার গভীরে ডুবে গেছে!
এবার ঝরার পালা অন্ধকারে ফুলের মতন,
বীতগন্ধ বৃন্ত দিয়ে এই ব্যাপ্ত ক্রন্দসীর মন
কি ক'রে ভোলাবে তুমি? শুচিস্মিতা নববধূ সেজে
যে তোমার বুকে মুখ লুকিয়ে কেঁদেছে রাত্রিদিন
স্বপ্ন দেখে' অপরূপ স্নিগ্ধ সহমরণের ছবি
সেই ক্ষীণ সুরভিকে আজ কেন প্রভূতদক্ষিণ
হাওয়ার প্রবাহপথে খুলে দিলে?—উন্মুক্ত কোরকে
দূর থেকে লাগে এসে ম্রিয়মাণ নক্ষত্রের আলো
সে-আলোয় খুঁজে ছাখো যার শান্ত ভূমিকা ফুরালো
তোমার জীবন থেকে, স্পর্শ তার কিছু আছে কিনা!
—যে ঐশ্বর্য বুকে ধ'রে ডুবে যাবে পাতাল কুহকে
ধূসর ধূলায় বেজে উঠবে এক ছিন্নতন্ত্রী বীণা!

চোখ ফিরিয়ে দেখলে

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

চোখ ফিরিয়ে দেখলে
অমনি অন্ধকার দর্পণ হ'ল।

দুপাশের ঊর্দ্ধশ্বাস মাঠে
জ্যোৎস্নার মেয়েলি মুখ
উশখুশ করে উঠেছে
কিছু বলবে।
বলতে গিয়ে
চমকে চমকে এলিয়ে পড়লো
গাছের পুরুষ ডালে,
গলায় দড়ি দিয়ে
শুঁড়ির পাথরে পা দুলিয়ে
জাফরির ছায়াগুলোতে
থমকে গেছে তারপর।

জ্যোৎস্না এখন তার চোখের সকালে,
চোখ ফিরোলে
অন্ধকার।
অন্ধকার দর্পণ হবে
চোখ ফিরিয়ে দেখলে।

গাঁ ভর্তি মানুষজনকে
অবাক করে
এইমাত্র

চোখ ফিরিয়ে দেখলে

চোখ দুটো একছুটে
হন্তে হাওয়ার তল্লাট পেরিয়েছে।
দুটি চোখের সামনে
হাট-করা আকাশের বুক

পেছনে
চিড়-ফাড় অন্ধলোচন তপস্যা
দধীচির হাড় জ্বালিয়ে ডাকছে ॥

মুকুর ৫৫

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

মৃদঙ্গ বাজত দেখি, নাচত চন্দন ···
কুলশীল জানা নাই, রসাবিষ্ট যত,
মেলার আলোক নৃত্যপটে, মেলার আঁধার বন,
হারালো বন, হারালো আলো, মৃদঙ্গ নাচত রে।

খসিল মৌচাক তারা, উচ্ছ্বৃত জ্যোছনা রে
তুমি চন্দন ভোলালে ঘর, জনম সুধার ধারা
ধরিল জোনাকে চন্দন, ধরিল জোনাকে হে,
অভ্রকূলে ভাসিল গান, বিপথ গান বাঁধন হারা।

প্রভু হে কেন লুকালো ফুল, মুড়ালো গাছ, পীতল মালা
দরদী মুখে মলিন হাসি, বুঝিনি ছল শিলকুট
প্রিয় আমার নিয়েছো যা, ভাস্ত কর, নীরব তুলা
স্বপ্ন নাও, স্মৃতিও নাও, পদ্ম নাও অক্ষিপুটে।

মৃদঙ্গ বাজত না রে···নাচত চন্দন।
চলো চন্দন মেলায় যাই, শূন্য মেলা চিতল, ভঙ্গ
নীরবে থেকো হে তারা সখি, আঁধারতম্ আঁধার বন
খুলা হাতের পাতকী নাচে, তুমিই তো মৃদঙ্গ রে।

ঘুমিয়ে

চিত্ত ঘোষ

নীল সমুদ্র, উঁচু পাহাড়
প্রান্তর ডাকে কী জন্য
গ'লে নদী হ'লে মন-তুষার
মাটি ফুলে ফুলে অরণ্য।

ফুল ঝরে যায় সারাদিন
ছায়া শুয়ে থাকে পা মেলে
তার ছিঁড়ে যাওয়া তায়োলীন
ডানা ঝাপটায় বিকেলে।

পাখি ডানা ঝারে সারারাত
টুপ টুপ টুপ শব্দ
সাদা মোম জ্বালে চেনা হাত
গ্রামোফোন নিস্তব্ধ।

রাত ভরে ওঠে নীল ঘাসে
ছুঁয়ে দেখি ভিজে, ক্লান্ত
ঘুমিয়ে আমারই পাশে সে
পাথরের মত শান্ত।

ব্রাত্য

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১

আলো-ছায়ার অপরাহ্নে আর্যাবর্ত নীল
ছাড়িয়ে এসে আরো গভীর রঙের মোহানায়
সিন্ধু কিংবা সবিতাকে প্রণাম জানায়। আমার
মনে হ'চ্ছে সবিতাকেই ; যার লাবণ্য চায়
সকল মানুষ, সকল নদী। এবং জন্মভূমি
মন্ত্র হ'চ্ছে স্পন্দনহীন কাঞ্চনজঙ্ঘার

এমন সময় তুমি এলে, যেন আমার মা
রাধার ছায়া তোমার দেহে গভীরতর মানে
হ'য়ে যাচ্ছে। অস্তসূর্য তোমায় মুখে আবির
মাখিয়ে দিচ্ছে, আমায় যেন ব'লছে কানে কানে :
'যুদ্ধে যে-সব ঘৃণা, হিংসা, ভয়ঙ্কর অপ্রেম—
তাদের ফেলে আয় তিনজন ঘর বাঁধি এইখানে'।

২

এক মুহূর্ত হারিয়েছিলাম হয়তো চেতনা
ভুলেছিলাম একশো ভাইয়ের হৃদয়, অন্ধ আলো
দুচোখ বুঁজে এসেছিলো ঘুমের মতো নাম
মায়ের মতো মুখের ছায়ায়। কিন্তু কঠিন কালো
কথা ব'ললো : 'তুমি ব্রাত্য ; রাধা তোমার মা—
রাত্রি আসছে, নিজের ঘরে ফিরে যাওয়াই ভালো।'

নিজের ঘরেই ফিরে যাবো। ভারতবর্ষে আজ
সবাই ঘরে ফিরে যাচ্ছে, কুরুক্ষেত্রে। তাদের
পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। অন্ধকারে ভুবন
ভ'রে যাচ্ছে, মন্ত্র পড়ছে কুরু-পাণ্ডবের
পুরোহিতরা। অন্ধকারেই ডাকবে দুর্যোধন
ঘরে ফিরে যাও জননী, রাত্রি হ'ল ঢের ॥

বিরতিহীন

অরুণ ভট্টাচার্য

আকাশকুসুম কল্পনা করি শয়নে ;
দুঃস্বপ্নের উচ্চকিত স্বর
পরিতাপ তবু রাখবোনা অন্তরে ;
অপরিচয়ের স্নিগ্ধ অন্তঃপুর

বিরতিহীন রাত্রিতে দুর্বহ।
কর্মঠবৃত্তি পুষবোনা আর শরীরে ;
নাগর রীতিতে যদিবা আস্থাবান
অপরিতৃপ্ত আমার চরিত্রের

যেটুকু তমসা কালিঝুলি, ভরা সন্ধ্যায়
ভাসাবো নদীতে খড়ের গাদায় ; শূন্য
হৃদয়কে নিয়ে ফিরবোনা লোকালয়ে।
তথাপি তোমার মুখ উজ্জ্বল, অনিন্দ্য

ফুটে রবে স্থির সকালের সাদা দর্পণে ;
শহরের সুখে মুখ ঘষলেও নিশ্চয়
—'যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে'—
অভাগার দিন কিবা রাত্রির অন্বয় !

আত্মচিন্তা : সত্য, বিশ্বাস ও শিল্পদৃষ্টি

অন্নদাশংকর রায়

"লেডী কিলার"১ লেখা হয়ে গেলে আমার মনে হলো যে আমি liberate করলুম ও liberator হলুম। এভাব আগেও অনুভব করেছি, কিন্তু এমন স্পষ্ট করে নয়। তারপর থেকে ভাবছি আমার দুটি role বা ভূমিকা। একজন মুক্তিদাতা বা liberator, সে মুক্তি দিতে এসেছে। মুক্তি দিয়েই তার মুক্তি। আরেকজন বিশুদ্ধ শিল্পী বা pure artist ; সে সৃষ্টি করতে এসেছে। সৃষ্টি করেই সে বিশ্বসৃষ্টিতে যোগ দিচ্ছে। বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে।

"রত্ন ও শ্রীমতী"তে ২ আমি একাধারে দুই। মুক্তিদাতা ও শুদ্ধ শিল্পী। গোড়ায় ইচ্ছা ছিল কেবলমাত্র শিল্পসৃষ্টি করব। পরে ভেবে দেখা গেল তাতে আমার তৃপ্তি নেই। সেইজন্যে শেষ পর্যন্ত "রত্ন ও শ্রীমতী"র পরিকল্পনা বদলে গেল। এখন ওর মধ্যে সৌন্দর্য সৃষ্টির সঙ্গে libeatror এর সমন্বয় ঘটল। ফলে আমার দায় ও দায়িত্ব বেড়ে গেল। এক চোখ আর্টের উপর এক চোখ বন্ধনমুক্তির উপর—এতে একাগ্রতারও হানি। ভালো করলুম কি মন্দ করলুম এখনো বুঝতে পারছিনে। হয়তো দুই নৌকায় পা দিয়ে তলিয়ে যাওয়াই ঘটবে। কিন্তু এতেই আমার চরম পরিতৃপ্তি। কিংবা বলতে পারো এইটেই pre-determined.

আমার পক্ষে যা স্বাভাবিক তাই তো আমাকে করতে হবে। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। অন্যের সঙ্গে তুলনা করা বৃথা। ওঁদের ধর্ম আমার পক্ষে পরধর্ম। ভয়াবহ। আমি যদি পরীক্ষায় ফেল করি তার অর্থ এই হবে যে পরীক্ষাটা আমারই জন্য অনুষ্ঠিত একটা special test ; সাহিত্যের যদি

---

১ লেডী কিলার—এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত "রূপের দায়" গল্প সংকলনের শেষ গল্প।

২ রত্ন ও শ্রীমতী—ডি, এম, লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশমান উপন্যাস বর্তমানে দুই ভাগ প্রকাশিত হয়েছে।

কোনো general test থাকে আমি তাতে নাম দিইনি। আমি সাধারণ পরীক্ষার্থী নই। সাধারণ পরীক্ষায় পাশ করতে আমার উৎসাহ ছিল না ও নেই। সাহিত্যের কথাই বলছি। আমার বরাবরই সংকল্প নিজের সামনে বিশেষ একটি লক্ষ্য রেখে সেই লক্ষ্য ভেদ করা। লক্ষ্যটা আমারই নির্বাচিত। অস্ত্রও আমারই মনোনীত। লক্ষ্যভেদ অনিশ্চিত। এর জন্য অনেক কিছু করতে হবে। করেছি। করছি।

শান্তিনিকেতন, ১০ই অক্টোবর ৫৬

পুনশ্চ : তারপরে মনে পড়ল যে আমার আরো একটা ভূমিকা আছে। কিন্তু সেই তৃতীয় ভূমিকা বা role আমি "রত্ন ও শ্রীমতী" থেকে স্বতন্ত্র রেখেছি। আমি গান্ধী টলষ্টয় ইত্যাদির সহকর্মী, আমার লেখার ভিতর দিয়ে "kingdom of god" নিকটতর হবে। তোমরা যাকে বলবে utopian আমি তা-ও। কিন্তু এ গ্রন্থে আমি আমার তৃতীয় ভূমিকায় নামব না। সে ভূমিকা অন্য কোনো গ্রন্থের অপেক্ষা রাখে। আমি সে ভূমিকা স্থগিত রেখেছি বলে একেবারে ছেড়ে দিইনি। সাহিত্যে যদি সে ভূমিকায় অবতীর্ণ না হই তবে জীবনে হতে পারি। সাহিত্যের আদর্শের সঙ্গে তাকে খাপ খাওয়ানো খুবই কঠিন। সতর্ক না থাকলে সহজেই প্রচারমূলক হয়ে ওঠে রচনা। ওটা পরিত্যাজ্য। কোনোদিনই আমি প্রচারক হব না। না হয় না-ই হলো utopia.

॥ দুই ॥

"রত্ন ও শ্রীমতী"র জন্যে আমি বিশ বাইশ বছর ধরে প্রস্তুত হচ্ছি। এখনো প্রস্তুতির অনেক বাকী। কিন্তু এখন যে রকম প্রতিবন্ধক পাচ্ছি কখনো সে রকম কল্পনা করিনি। এ বাধা পাঠকদের বা সমালোচকদের কাছ থেকে আসছে না। এ বাধা কাহিনীর মধ্যেই নিহিত। তা বলে কাহিনী আমি বদলে দিতে নারাজ।

আমার এই আভ্যন্তরিক সঙ্কট কারো কাছে খুলে দেখানো যায় না। তোমাকে শুধু ইঙ্গিতটুকু দিলুম। তার বেশী বলব না, এখন আমি মনটাকে এই বলে তৈরি করছি : "Truth must be told. Beauty must be created." দ্বিতীয়টার উপর প্রথমটা নির্ভর করছে। যদি সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে

পারি তবেই সত্যকথনের বল পাব। এতদিন এটা মাথায় ঢোকেনি। ঘুমের এই দিনগুলি আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে এই কারণে যে এখানে এসে আমি আমার প্রতিবন্ধক সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি এবং কী করে তাকে অতিক্রম করতে হবে তারও আভাস পেয়েছি। কিন্তু সুন্দরকে সৃষ্টি করব বললেই তো সৃষ্টি করা হয় না। সাধনা চাই। সময় লাগবে। তোমরা অধীর হোয়ো না। আমি যা লিখতে যাচ্ছি তা বিপুলা পৃথ্বী ও নিরবধি কালের জন্যে।

ঘুম, ১২ই জুন, ৫৭

॥ তিন ॥

ইতিমধ্যে আমি আরেক বিপদে পড়েছি একখানা খামে বন্ধ চিঠি খুলে। চিঠিখানা এসেছিল জানুয়ারির গোড়ায়। খুলব কি খুলব না করে চার মাস কাটিয়ে দিলুম। কাল ওটা আমার সাম্প্রতিক চিঠিপত্রের সঙ্গে মিশে গেছল। অন্যান্য চিঠি পড়তে পড়তে ওটাও খুলে পড়লুম। আর অমনি আমার মনটা বিমর্ষ হয়ে গেল। ওতে কী ছিল তোমাকে বলব না, বলা উচিত নয়। শুধু এইটুকু বলি যে "রত্ন ও শ্রীমতী" আর বোধহয় লিখব না। যদি লিখি, আর বোধ হয় প্রকাশ করব না। ঈশ্বরকে খুশি করার জন্যে লিখতে পারি, কিন্তু মানুষকে বিব্রত করে ছাপাতে পারিনে। রবীন্দ্রনাথ হলে গল্পটা বদলে দিতেন। আমি এক্ষেত্রে তাঁর শিষ্য নই। সুতরাং * * * বাংলা দেশের পাঠককে বলব ক্ষমা করতে।

আমার আজকালকার creed হচ্ছে ঈশ্বরকে খুশি করার জন্যে কাজ করা। "কাজ" বলতে লীলাও বোঝায়। সৃষ্টি করাও লীলা। আমার এই creed আমাকে অত্যন্ত কর্মতৎপর রেখেছে ও রাখবে। বই লেখাটা বড় কথা নয়। সৃষ্টি করাটাই বড় কথা। তা যদি করতে পারি তবে প্রকাশ করা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। প্রকাশ একদিন হবেই। মহৎ সৃষ্টি দশ বিশ বছর অপ্রকাশিত থাকলে তার মহত্ত্ব হারায় না যেমন Hopkins এর কবিতা। কবির মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে—বোধহয় ত্রিশ বছর পরে—তার প্রকাশ ঘটে। কবি নিজে তাকে কোনোরকম গুরুত্ব দেননি। পরবর্তী কাল দিয়েছে। কবি জেনেও যেতে পারলেন না যে ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর কাব্য স্থিতিলাভ করল। আমারও ভাগ্য আমাকে Hopkins এর মতো অজ্ঞাতবাসের দিকে ঠেলে

নিয়ে যাচ্ছে। তবে আমি বেঁচে থাকতে দেখে যেতে চাই আমার সৃষ্টির প্রকাশ। এ দুর্বলতা যেদিন যাবে সেদিন আমি spiritually আরো বেশী advanced হব।

তুমি আমার সাধনা ও উপলব্ধির কথা জানতে চাও বলে জানাই। এর মধ্যে আমার এমন কোনো উদ্দেশ্য নেই যে তোমাকে ভজাই। আমি কোনো উত্তরাধিকারী রেখে যাচ্ছিনে সাহিত্যে। আমি নিতান্তই একক। আমি আমার জীবনভর চেষ্টা করেছি নিজের মতো করে বাঁচতে। আর সেই বাঁচার অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজের মতো করে লিখতে। এ চেষ্টা ষোলো আনা সফল না হলেও এছাড়া আর কোনো পথ আমার পথ নয়। আমার পক্ষে অপথ। বার বার পথচ্যুত হতে হতে এখন আমি আমার পথ পেয়ে গেছি। আর ক'বছর পরমায়ু জানিনে। দশ বছর, পনেরো বছর, যে ক'বছর বাঁচি নিজের পথেই চলব। আর যশ চাইনে, আর ধন চাইনে, আর মান চাইনে। যা চাই তা আরো সময়, আরো নিরুদ্বেগ, আরো অব্যাঘাত। কোথায় পাই এসব? হিমালয়ে? পল্লীগ্রামে?

এবার তোমার লেখার সম্বন্ধে বলি। লেখাকে জীবিকা করে তুললে অধিকাংশের বেলা যা হয়েছে তোমার বেলাও তাই হবে। Art নয়, commercial art. দেশের সমাজব্যবস্থা বদলে গেলে সবাই লিখবে প্রচারধর্মী উপন্যাস, তুমিও তাই লিখবে। Commercial art নয়, mass entertainment এর সঙ্গে political propaganda র সমাহার। যদি সত্যিকারের আর্ট নিয়ে থাকতে চাও তা হলে অন্য জীবিকার সন্ধান কর। "আর্ট" কথাটার অর্থ এখানে তোমার উপর ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি যদি মনে কর Camus-র "Plague"-ই আর্ট, বেশ তাই হোক। কিন্তু বাংলা দেশে ওরকম বই লিখেও তুমি বাসা খরচ চালাতে পারবে না। প্রকাশকরা তোমার উপর কেবলি চাপ দিতে থাকবেন বাজার চলতি বই লিখতে। তুমিও দাদন নিয়ে তাই সরবরাহ করতে থাকবে।

শান্তিনিকেতন, ৬ই মে ৫৮

পুনশ্চ : যারা ডাক্তার বা নার্স নয় তাদের পক্ষে রোগ নিয়ে নাড়াচাড়া করা বিপজ্জনক। যারা saint নয় তাদের পক্ষে পাপ নিয়ে নাড়াচাড়া করা বিপজ্জনক। তেমনি যারা সৈনিক নয় তাদের পক্ষে Evil নিয়ে নাড়াচাড়া

করা বিপজ্জনক। শিল্পীরা যথাসম্ভব এসব বিপদ নিয়ে নাড়াচাড়া করে না। করলে স্বধর্মচ্যুত হয়, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তা বলে একজন মানুষ তো কেবল শিল্পীই নয়। সে কখনো কখনো saint, সৈনিক, ডাক্তার। তাই শিল্পের সঙ্গে অবান্তর অ-শিল্প জড়িয়ে যায়।

॥ চার ॥

"কেন বাঁচব" এ প্রশ্ন আমাকে বছরের পর বছর ভাবিয়েছে। ঐশ্বর্যের কোলে, মাধুর্যের কোলে থেকেও। টলষ্টয়েরও এরকম হয়েছিল। তিনি নাকি আত্মহত্যার উপকরণ সঙ্গে রাখতেন। অথচ তাঁর মতো সফল মানুষ ক'জন?

আসলে এ প্রশ্নটা আসছে অন্যান্য মানুষের দুর্দশা দেখে, দুর্দশার অন্ত না দেখে। তুমি যদি অন্তরে অন্তরে সাম্যবাদী হতে তা হলে বিশ্বাস করতে যে সব দুর্দশার মূল ধনতন্ত্র, এবং ধনতন্ত্র একদিন যাবেই, সুতরাং দুর্দশা চিরদিন থাকবে না। এরকম একটা আন্তরিক বিশ্বাস যাদের আছে তারা জানে কেন বাঁচবে, যাদের নেই তারা যদি বিশ্বাস খুঁজে পায় তা হলে তারাও জানবে কেন বাঁচবে। তবে আমাদের এই ঘোর জটিল যুগে কোনো বিশ্বাসই বেশীদিন টিঁকতে পারে না। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সুখী ও সফল হয়েও "কেন বাঁচব"র উত্তর দিতে না পারলে will to live শিথিল হয়ে আসে। ভিতরে ভিতরে প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়।

"কেন বাঁচব" মানে "কী বিশ্বাস করব।" অনন্ত কয়েকটি সূত্র ঠিক হয়ে গেলে দেখবে বাঁচার একটা হেতু মিলবে। আমার উপর দিয়ে কতবার যে কত ঝড় বয়ে গেল, এখনো যাচ্ছে, আমি বেঁচে আছি কিসের জোরে? বিশ্বাসের জোরে। আমার জীবনে একটা লক্ষ্য আছে, সে লক্ষ্য ভেদ করতেই হবে। "তদ্ বেদধ্ব্যং সোম্য বিদ্ধি।" তা ছাড়া নিজের জীবনের চেয়ে বড় "ভগবানের রাজ্য" বা সর্বোদয় বা সকলের প্রতি সমদৃষ্টি বা ন্যায়াচরণ। "Seek ye the kingdom of God and all these shall be added unto you." এইসব সূত্র আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

পত্রগুলি সুরজিৎ দাশগুপ্তকে বিভিন্ন সময়ে লিখিত।

কবি পরিচিতি অরুণ মিত্র

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

চতুর্দিকে নিরিখ বদলের সময় এই পঞ্চাশের সমকালীন সাহিত্যঅভ্যাসে স্থিরতা আশা করা যায় না। ফলে, স্থিরতা কিংবা সংযমের অল্প-স্বল্প দোলাচলে শিল্পের একমুখী উদ্ভাস 'ইউটোপিক্' সত্যে পর্যবসিত হয়েছে। সুতরাং এখন আর কোনো একটিমাত্র সুঠাম ভাবনায় কল্পনার ঘরোয়া নিশ্চিতি নেই। গত 'তিরিশ' এবং মহাযুদ্ধের পর থেকে নানা খাতে বুদ্ধি ও রুচির দৃষ্টিভঙ্গি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বহুবর্ণ ভাঙ্গাগড়ার মুখোমুখি। এইসব বিচিত্র মনন-প্রক্রিয়ার মূলে কাজ করছে ভৌগোলিক বায়ুতে অর্থনীতিক অন্তর্স্রোত। ওয়েল্‌স্ কথিত 'থিংস্ টু কাম্' এবং চ্যাপ্‌লিন্-সৃষ্ট 'মডার্ণ টাইম্‌স্'-এর হাস্যকর যান্ত্রিকতা তাই গাণিতিক ফলশ্রুতির মতো সংক্রামিত হ'তে চলেছে। বেকন-এর ডিকটাম্ অনুযায়ী সাহিত্যিক মূল্যায়ন অর্থে: Read not to contradict or confute, nor to believe and take for granted, nor to find talk and discourse, but to weigh and consider যে এমন পরিপ্রেক্ষিতেও একমেব সৎ মাননির্ণয়, আদৌ তা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। To weigh and consider যেমন ধ্রুব প্রয়োজনীয়, তেমনই contradiction-এর দ্বন্দ্বও সমান্তরাল স্বীকৃতি দাবী করতে পারে। আবার ভাবপ্রবণ রূপকথনকে যে যুক্তিতে weigh and consider করা ব্যবচ্ছেদের নামান্তর, সেই বিশ্বাসেই গঠনমূলক সামাজিক উপকথনকেও contradict করা শুধু এক নির্বোধ অসহযোগিতা মাত্র। অনেকের মতে শিল্পের প্রধান লক্ষণ জনমনের সন্তোষ সাধিত উত্তরণে; অথচ বৃটেনের এককালীন বহু হাজার মানুষ মুগ্ধ-করা Deadwood Dick এবং Sweeney Todd কোনোটিই নাকি সাহিত্যের জারিত শিল্পকর্ম হতে পারে নি (Sir John Hammerton এর মন্তব্য অনুসারে)। পূর্বের একটি আলোচনায় আমি রামায়ণ এবং অন্যান্য কিছু দেশজ মহাকাব্যের এবং লোকরঞ্জক অধিক প্রচারিত কাব্যের বিপক্ষেও অনুরূপ কয়েকটি যুক্তি দেবার চেষ্টা করেছিলাম; এই সর্তে যদিও

একমাত্র চিন্তাপ্রধান রচনাগুলিই নিপুন সাংস্কৃতিক অবয়ব পেয়েছে, এমন দাবী সঠিক মনে করি না। আমার বক্তব্য ছিলো, ভাষার ব্যবহারে প্রতীকের প্রয়োজন হৃদয়বৃত্তির দরজায় যেন অকারণ পুলকের শিহরণ না আনে, Language is a symbol for intelligence rather than a stimulus to sense, and accordingly the beauties of discourse which commonly attract attentions are merely the beauties of the objects and ideas signified; yet the symbols have a sensible reality of their own, a euphony which appeals to our senses if we keep them open'—G. Santayana.
গনমানস উদ্বোধক সাহিত্যে বায়ুতন্ত্রের প্রবল নাটকীয়তা থাকতে পারে, কিন্তু স্নায়ুগঠনের কঠিন কাঠামো অনুপস্থিত। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, যে-কোনো সমকালীন সমাজ জাগরণের সাহিত্য প্রচেষ্টাকেও বিন্দুমাত্র উপেক্ষা করা আমি অনুচিত মনে করি বরং তা সাহিত্যের পর্যায়ে উঠলো না দেখেও তার ক্রীয়াশীল ক্ষণদীপ্তির তৎকালীন প্রয়োজনীয়তা বোধ করি। কেননা সমাজ বিন্যাসের মূলে সর্বধরণের আন্দোলনই অভিনন্দনের, অবশ্য যদি তার সততার প্রশ্ন না ওঠে।

স্বপক্ষের যুক্তির প্রয়োজনে একটি ঘটনার উল্লেখ করে সম্পর্কিত আলোচনাটি আরম্ভ করবো : সেল্মা লাগেরলফ-এর Goesta Berling Saga-র প্রসঙ্গে কথা বলতে বলতে টমাস মান্ সেল্মাকে স্বরচিত Buddenbrooks-এর জন্ম রহস্য এইভাবে প্রকাশ করেছিলেন : 'This (অর্থাৎ Buddenbrooks) too had originally been a family matter and family entertainment, scribbled as a lark by a rather harum-scarum youth of twenty. I read it to my people and we laughed till we carried. The world would know how to take hold of it.' এবং গ্যেটে-র ব্যক্তিমতটির সমর্থনে টমাস মান্-এর আরও একটি মন্তব্য তাঁর একই নিবন্ধের অন্য একটি স্থান থেকে উদ্ধৃত করি, The artist improves upon the world not by moral precepts but by quite different means. He improves upon it by endowing it with spiritual meaning; he uses thought, word, image to set down his own life and, figuratively, life as a whole. His task is to animate—just that and nothing more.

উত্তরসূরী

শ্রীযুত অরুণ মিত্রের প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'প্রান্তরেখা' সম্ভবত ১৩৬০-এ প্রকাশিত হয়। ততটা চমকিত না হলেও 'প্রান্তরেখা'র আগমনে ঈষৎ আলোড়িত বোধ করেছিলাম বইকি। ইতিমধ্যে বেশ একটা অন্তর্টান কাটিয়ে উঠতে কিছুটা সময় লেগেছে অরুণবাবুর। মনে হয় আঙ্গিক পরীক্ষার টানাপোড়েনের মাঝখানের দিনগুলো নিঃশব্দে কেটেছে তাঁর ; এবং খানিকটা সুযোগ সুবিধার অভাবেও বটে। কেননা, কিছুকাল পূর্বের 'সীমান্ত'-তে (অধুনালুপ্ত কবিতাপত্র) মণীন্দ্র রায় এমন দু'একটি আক্ষেপ করেছিলেন, মনে পড়ছে। মধ্যবর্তীকালীন যে-অন্তর্টান অরুণ মিত্রের উপর চাপ দিয়েছে তার ফল অসুস্থ হয় নি। প্রমাণ তাঁর দ্বিতীয় কবিতা সংকলন 'উৎসের দিকে'। এই দুটি পর্যায়ের মধ্যে পারাপারের সাঁকো হয়ে আছে তাঁর অন্তবর্তীকালের অংশ 'স্মরণকাল'। 'প্রান্তরেখা'র কবিতাগুলি ইংরাজি ১৯৪৩ সালের পূর্বে লেখা। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৮-এ রচিত হয়েছে 'স্মরণকাল' এবং একটু নীরবতার পর, ১৯৫১ ছাড়িয়ে এসে তিনি 'উৎসের দিকে'-র মূল কবিতাগুলি লিখেছেন। অতুলনীয় পরিবর্তন চিহ্নিত করেছে এই তিন পর্যায়কে। বিশেষ করে 'প্রান্তরেখা' থেকে 'উৎসের দিকে' বাস্তবিক একটি দীর্ঘ যাত্রার জবানবন্দী। সেই দৃষ্টিকোণে 'প্রান্তরেখা' এবং 'স্মরণকাল' বক্তব্যের রঙে যতোটা না হোক অন্তত আঙ্গিক প্রকাশে অবশ্যই পৃথক কীর্তি। এবং এই তিনটি পর্যায়কেই প্রায় সম্পূর্ণত সংকলিত করা হয়েছে 'উৎসের দিকে' নামগ্রন্থটিতে।

শ্রাবণ 'সাহিত্যপত্র' ১৩৬৩-তে ফরাসী কবি জাক প্রেভের-এর কবিতা সম্পর্কে ভূমিকায় অরুণ মিত্র প্রেভের-এর কবিতায় সুররিয়ালিজ্‌মের প্রভাব বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন—'মনে যেমন কথা আসছে তেমনভাবে লিখে যাওয়া, বাক্যের বাহ্যিক সংযোগকে উপেক্ষা করা, শব্দের ওলট পালট স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করা, ধ্বনি বা অনুসঙ্গ অবলম্বন করে এক শব্দ থেকে আর এক শব্দে, এক চিত্রকল্প থেকে আর এক চিত্রকল্পে এবং এক তাৎপর্য থেকে আর এক তাৎপর্যে চলে যাওয়া—তাঁর এ বৈশিষ্ট্য সুররিয়ালিজ্‌মের দান। প্রেভের-এর লেখায় এমন শব্দের খেলা থাকে যে ভাষান্তরে তা রাখা যায় না। তাঁর কবিতায় একটা চলচ্চিত্র ধর্মও যেন আছে। তিনি বর্ণনা করেন একটা 'কথার ফটোগ্রাফ' দিয়ে। বস্তু আর প্রাণীকে দেখিয়ে দেখিয়ে তাঁর

বক্তব্যকে যেন শরীরী করেন। এই সঙ্গে তার বলার ধরণও বিবেচ্য। ধরণটা গল্প বলার। কবিতা যেন এ কালের রূপকথা বলছে। তাই তাঁর লেখায় সাধারণ লোকের মুখের কথার আস্বাদ।' বিশ্লেষণটি আশ্চর্যভাবে প্রযোজ্য অরুণ মিত্র সম্পর্কে। সুতরাং উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হলেও উপেক্ষা করতে পারলাম না। অরুণ মিত্রের কবিতায় photographic effect-এর আমেজ পাই। যেটি তিনি সম্ভব করেন তাঁর বিষয় ও বস্তুর সরল ব্যক্তিকরণের (personification) মাধ্যমে। এই শেষের দিকের গুণগুলি বিশেষভাবে তাঁর 'মরণকাল' এবং 'উৎসের দিকে'র পর্যায়ে সুপ্রচুর লক্ষিত হবে।

'প্রান্তরেখা'র অরুণ মিত্র, তারুণ্যের উজ্জ্বল সহজতায় এবং সম্ভলব বঙ্কিম যন্ত্রণাগুলির মোচড়ে মোচড়ে একটু বা বিপর্যস্ত ; নিশানা ঠিক করতে গিয়ে দামাল উপলব্ধির হাতে প্রায় ভগ্নউৎসাহ। কয়েকটি উদাহরণ দিই—

ঘূর্ণিত পতন আছে আশে পাশে যোজন গভীরে,
অসম্ভব অভিপ্রায় দোলায় শিকড় কাটা মাটি
বিখণ্ডিত রশ্মি হয় নিরুদ্দিষ্ট দিগন্ত সমীরে। (দোটানা)

কিংবা, মেঘপর্বত বাহিরে তুলেছে শ্যাম শিখর।
জানলায় চেয়ে থাকো অলকার গৃহ অলীক,
মৌসুমী বায়ু বুঝিবা পাগল, দূরাগতের
হাহাকার বেঁধে ভিতরের ছাদে বারম্বার। (উত্তরমেঘ)

পরে কল্পনামুখী উর্দ্ধহাত প্রতীক্ষা, যেমন,

এখন যে বিরামের সুরভি সময় ছিলো
নিত্য নিয়মিত,
এখন যে উষ্ণ স্নায়ু মধ্যাহ্নের স্তূপ ঠেলে
পুরানো অভ্যাসে
বাতাসে জুড়ানো যেত। (চকিত আলো)

এখান পর্যন্ত এসে আমরা বুঝতে পারি তাঁর যাওয়া-আসা চলেছে এক আকাঙ্ক্ষা উচ্ছ্বাসের উচ্চারিত প্রায়-অভিমানে, যেন তিনি টের পেয়েছেন সেই শব্দটাকে ; অথচ সত্যদর্শনের কঠিন নিরিখে স্পষ্ট ঠাহর করতে পারছেন না প্রান্তরেখা। এইখানে একটু নতুন করে লিখলেন,

আমাদের অজ্ঞাতবাস শেষ হয়েছে।
তবু আশ্চর্য লাগে—
রাস্তায় সেদিনকার পায়ের ছাপ
এখনো রহস্যময়,
গলিত প্রাসাদের গাম্ভীর্য
কী গভীর এখনো। (মোহ)

মোহের গ্রন্থিগুলো কাটতে কাটতে ততোক্ষণে একটা বড়ো বক্তব্য পেয়ে গেছেন অরুণ মিত্র এবং তাঁর প্রশস্ত পথটিও হঠাৎ-ই আবিষ্কার করেছেন। এরপর 'মরণকাল'-এ চিহ্নিত হ'লো একটি আশ্চর্য গদ্যের আঙ্গিক। তবুও শিছনের সমস্ত nostalgic আবেদনগুলো উপেক্ষা না করে তিনি 'মরণকাল'-এ উপস্থিত করলেন বাংলা কবিতার অতি-আধুনিক কথনভঙ্গি, চিত্রকল্পগুলিকে দিলেন ঋজু ব্যক্তিকরণের উত্তাপ। হাটে-বাজারে-আড্ডায় ব্যবহৃত লোকজ কথাগুলো বুনে বুনে একটি গম্ভীর সংহত কর্ম আমদানী করলেন। অনেকটা গল্পকারের মতো তিনি বলতে লাগলেন। গল্পে গল্পে শুনলাম

আমার এ শহরের মাঝখানের নির্জন নদীর
ঘাস-মোড়া পাড়ে
পায়ে পায়ে মরা পথ বেয়ে
জাহাজ-ঘাটায় আজ যদি যাওয়া যায়
দেখা যাবে সমস্তই অস্পষ্ট কাঠামো।

বিভক্ত প্রতীক্ষা কেন
আর কেন ?
হে সাথী
বৃষ্টি এল। (বর্ষমান)
আমার সেই সিঁড়ি ভাঙার কাহিনী মহৎ কাহিনী,
দুটো মুঠোয় দুটো কাঁধে বাঁকানো কোমরে
আমার ভারবহনের সে ছবি মহৎ শিল্প,

কিন্তু এক প্রবল স্বস্তির শূন্য আমাকে টানছে আর এক
অভিজ্ঞতার শিখরে,
আসন্ন দিনে পাখা ভর দেবার সুযোগ পাব যেন
ইতিমধ্যে অনুভব করছি আমার কপালের ঘাম
নিঃসাড়ে শিশির হয়ে ফুটছে। (সীমান্ত)

কখনো-বা একটু অন্য ধরণের কথকের ভূমিকায় তাঁকে দেখি। যেন ডায়েরীর কোনো ছেঁড়া পাতা পড়ে শোনাচ্ছেন—

আমাদের পরস্পরের কথাবার্তা জুড়ে গিয়ে সবুজ এক দ্বীপ তৈরী হয়
সেখানে সকাল এসে পড়ে ছাতের ফাটল দিয়ে
আমাদের পরস্পরের কথা জোড়া লেগে লেগে স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ায়
তার উপর ভর দিয়ে ঘরটা অটল থাকে,
আমাদের পরস্পরের কথাবার্তা ফুলতে ফুলতে বন্যায় ভাসিয়ে
নিয়ে যায় একঘেয়ে গোডানি (ভ্রূকুটি)

এই কবিতাটির শেষের দিকের কয়েকটি পংক্তি চিত্রকল্পের বর্ণনদক্ষতার গুণে সমগ্র কবিতাটিকে তুলে নিয়ে গেছে তীক্ষ্ণ একটি climax-এর কল্পমান শিখরে ; এবং সর্বশেষ পংক্তি 'তারপরেই ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি হয়ে নামবে' থাকায় কথিকাটি যেন কবিতার পেলব ঢলে মসৃণ নেবে গেছে। 'ভ্রূকুটি' আধুনিক কাব্যে একটি অবশ্য উল্লেখ্য সংযোজন। অরুণ মিত্রের কবিতার আর এক দিক হ'লো ভালোবাসা। কিন্তু তাঁর ভালোবাসার মানুষটি বিচিত্র ভঙ্গিতে কথা বলে,

এ কোন নির্জন ভালোবাসা
আমাকে উত্তাল করে রাখে
শিখরে শিখরে রক্তে রক্তোচ্চার গানে

ঢেউয়ের পরতে আমি যে বীজ ছড়াই
ফাটে তা ভুবন্ত চাপে,
অনেক অঙ্কুর ভাসে
জীয়ন্ত আবেগে আর আমার মুখের চারিদিকে
জ্যোতি হয়ে চায় ঝলকাতে। (জাগর)

কিংবা, পৃথিবীর দেউলিয়া মাঠে
একটি বিপন্ন ঘর গড়া হয় বুকে বুক রেখে (শিশুর কান্নার ঘর)
আমি কি অবাধ্য নৌকা
আলেয়ার তীর ঘেঁষে ডুবে যাব উচ্ছাসের ফুঁয়ে ?
হয়তো তা জানো তাই বননীল জাদু
ভুলে গিয়ে কাঁপো তুমি
শীতের গাছের মতো কখনো কখনো (আহ্বান)

'প্রান্তরেখা'র স্বরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্তের সংহত নিটোল ছন্দের আঙ্গিক ছেড়ে 'মরণকাল'-এর প্রথমার্ধেই একটু একটু ক'রে পয়ারের মুক্তিতে চলে এসেছেন অরুণবাবু, এবং মাঝে-মধ্যে মুক্ত বা ভঙ্গ পয়ারে। অরুণ বাবুর ছন্দের হাত নিখুঁত। প্রমাণার্থে নিচে দুটি স্তবক তুলে দিচ্ছি।

আমার জয়ের । গান টলায়
কলকাতার । অথই ঘুম । সাগর,
আমার ভেলায় । ভিড় জমাট,
উৎসবের । আশায় রাত । ডাগর । (জয়গান)১
অবনত । মুখী প্রেম । মাতাল,
রোমাঞ্চে হে । য়ে যে গেল । জমি,
পৃথিবীর । ঘুর সোনা । গড়া,
স্বর্গ নেই । নেই আর । পাতাল । (বিষ)২

প্রথম পংক্তি : ৬।৫ (অক্ষর বৃত্তের ঢঙে), ৪।৪ (স্বরবৃত্তে)
দ্বিতীয় পংক্তি : ৫।৫।৩ („), ৪।৪।২ ( )
তৃতীয় চতুর্থ পংক্তি : পুনরাবৃত্তি।
প্রথম পংক্তি : ৪।৪।৩ (অক্ষর বৃত্তের ধারায়), ৪।৪।২ (স্বরবৃত্তে)
দ্বিতীয় পংক্তি : ৪।৪।২ ( ), ৪।৪।২ ( )
তৃতীয় পংক্তি : ৪।৪।২ ( ), ৪।৪।২ ( )
চতুর্থ পংক্তি : ৪।৪।৩ ( ), ৪।৪।২ ( )

উপরের যতিপাত একান্ত নিজেরই রুচি অনুসারে করে দেখালাম। আসলে দুটি কবিতাই লেখা হয়েছে স্বরবৃত্তে, যার ব্যবহার তিনি করেছেন অধিকাংশই কানের নির্ভরে। নচেৎ তিনি নিশ্চয়ই জানতেন 'কলকাতার' 'উৎসবের' 'পৃথিবীর'—'ঘুর সোনা' ইত্যাদির কেবল তিন মাত্রা প্রাপ্য এবং 'আর নেই' প্রভৃতির দুই মাত্রা। এইখানে তিনি সঙ্কোচন প্রসারণ পদ্ধতিতে অঙ্ক ঠিক রেখেছেন, অর্থাৎ শ্রবণকে যথাসম্ভব প্রখর চেতন রেখে, খাটিয়ে নিয়েছেন। তাঁর পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলা যায়। তিনি কয়েকটি দুরন্ত ছন্দের কবিতা লিখতে পেরেছেন এর ফলে।

ইতিমধ্যে ক্রমেই তিনি ছন্দোমুক্তির দিকে। এবং এই ছন্দোমুক্তির কারণে তিনি গদ্যরীতিকে অদৃশ্য মাত্রার পোষাকে অনবদ্য করে তুললেন। তাঁর কবিতার content ততোদিনে রূপকথার গঠনে ভঙ্গিতে অপর রাজত্বের কথা বলতে আরম্ভ করেছে যেন ; 'উৎসের দিকে'-র থেকে দুচারটি উদাহরণ দিই—

এখানে আমরা আপন হতে পারি দুর্বার মতো
কিম্বা বৃষ্টির মতো
ইতস্তত যে ভয়
জড় শুষে নেয়
যে মরুভূমির দাপট মেঘ উড়িয়ে দেয়
তাকে ঠেলে আমরাই ভবিষ্যৎ হতে পারি। (ফসলের সুরে)

এ জ্বালা কখন জুড়োবে ?
আমার এই বোবা মাটির ছাতি ফেটে চৌচির। উঠোনের ভালোবাসার
ভোর এক মুঠো ছাই হয়ে ছড়িয়ে যায় শুকনো লাউডগার মাচায়, খড়ের
চালে কাঠবিড়ালির মতো পালায় অনেক দিনের আশা, শুধু ভাসা-ভাসা
কথার সূত্রে লেগে থাকে এক জলমোছা দৃষ্টি দুপুরের স্বর্য হয়ে। কোথায়
সে আকাঙ্ক্ষাকে পোষবার সংসার, ভবিষ্যৎকে আদর করবার সংসার।
গড়বার, আদর করবার, ফুলে ফলে মিলিয়ে দেবার। মিলিয়ে
গেল তা এই ক্ষোভে। (এ জ্বালা কখন জুড়োবে)

এখন আলোর স্ফটিকে কত নির্বাসিত মুখের ছায়া। তাদের সকলের
স্তব্ধ শ্বাসের চাপে এই স্তব্ধতা কি ফাটবে না ?
হে বন্ধ্যা, তোমার গর্ভে যন্ত্রণা একবার নড়ুক। (রাতের পর দিন)

'উৎসের দিকে' বিশেষ পর্যায়ের কবিতাগুলিতে স্বচ্ছন্দ নিজস্বতাকে গভীর সমবেদনার সরলীকরণে সমস্ত খাতে, ফাটলে সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। তাঁর কবিতা ক্রমেই হয়ে উঠেছে আধুনিক দশকের ভ্রষ্টস্বপ্ন মানুষের অতলস্পর্শী জবানবন্দী।

যদিচ ফরাসী কবিদের প্রভাব তাঁর উপর যথেষ্ট, তথাপি অরুণ মিত্র আত্মস্থ হতে জানেন দক্ষ শিল্পীর সহযোগিতায়। এবং অবশ্যই তাঁর কবিতা বিষয় ও বস্তুর সমন্বয়ে, ভালোবাসার বিশাল দায়িত্বে, রূপকথার দুরন্ত দিনগুলোর স্বপ্নে স্বপ্নে বাঙলা কাব্যে একক নিপুণতার স্বাক্ষর রেখেছে। তিনি আমাদের 'এক একটা শান্ত দিন', 'আর এক আরম্ভের জন্যে' 'আমার কাছে বদলে যায়' 'সেখানে উত্তাপ নেই' ইত্যাদি 'উৎসের দিকে'-র অন্যান্য কবিতাগুলি উপহার দিয়েছেন বলে বাঙালী পাঠক কৃতজ্ঞ। অনেক কাল কবিতাগুলি থেকে অসময়ের উজ্জ্বলতা পাবো। •

আধুনিক বাঙলা কবিতার আমূল বিশ্বাসে একটি সুস্থ অংশ জুড়েছেন অরুণ মিত্র। ১৩৬৪-র 'উত্তরসূরী'তে তাঁর 'ঘুমের দরজা ঠেলে' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। কবিতাটির অন্তিম স্তবকটি এইমত।

'ক্লান্ত পাহাড়টাকে তারা কি ক'রে বাগ মানিয়েছে জানিনা। সে কথা তারা বলল না। কালবৈশাখীর কথাও তারা বলল না। অথচ তাদের কপালে ঝঞ্ঝার অনেক রেখা। বেশ বুঝলাম তারা মাঝ রাস্তায় ঝড়ের কেশর মুঠো করে ধরেছিল আর বাঁশঝাড়ের মাথায় লকলকে বিদ্যুতের দিকে সামনা সামনি তাকিয়েছিলে। কিন্তু সে সব তারা একটুও বলল না। তারা বলল কেবল জল আর নরম মাটির কথা।'

• উৎসের দিকে (পরিবর্ধিত সংস্করণ) : অরুণ মিত্র। বাক সাহিত্য আড়াই টাকা।

কর্ণাটের "দাসকূট" মতবাদ ও দর্শন

যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

অতি বিচিত্র স্থান কাবেরী ও গোদাবরীর মধ্যস্থিত ভারত ভূভাগ—যাকে আমরা কর্ণাটক দেশ বলি। একদিন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসকে এখানে এসে বিজয়াঙ্কার ১ প্রতিভায় চমৎকৃত হ'তে হয়েছিল। মাহিষ্মতীতেও শঙ্করাচার্যকে মণ্ডন মিশ্রের গৃহের সন্ধান করার বিশেষ প্রয়োজন হয়নি। কারণ—কীরাঙ্গনারা পর্যন্ত সেখানে শাস্ত্রীয় ভাষায় দিনরাত কথাবার্তা বলেন—

স্বতঃ প্রমাণং পরতঃ প্রমাণং কীরাঙ্গনা যত্র গিরং গিরন্তি।
দ্বারস্থনীড়ান্তরসংনিরুদ্ধা জানীহি তন্মণ্ডনপণ্ডিতৌকঃ॥
ফলপ্রদং কর্ম ফলপ্রদোভজঃ কীরাঙ্গনা যত্র গিরং গিরন্তি।
দ্বারস্থনীড়ান্তরসংনিরুদ্ধা জানীহি তন্মমণ্ডনপণ্ডিতৌকঃ॥
জগদ্ধ্রুবং স্যাজ্ জগদ্ধ্রুবং স্যাৎ কীরাঙ্গনা যত্র গিরং গিরন্তি।
দ্বারস্থনীড়ান্তরসংনিরুদ্ধা জানীহি তন্মমণ্ডনপণ্ডিতৌকং॥ ২

এবং সকলকে, পশুপক্ষীকে পর্যন্ত, বিস্ময় সম্ভ্রমত করেছিলেন বলে, সকলে পশু পক্ষীর ভাষণ থেকে মণ্ডন মিশ্রের গৃহের সন্ধান পেত। এখানে শঙ্করাচার্যকে উভয়ভারতী বা সারদার সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। এই সারদা বা বাগ্‌দেবীর প্রকৃত স্বরূপের বিষয় শঙ্কর কোনও দিন ভোলেননি; কারণ, তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ মঠে, শৃঙ্গেরি মঠে, তিনি উত্তরকালে "সারদা" মূর্তি স্থাপিত করেন।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রামানুজ যখন তামিলনাদ (শ্রীরঙ্গম্) থেকে প্রত্যাখ্যাত হলেন কর্ণাটক বসুধা তাঁকে বুকে স্থান দিয়েছিল। কর্ণাটে এসে তিনি জিন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত বল্লাল

---

১ কালিদাসের সমসাময়িক কর্ণাটকের নারী কবি।

২ মাধবাচার্য-বিরচিত শ্রীশঙ্কর দিগ্বিজয়, শ্রীপ্রবণনাথ জ্ঞানমন্দির গ্রন্থমালা—পুষ্প, হরদ্বার, ১৯৪৪-৪৫

রাজকে ধর্মান্তরিত করে ধীরে ধীরে মেলকোটের সুপ্রসিদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠা পূর্বক ধর্ম প্রচার করতে থাকেন।

বীরশৈব ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বসবন্নও খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে অন্ধ্র দেশ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে কর্ণাটকে সুপ্রতিষ্ঠ হন। তিনি কল্যাণের বিজ্জলরাজের অধীনে কার্যভার গ্রহণ করে রাজার সহযোগিতায় ধর্মপ্রচার করেন। এই সহযোগিতা প্রদানের ফলে বিজ্জল প্রাণ হারান এবং খুব সম্ভবত, বসবন্নও নিহত হন। স্বধর্ম সাধন বিষয়ে বীরশৈবেরা কোনও বাধা কর্ণাটকে অনুভব করেন না। অন্যদিকে কর্ণাটকের বৈষ্ণব যাঁরা, তাঁরাও অনেকেই শিবেরও উপাসক। এবং হরি হরের উপাসকদের এখানে "হরি-হর" সম্প্রদায়ও রয়েছে।৩

বসবন্ন ও রামানুজ প্রায় সমসাময়িক। উভয়েই স্ব স্ব জন্মভূমি থেকে কর্ণাটকে এসে স্বধর্ম স্থাপন করেন খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কর্ণাটকেরই উদীপিনবাসী মধ্বাচার্য দ্বৈত বেদান্ত-বাদ প্রচার করেন।

অন্যদিকে মহারাষ্ট্র দেশের সন্তদের অদ্বৈতভক্তিবাদও এদেশে কিছু প্রভাব যে বিস্তার করেনি তা' নয়। পন্ধরপুরের পন্থর বিট্টল যুগে যুগে বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, বৈষ্ণব সকলের ধর্মের কিছু কিছু ছাপ নিজ কক্ষে ও বক্ষে পোষণ করে এসেছেন। অপূর্ব তাঁর ইতিহাস। সেই ইতিহাসের পটভূমিকায় গড়ে উঠেছে—মধ্বাচর্যের প্রশিষ্য শ্রীপাদরায় স্থাপিত "দাসকূট", এবং তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে "সংস্কৃত"-শাস্ত্রাশ্রিত "ব্যাসকূট"। দাসকূটের সৃষ্টি জনসাধারণের কাছে ভগবৎপ্রাপ্তির বিষয় সহজ সুবোধ্য করে তোলার জন্য ; রাগলে সংগত্যা প্রভৃতি ছন্দের মাধ্যমে কন্নড়-ভাষায় প্রত্যেকটী দার্শনিক ভাব কর্ণাটের প্রতি ঘরে ঘরে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই পাবে এখানে সমান অধিকার।

ক্যানারি সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে এই সাহিত্যের আদি যুগে জৈনদের প্রাধান্য ; খৃষ্টীয় ১১৬০ সালে এঁদের প্রতিপত্তির সময়। তারপর ১৬০০ সাল থেকে বীরশৈবদের সর্বসাধারণের কন্নড়ী

---

৩ ১২২৩ সালে দাবেঙ্গের নামক স্থানে শঙ্কর নারায়ণ মঠ স্থাপিত হয়। বিজয়নগরের প্রথম রাজার নামই "হরিহর" (খৃষ্টীয় ১৩৩৬-১৩৫৩) ; পরবর্তী কেহ কেহ এই নাম গ্রহণ করেন।

ভাষায় ধর্মপ্রচারের নিমিত্ত বচনসাহিত্যের সৃষ্টি হ'লো ; দু'শজন বীরশৈব বচনকারের মধ্যে বহু নারীরাও আছেন, যাঁদের মুকুটমণি হচ্ছেন মহাদেবী অক্কা। বসবদেব স্বয়ং অক্কা মহাদেবীর যা স্তুতিবাদ করেছেন অথবা খৃষ্টীয় ১৬০০ শতাব্দীর বাহবলা তাঁর যা' স্তুতিবাদ করেছেন, তা' অক্ষরে অক্ষরে সত্য। খৃষ্টীয় ১১৬০-১৬০০ সালে কন্নড়ীভাষা মধ্যযুগীয় অবস্থায় ছিল। তারপর দাসকূট মতবাদের অশেষ প্রচারের ফলে একদিকে কন্নড়-ভাষা যেমন মধ্যযুগাবস্থা থেকে বর্তমান রূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে, তেমনি সঙ্গীতের, বিশেষত কীর্তনের মাধ্যমে—ধর্ম-প্রচারের ফলে জনসাধারণের অনুরাগও রচিত গ্রন্থের প্রতি বিশেষ বর্ধিত হতে থাকে। ফলত—কন্নড় ভাষার আধুনিক সুন্দর সুললিত রূপাবতারণার দিক থেকে "দাসকূট"—কবি দার্শনিকদের দানই সর্বাধিক।

মধ্বাচার্যের সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরাগত শ্রীপাদ রায় মহীশূরের কোলার জেলার অন্তর্গত মূলকাল নামক স্থানে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে সর্ব্বসম্প্রদায়ের দ্বৈতবেদান্তবাদী বৈষ্ণব ভক্তগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করার নিমিত্ত, বিশেষ ভাষার মাধ্যমে মাধ্ব ধর্মকে বিশেষভাবে প্রচারিত করার জন্য "দাসকূট" সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন।

"দাসকূট" শব্দে "কূট" অর্থ সম্প্রদায়, শ্রেণী। দাস অর্থে হরিদাস ; দাসকূট হচ্ছে হরিদাস, সুতরাং সম্প্রদায়। পুরন্দর দাসের সময় থেকেই দাস-কূটের আচার্যগণ রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন—শুধু তাই নয়, লোকসমাজে তা' প্রিয় করে তুলতেও তাঁরা বিশেষ দক্ষ ছিলেন। প্রথিত আছে যে পুরন্দরদাস ৪,৭৫,০০০ হাজার এবং বিজয়দাস ২৫,০০০ হাজার গান কন্নড় ভাষায় রচনা করেছিলেন। এই সব কারণে দাসকূটেরা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কিছুকাল পরে দাসকূটেদের মধ্যে কেউ কেউ "ব্যাসকূট" নামে পরিচয় দেন। এঁরা সংস্কৃত শাস্ত্রানুগ সংস্কৃত ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন ;৪ কিন্তু দাসকূটেরা প্রচারকেই জীবনের ব্রতরূপে অবলম্বন করেছিলেন।

দাসকূটের হরিদাসেরা মধ্ব-মতাবলম্বী এবং সকলেই নিরন্তর প্রার্থনা

---

৪ এঁদের একটি কবিতায় একজন কবি বলছেন—"বিষ্ণুর সমান দেবতা নেই ; শালিগ্রামের সমান তীর্থ নেই ; ভারতের সমান গ্রন্থ নেই ; বায়ুর সমান চৈতন্য (life-force) নেই ; মধব-শিক্ষার তুল্য শিক্ষা নেই ;

করেছেন যেন জন্মজন্মান্তরে তাঁরা মধ্ব মতেরই অনুসরণ করতে পারেন। এর কারণ পুরন্দর দাস তাঁর একটি গানে অতি সুন্দর করেই বলেছেন—

ওব্ব অচরিয়নু দৈববে ইল্ল বেন্দ
ওব্ব অচরিয়নু দৈবকে এণ্টে গুনবেন্দ
ওব্ব চরিয়নু নির্গুণ নিরাকার
নিরবয়বন্—ব্রহ্ম কদেয়লি তনে দৈবব্-ব্রহ্ম
ওব্বরু বেদার্থবরিতু অরিয়রু
ওব্ব মাধ্বচারিয়রে পুরন্দরবিট্ঠলন —
ওব্বনে দৈববেন্দু তোরিকোট্টর — অগি ॥

অর্থাৎ কোন আচার্য ভগবানের অস্তিত্ব করলেন অস্বীকার (চার্বাক, ইত্যাদি) কোন আচার্য ভগবানের আটটি গুণ স্বীকার করলেন (নৈয়ায়িকগণ) কোন আচার্য বললেন "ভগবানের কোন গুণ নাই, কোন রূপ নাই, অংশ নাই এবং শেষে নিজকেই ভগবান বলে ঘোষণা করলেন ; মধ্বাচার্যই কেবল বলেছেন যে পুরন্দর বিট্ঠল সর্বশ্রেষ্ঠ দৈবত ॥"

বৈদিক-মতদল্লি নদেদেব্-ব্রহ্মু তবু
বৈষ্ণবং বিত্তু কোট্টরু কেলরু
বৈষ্ণবমতদল্লি নদেদেবন্দু তবু
বৈদিকবং বিত্তু কোত্তরু কেলবরু
বৈদিক-বৈষ্ণব বোন্দেন্দু মধ্বমুনি
প্রতিপদিসিদ পুরন্দর বিট্ঠল মেচ্চে ॥৫

বৈদিক শিক্ষার সঙ্গে সুসমঞ্জস নয় বলে কেহ কেহ বৈষ্ণবধর্মকে করেছেন পরিহার [যেমন মীমাংসক ও শৈবেরা]

অন্যেরা আবার বৈষ্ণবধর্মের অনুবর্তন করছেন বলে বৈদিক ধর্মকে করেছেন পরিহার [রামানুজীয় ?] ৬

ব্রাহ্মণজাতির তুল্য জাতি নেই।" (শ্রীকৃষ্ণসংশ্লিষ্ট তীর্থসমূহে গমন অবশ্য বিধেয়)। বলা বাহুল্য এই শেষোক্ত মতে দাসকূট সম্প্রদায়ের বিশেষ আপত্তি।

৫ পুরন্দরদাসর কীর্তনগলু, বাঙ্গালোর সংস্করণ, ২,৩ সুলদি।

৬ এঁদের মতে রামানুজিয়েরা অবৈদিক ; কারণ তাঁরা বর্ণাশ্রম বিভাগ এবং শুচিত্ব বিষয়ক সকল বিধি মেনে চলেননা।

কিন্তু মধ্বভূমি বলেছেন যে বৈদিক ও বৈষ্ণব অভিন্ন। পুরন্দর বিট্‌ঠল এভাবেই তা' গ্রহণ করেন।

এঁদের মতে বেদের সঙ্গে মিল রেখে বৈষ্ণবধর্মকে প্রচার করেছেন মুখ্যভাবে একমাত্র মধ্বাচার্যই।[৭]

মধ্বাচার্যের মতে ভাগবতপুরাণই বেদ—উপনিষদ্‌ব্যাহৃতি—পুরুষসূক্ত প্রথাসূত্রের শ্রেষ্ঠ অর্থাধায়ক—ভাগবতদর্শন এবং ভক্তিধর্মের প্রপঞ্চনে অতুলনীয়। এঁদের মতে রামানুজ বা বীরশৈব, মহারাষ্ট্রের অদ্বৈত-ভক্তি কোনটাই বৈদিক বৈষ্ণবধর্ম অনুসরণ করেনি। ভগবানের প্রসাদলাভের নিমিত্ত ভক্তির প্রয়োজন; এই ভক্তি সাধন কিন্তু অতি কঠোর। একদিকে সংসারের প্রতি বিরক্তি এবং অন্যদিকে ভগবৎপাদে আত্মসমর্পণ ব্যতীত ভক্তি উৎপন্ন হতে পারেনা। এই জ্ঞান এবং জ্ঞানোৎপাদন জন্য আচরণ স্বল্পায়াসসাধ্য নয়। প্রাজ্ঞজনের উপদেশের এবং কঠোর অধ্যবসায়সহ গভীর অনুশীলনের ফলে মনের রাজস তামস অংশ বিদূরিত হয়। ধীরে ধীরে শুদ্ধসত্ত্বের উৎপত্তি হয়। বিশুদ্ধ মনে ভগবদাবির্ভাব সম্ভবপর। সূক্ষ্মদেহ ও মনের অবসানের পরে ভগবান আত্মার অধ্যাত্মমানসে (spiritual mind) ব্যক্ত হন।

মানুষের মধ্যে বিভিন্ন স্তর আছে এবং ভক্তির বচন সকলে সমানভাবে পরিগ্রহণ করতে সমর্থ নন। বাণী সকলের জন্য সমান হলেও স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে এর অর্থগ্রহণে এবং তদুপরি আচরণে লোকেদের মধ্যে তারতম্য ঘটবেই। আপন কর্তব্যসাধনের দায়িত্ববোধে মধ্বাচার্য তাঁর সকল শিষ্যকেই বলেছিলেন যেন তাঁরা—নরহরিতীর্থ, অক্ষোভ্যতীর্থ, প্রভৃতি—তাঁর দর্শন, যা' বাস্তবপক্ষে বেদব্যাসের উদ্দিষ্ট দর্শন, সর্বত্র প্রচার করেন।

এ ভাবে হরিদাস সম্প্রদায় সর্বজনসমক্ষে একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম ও নীতিবাদ উপস্থাপিত করেন। হরিদাস আন্দোলন মধবের মতবাদ৭ শিরোধার্য করে নিয়ে এটা বিশেষ করে প্রচার করলেন যে অতিরিক্ত অনুষ্ঠানপ্রাবল্য এবং ধরাবাঁধা গতানুগতিকতা ধর্মের পক্ষে হানিকর। এবং জাগতিক উন্নতির

---

৭ শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতরঃ সত্যং জগত্তত্ত্বতে।
ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ।
মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধনং
হ্যক্ষাদিত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়বেদ্যো হরিঃ॥ ব্যাসরায় রচিত শ্লোকঃ

অন্ত কঠোর প্রয়াসও নিন্দনীয়। ভগবদ্ভক্তি এবং আধ্যাত্মিক অভ্যুন্নতির প্রয়াসের উপর তাঁরা বিশেষ জোর দিলেন। বিশেষ করে তাঁরা প্রচার করলেন, আধ্যাত্মিক অভ্যুন্নতি মুষ্টিমেয়ের জন্যে নয়, সকলের জন্যই অভিপ্রেত, এবং তার জন্য সকলেরই প্রয়াস বাঞ্ছনীয়।

দাসকূটস্থ হরিদাসগণের আন্দোলনের চরম সার্থকতা এখানে যে তাঁরা হিন্দুসমাজের কঠোর বন্ধনের মধ্যে থেকেই ধর্মে অনেক নবীনতা সম্পাদনের চেষ্টা করলেন। মানবজীবনের সার্থকতা বিনির্ণয়ের দিক থেকে তাঁরা জন্মের থেকেও চরিত্রের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করলেন। এক ভগবানের মহত্ত্ব ঘোষণা করতে গিয়ে তাঁরা নীচ শ্রেণীর দেবতাপূজার নিন্দা করলেন। দাসকূট বৈষ্ণবগণ নীচ শ্রেণীর দেবতাপূজা সম্পূর্ণ মেনে নিলেন এবং তাদের সঙ্গে যোগদান করলেন।

আরো একটি জিনিষ বিশেষ স্মরণে রাখা দরকার। সংস্কৃত বা কন্নড় ভাষায় ধর্মপ্রচার ধর্মের দিক থেকে বা ভগবানের দিক থেকে সমকক্ষপ্রশ্ন কিন্তু সংস্কৃত ব্যবসায়িগণের এতে হলো বিষম বিপদ। দাসকূট সম্প্রদায়ের বড় বড় নেতারা তীর্থগমনকেও নিতান্ত অসার বলে ঘোষণা করেছেন। সনাতনপন্থীদের এসব জিনিষ ভাল লাগার কথা নয়। বৈষ্ণবগণের মধ্যেই দাসকূট সম্প্রদায়ের প্রচারণা বৈষ্ণব গৌড়া সম্প্রদায়েরই যে বিরোধিতার কারণ হয়েছিল, তা' থেকেই এ স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে গৌড়া বৈষ্ণবরা নিজেদের "ব্যাসকূট" নামে অভিহিত করে "দাসকূট" সম্প্রদায় থেকে পৃথক করে রেখেছিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে দাসকূট সমাজ এখনও কর্ণাটকে সজীব এবং তাঁদের পূর্ববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক তাঁরা এখনও সঙ্গীতের মাধ্যমে কর্ণাটের দ্বারে দ্বারে ভক্তির মাহাত্ম্য প্রচার করে বেড়ান।

কবিতাবলী

দু'টি কবিতা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

খোলা চিঠি

কথা দিয়ে যাও বারেবারে
আস্‌বে-আস্‌বে তুমি আমার পাহাড়ে
তোমার ও সমতল হ'তে।
দিন যায় রাত্রি যায় একটানা বাতাসের স্রোতে
ওড়ে চুল বাইরে দাঁড়িয়ে
আমি পা বাড়িয়ে
আছি প্রতি মুহূর্ত্তেই, কই তুমি এসো!
এসো এসো দয়া করে নাই ভালোবেসো॥

বাতাসে

মাছের মতন সব গাছের পাতারা
খেলা করে বাতাসের জলে।
আজ মনে-হৃদয়ে যে সাড়া
পাতা-নড়া অশ্রুর উজ্জ্বলে
অজস্র চোখের
সে কান্নার হাসি ঢের ঢের॥

কোন নর্তকীকে উপলক্ষ্য ক'রে

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

[Rondeau Redouble—এ নামের জন্য একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এই ছন্দোবন্ধটি বুঝি বা এক রকমের Double Rondeau কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তা নয়। Rondeau Redouble-এর নমুনা কোনো কোনো ইংরেজ কবির রচনার মধ্যেও আছে। এই ছন্দোবন্ধটির গঠনরীতি আসলে এই রকম: এই কাব্যবন্ধ ছয়টি quatrain-এ বিন্যস্ত যার প্রথম quatrainটি পরবর্তী quatrain গুলির ভিত্তিস্বরূপ। কারণ প্রথম quatrain-এর চারটি পংক্তিই পরবর্তী চারটি স্তবকে পর্যায়ক্রমে এক একবার শেষ লাইন হিশেবে ব্যবহার করতে হ'বে। আরো একটু বিশদ ক'রে বললে এই দাঁড়ায় যে, প্রথম স্তবকের প্রথম লাইন দ্বিতীয় স্তবকের শেষ লাইন হ'বে, প্রথম স্তবকের দ্বিতীয় লাইন তৃতীয় স্তবকের শেষ লাইন হ'বে প্রথম স্তবকের তৃতীয় লাইন চতুর্থ স্তবকের শেষ লাইন হ'বে; প্রথম স্তবকের চতুর্থ বা শেষ লাইন পঞ্চম স্তবকের শেষ লাইন হ'বে। এ ছাড়া আরো একটি quatrain যোগ করতে হবে এবং সেই চরম quatrainটির সঙ্গে কবিতার প্রথম লাইনের প্রথমাংশ জুড়ে দিয়ে কবিতা শেষ করতে হয়। এই কাব্যবন্ধে মাত্র দুই মিলের ব্যবহার ও alternate rhyming এবং ছয়টি quatrain রচনা করা—এগুলোই এর প্রনিধানযোগ্য নিয়ম।]

সকাল বিকেলের যা কিছু আলো নিয়ে
সাতাশে ভরা তবু সতেরো ছুঁয়ে যায়!
অলক থেকে এক ঝলক চলকিয়ে
উতলা দখিনা যে মূর্ছা গেলো প্রায়।

মানায় কাকে আর রূপের শিরোপায়
দিনের সাথে যেই রাতের হ'লো বিয়ে

কোন নর্তকীকে উপলক্ষ্য ক'রে

রয়েছে আলো তাপ নেই কো সে-শিখায় !
সকাল বিকেলের যা কিছু আলো নিয়ে

সাজাই আজো প্রেম মনের রং দিয়ে
প্রাণের সুধা সেচে স্বর্ণ-লতিকায় !
পূর্বরাগ তাই যায় না গিয়ে-গিয়ে—
সাতাশে ভরা তন্থ সতেরো ছুঁয়ে যায় !

খেলার সাথীরূপে যদি বা প্রাণ চায়
বুদ্ধি বাধা দেয়—শাসনে, ধমকিয়ে ;
প্রাণের অভিলাষ মিলন-গীতি গায়
অলক থেকে এক ঝলক চলকিয়ে

তুফান তুলে দিলো পলকে প্রাণে গিয়ে
কী করি ভাবি, আরে, এও যে বড়ো দায় !
চুলের ফাঁস লেগে তবু যে হ'লো কী এ
উতলা দখিনা যে মূর্ছা গেলো প্রায়।

স্থিরতা খোঁজা কেন রূপের অণুতায়—
হাস্যকর বটে, নটী কি করে বিয়ে ?
সাথী সে সকলেরই নর্ম-পিপাসায়
কিন্তু ঘর বাঁধা ?—অসম্ভব প্রিয়ে !
সকাল বিকেলের···

নক্সার পাশে

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

নক্সার নিচে পারবে কি তুমি
বন্দী করতে বকুল ছায়া,
ফেলে আসা গ্রাম, অপরাহ্নের
সায়াহ্নপ্রায় সজল দিঠি ?
বেড়ে যায় স্মৃতি।

কেননা কখন কি করবে বলো
যদি চুম্বন অধরাগত,
অথচ প্রেমিক অপরিণত
পান্থভবন কেঁপে-কেঁপে ওঠে
ক্ষণিক আলোর অন্ধকারে,
ভোরের আকাশ রৌদ্র কাড়ে ;
ঘনিষ্ঠ চলে চারভাই, তবু
কৈকেয়ী আছে সঞ্জীবিতা,
দশরথ আজো হারায় সীতা।

নক্সার নিচে যদি পারো তুমি
এতদিন ধ'রে যা চেয়েছিলে,
একটি বিরহ বেঁধে নিতে পারো
সংকল্পের ইন্দ্রনীলে,
এই পৃথিবীর জীবনকে দাও
শহরতলির সুসংহতি,
জীবনের চেয়ে তবু মৃত্যুর
পরিকল্পিত ক্ষিপ্রগতি।

নক্সার পাশে

এক বালকের ছয়টি শরৎ
এক তন্বীর উনিশটি মাঘ
কাজল ছোঁয় ; একটি কপট
ধার্মিক বুকে পাপের পরাগ ;
সমান্তরাল সব নদী শেষে
নিজের-নিজের লজ্জা ঢাকে,
ভগবান ছাড়া আর কে থাকে ?

১৯৫৮র একটি বিকেল

নবেন্দু চক্রবর্তী

এখন স্থির বিকেল-বেলার আলো,
একইভাবে চুঁইয়ে পড়ছে ভীষণ জমকালো,
বড়রাস্তার বিমূর্ত এই ভীড়ে।
মনে হচ্ছে, দারুণ কিছু ঘটার আগে
আপটেছে কেউ সহরটাকে ঘিরে ধরছে, ঘিরে।

সবই ঠিক চলছে যেমন চলার
সবাই ঠিক কথা বলছে যখন যেটি বলার।
কেমন আছেন ? চলে যাচ্ছে। বড্ড গরম, তাই না ?
বৃষ্টি হবে ? মনে হচ্ছে ! কি বই ওটা ? আঁদ্রে জিদ, আপনার
কেমন লাগে ?
ভালোই তো। যদিও আমি অনেককাল আর ও সব পড়িনা।

রেকর্ড বাজছে নীলামওয়ালা লে লে বাবু ছ-আনা,
মাতাল বাড়ছে শুঁড়ীখানায় চলছে বেচা-কেনা,
মুখোসগুলো নড়ছে চড়ছে আগের থেকে জানা
ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে, তবুও খেলা জমছে না ;
সবাই ভাবছে, একটা কিছু ঘটবে এবার, কিন্তু কিছু ঘটছে না।

বিকেল-বেলার চড়া আলোর রঙ
ঠিকরে পড়ছে, যেন যাত্রা দলের কয়টা সং
দেখে আকাশ ক্যা ক্যা করে হাসছে জিব ভ্যাংয়াচ্ছে,
হাওয়া নেইকো তবু মস্ত বিরাট জবরজং,
শোভাযাত্রার মুখোশগুলো কোন্ সে হাত নাচাচ্ছে।

সবাই ভাবছে চমকপ্রদ ঘটুক একটা কিছু,
প্রতিদিনের চেনা আকাশ ঠেকছে বড্ড নীচু
সমস্ত রঙ ব্যবহৃত, সমস্ত পথ পরিচিত,
একই হর্ষ বিষাদ কিংবা ভয়,
ক্লান্ত করছে, ক্লান্ত করছে, করছে কেবল ক্ষয়।

পাথরে সব বেঁধে তাদের বুক,
ঘামছে এবং ভাবছে তাদের অসুখ।
হাওয়া নেইকো, সময় হঠাৎ মৃত।
এবং চাইছে মিলতে কিন্তু পারছে না।
মৌসুমী মেঘ তুমি কোথায়? দয়া তোমার ঝরবে না!

কর্ণফুলির মাঝি

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

সমুদ্রে ভাসে সাম্পান তার, কর্ণফুলির মাঝি ;
নির্লোম বুক, নেকড়ের মতো চোখ,
পরুষ পাঞ্জা, রক্তে মরীয়া রোখ,—
শয়তান সাক্ষাৎ।
বুকে কাছি বেঁধে গাছতলে বসে আছি ;
হবে তার সাথে মুখোমুখী মোলাকাত।

কর্ণফুলির মাঝি

নইলে জীবন সাত ঢোবাই বটে !
ন' মাস ঝিমোয় ; বর্ষায় কেঁপে ওঠে :
মশা ডিম পাড়ে, ব্যাঙ ডাকে প্রাণ খুলে,
লাবণ্য লাগে কচুরির নীল ফুলে,
কাঁটা-ঝোপ-বনও হঠাৎ সবুজ কচি,
গুন্ গুন্ মনে আষাঢ়ে গল্প রচি ;
কবে কথা শেষ, ছাগলে মুড়ায় নটে
কপালের ভাঁজে নীরক্ত শিরা ফোটে।

সন্ধ্যার শাঁখে কার ডাক পড়ে ? ছাই
ওড়ে বাতাসের অস্থি-ভস্ম-গুঁড়ো ;
ছায়া হোয়ে যায় পাড়ার বিপিন খুড়ো,
ধুলোয় চিহ্ন পড়ে না, শব্দ নাই ;
শীতের কুয়াশা হাঁড়ি-মুখ, ভারী, পুরু
পেঁচা শুধু বলে, ভয় নাই ; জয় গুরু !

ভয় নাই ! আমি গাছতলে ব'সে আছি।
কই সাম্পান, কর্ণফুলির মাঝি ?
বুকে কাছি বেঁধে দেখে যাব শেষ তক
দুশমন সেই কব্জির কত জোর !
রক্তে আমারও লবণ- জলের সোর,
শান্তি নেইক সে না আসা ইস্তক ॥

মেদিনীপুর ঃ শালবন

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

শালবনে যেন গাছেরা একলা একা।
গলাগলি নয় শুধুই চোখের দেখা।
কা(দিকে কেউ হাত বাড়ায়না। ছায়া
কেউতো দেয়না। আত্মীয়তার মায়া
ধুত্তোর ক'রে শুচিবায়ু এক পায়ে
খাড়া হয়ে আছে। গা বাঁচাবে, এই দায়ে
শরীরে মুখর সর্‌সর্। কেউ ভীড়ে
হারাবে না। এই মাটির প্রান্ত ঘিরে
ঘন ও গহন বন হয়ে উঠবে না,
অনন্ত কোনো অরণ্যে ফুটবেনা।
কেউ কারো নয়। পাশাপাশি সকলেই
বনবাসী। তবু সব নিয়ে বন নেই।
আকাশ ছোঁয়ার বোবা প্রতিযোগিতায়
আকাশের শরশয্যা হতেই চায়।
শাখা উপশাখা ছড়িয়ে পাগল পারা
বনপথ শুধু এখানে আত্মহারা
স্নায়ুর জটিল সঞ্চার হয়ে আছে ;
এই বনে আমি সব চেয়ে তারি কাছে
নিজেকে মুক্ত করেছি, লগ্ন আছি—
এই অভিমানে এই অরণ্যে বাঁচি।

এই রাত্রে

মানস রায়চৌধুরী

তোমার গভীর স্বর শুনবো বলে আছি প্রতীক্ষায়
সৌরলোক নিভিয়েছে তার তীব্র আলো,
আকাশে এখন নীল অবারিত অন্ধকার, নির্জন ধারালো
কোথাও তরঙ্গ নেই—শুধু চেতনার
শব্দহীন একাগ্রতা, ভাবি এইবার
তোমার মরমী স্বর ভেসে যাবে নক্ষত্র হাওয়ায়।

তোমার নন্দিত রূপ দেখবো বলে আজ
রয়েছি দুচোখ মেলে—মগ্ন বিভাবরী
অনিদ্রায় ঝরে যায়। রাত্রি তার তরী
ভাসালো উষার তীরে···আলো ফুটবে রক্তিম সমাজ
দূরে মৌন অন্ধকার, চেয়ে আছি বুঝি এইবার
দিগন্তে উঠবে জ্বলে রহস্যে আবিষ্ট দুই নয়ন তোমার।

মৃত্যুর রূপ

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

লতা গুল্ম নির্জনতা অন্ধকার অবয়বে নারী
একটি ফলের লক্ষ্যে অকস্মাৎ নরক জাগালো,
বহুছায়া বৃক্ষ এক কাঁপলো বাতাসে—ভালো
শরীরে পুরুষ যেন অতএব সিদ্ধ অধিকারী।

উত্তরসূরী

অজস্রতা বিস্ময়ের মর্মহীন প্রাণ বারবার
স্বর্গ মর্ত্য পাতালের জল দেখে নবনীত পরে
সরে যা, সরে যা বলে যৌবনের সবটুকু সোনা
ঝরালো কম্পিত দুতে : ঘর মাটি স্তম্ভিত পৌরুষে।

দেখো হে অবাক দেখো, সে আকাশ দুঃখিত ধুলোয়
এখন আশ্রিত বোধে দুই মূর্ত অসবাস স্থির।
বিস্তর সংহতি যার নবরাগী কম্পন ছায়ায়
জেগেছে জলের দুঃখ নবমাখা নবঘে ভবিষ্য।

দুটি কবিতা

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

পূরবী

দক্ষিণ থেকে পুবে ফিরে তাকাল ওরা
আলো ছায়ার ঘুম ভাঙাল চোখ
হাওয়ার হৃদয়ে ওঠা, সেই বেলা
ছোট ঝিনুক ফুলে—ঝিনে শিহরিত হল, আর
জল তরঙ্গ-আকাশে দূর দূরন্ত সাড়া এল যখন
উত্তর দেশের হাওয়ায় প্রীষার ছায়ায়
দূরন্ত শাল বনান্তের মিঠে আকর্ষ আবাদা
হাসির শিরদাঁড়া শিউরতা তখন।

সেতু

তাই বারবার আকাশে তাকালো
কেউ জানে না সেতুটার কতক্ষণ হবে ছুঁল।
কাঁচের মতো জল—কাশীর বয়সের অনেকদূর ছিল,
একলা বিশ্বাসের ইচ্ছাৎ সাড়ার কলকল হাওয়ার মিষ্টি
অথবা ঝরা পাতার হাহাকার ভুলতে পারো।

বিষাদ ভরো সেই বিষবতী ভালো লাগাদের দিনেই
অসুখ করলো। ছেড়ে দিয়ে ভালোবো
সকাল বেলার আলো রোদে ভাতা প্রেমের মতো
ঘুমীতে-মাঝে আর মোদিনীদের উজ্জ্বল অন্ধকারে
দিয়ে এল দীঘে ঘুমপাড়ো বৈষয়ি বিশ্বাসঘাতি .
সরোজার দিয়ু মাথাভরি বারবার আকাশে তাকালো।

তীক্ষ্ণ মাধবী, দিবা কেন

বটকৃষ্ণ দাস

মাধবী আমার নিষ্ঠুর নীল অন্যোন্যম
তাকে অধিকার কোন অন্যায়ের অন্ধ টানে,
মহাবাদিনী ঘুমন্তে পতীর অন্যোন্যম,
হে তীক্ষ্ণ মাধবী, দিবা কেন আর আকাশে ?

উতলা আবেগে সবেত হেত পাপড়িগুলি
যদি ছিঁড়ে যায় লঘু বাতাসের অত্যাচারে
যদি ঘুমার উর্মিল রাত ঘুতে ঘুলি
তাকে নির্ভর সোপন তলার তন্ত্র রাতে—

দিবা অবোধরো নন্দার দিন নীরবে ঘুম
যোনতার মতো কীণ তরী তবে এগিয়ে দিও,
ভরতীহে এঁকে দিও ঘুমি উজ্জ্বলুমে,
মধুকরের নিলয়ে পরাগ ছাড়িয়ে দিও।

মহাকাশের ইঙ্গিতে হাত অনন্ত, ও,
আকাশ অপার, আমে আঁধার পৃথিবী ঘুতে—
চারিদিকে ঘুম সহন পতীর অনন্তিমিত,
ভ্রুতগতি তাল পর্দার তট অবধুরে।

উত্তরস্বরী

দাম্ভিক ঘোড়সওয়ার মানে না আকুতি কোনো,
নিমেষের পর নিমেষ ফুরায় কেবলই বৃথা,
দ্বিধা বিজড়িত পাপড়িতে কেন সঙ্কোচনও,
নষ্টচাঁদ কি নিষ্ফল হবে, অনিন্দিতা ?

এতো যৌবন বইবে কী করে ওটুকু দেহ,
অতোটুকু প্রাণ কী ক'রে সইবে প্রেমের ভার ?
ওই গাগরীতে ধরে না সাগর অপরিমেয়,
দেহের সীমায় কাঁদে অসীমের অন্ধকার।

প্রখর পিপাসা শিশিরের জলে মেটে না কভু,
একটি নিমেষ হোক তাই আজ দুঃসাহসী
নিষ্ঠুর কাল, মরেছি হাজার মরণে, তবু
ক্ষণ-শাশ্বতী হাসুক কালের কিরীটে বসি।

দুটি হৃদয়ের শোণিতে এখন একটি আশা,
একটি মরণ থরোথরো দুটি দেহের কূলে—
দুটি জীবনেই একটি নিমেষ, সর্বনাশা,
একটি বেদনা দুটি বক্ষের মর্মমূলে।

হে তীক্ষ্ণ মাধবী, রাত্রি গভীর, খোলো দুয়ার—
দেয়ালের কান বধির নয় যে, সেকথা মানি,
ঘুমায় না জানি সমাজেরও লাখো চৌকিদার,
এ-রাত তবুও চায় আমাদের আত্মদানই ॥

প্রহত প্রহর

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

তার চোখে সর্বনাশ। অনেক কান্নায় ভিজে আজ
করুণ বিষণ্ণ চোখে কঠিন আগুন। এতোকাল
সে যেন অশ্বত্থ কিংবা শাল কিংবা তৃষার্ত পিয়াল
যে পুড়েছে ঝড়ের বিদ্যুতে গুরুডম্বরু আওয়াজ

যে-শুনেছে মেঘের জঠরে। কান্নার স্নায়ুর গলি
অবরুদ্ধ, আঘাতে পাতাল। বুক পেতে নিয়তই
দূষিত দিনের ভার সে নিয়েছে। দূর দীপাবলী
যেহেতু একাগ্র লক্ষ্য শরীরের সমস্ত ক্ষতই

উপেক্ষিত,—জীবনের স্বচ্ছ আর শান্ত ঐক্যতান
যে সঞ্চিত রাখছে সে একদিন অসীম প্রত্যয়ে
কাছে আসবেই ভেবে বুক ভরে' কুসুমিত ঘ্রাণ
নিয়েছে অভ্যাসে। রাত্রিদিন দীর্ঘ প্রহরের ক্ষয়ে

আশার গোলাপ তার ক্রমে ধূসরিত। অবিশ্বাস
তবুও করবে না পশ। যতো কালো হয়ে আসে মেঘ
সে বাড়ায় অন্তর আবেগ। তার চোখে জাগে সর্বনাশ
বুক তোলপাড় ক'রে। যদি কেউ বলে এই বেগ
কেবল ভ্রান্তির চিহ্ন, সেই মায়াবিনী আসবেনা,
তাহলে দুর্বাশাশাপে শুধবে সে বিভ্রান্তির দেনা

ঢেউয়ে-ঢেউয়ে তীব্র সর্বনাশ এনে। দুর্জয় বিশ্বাস
যদি কেউ ভাঙে তবে রক্ষা নেই, তার সর্বনাশ॥



নিরন্ত নির্ঝর। বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়। শতভিষা॥ অন্তর্গতি। পূর্ণেন্দু বিকাশ ভট্টাচার্য। শতভিষা॥ নাবী ফসল। সুনীল চট্টোপাধ্যায়। অমল দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত॥ ছেঁড়া তাঁবু। সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়। কবিতা মেলা॥ একা এবং কয়েকজন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্য প্রকাশক॥

এই কবিগোষ্ঠির মধ্যে বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় অপেক্ষাকৃত প্রবীণ। এবং বর্তমান গ্রন্থটি তাঁর দ্বিতীয় সঙ্কলন।

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় আবেগপ্রবণ কবি। তিনি ভরসা করেন আবেগ হয়ত পৌঁছে দেবে তাঁর অভিষ্টে। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য তিনি যে মুহূর্তেই আবেগ ত্যাগ করে কিছুটা যুক্তির ওপর, কিছুটা বিচারের ওপর নির্ভর করেছেন তন্মুহূর্তেই ভালো, অন্তত উল্লেখযোগ্য কাব্য রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। সেখানেই তাঁর বোধ জাগ্রত হয়েছে, অনুভূতি তীক্ষ্ণ হয়েছে। তখন তিনি সহজেই 'অনুরণন : হাওয়ার দুপুরে,' 'লোকজ-স্মরণে' 'বিবেক'ও 'জনান্তিকে'—এই রকম কয়েকটি কবিতা লিখতে পারেন। এবং একারণেই উপর্যুক্ত রচনাগুলোকে আমার পক্ষে কবিতা আখ্যা দিতে দ্বিধা হয় না। যথা :

সব নাম ভেঙে ভেঙে যে-মুহূর্তে এক নাম হয়
একটি আশ্চর্য ডাক সেই নাম ধ'রে বেঁচে রয়
জীবন এপার আর জীবন ওপার
নিশিদিন লক্ষ্য করে, সব পারাপার
কী সে মন, কার মন, কে গো মনোময় ? (লোকজ স্মরণে)

অন্তত, এই উদ্ধৃতিটুকু থেকে বোঝা সহজ, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়-এর

হাতও কতটা নিপুণ। বিভিন্ন ছন্দের খেলা 'নিরন্ত নির্ঝর-'এর অনেক কবিতায় উপস্থিত। কিন্তু এর অবশ্যম্ভাবী যে পরিণতি তাও অনেক কবিতার ক্ষেত্রে দেখা গেছে: ছন্দ ছাড়িয়ে অনুভূতি, চিত্রকল্প, বক্তব্য কিছুই প্রায় থাকে নি। ফলত 'অম্বুবাচীর মেঘকে' 'এখুনি কেন সুনীল ঘুম', 'সাঁঝ-সেঁজুতির শান্তি', 'নীল চতুর্দশীরাতের স্মৃতিকে,' 'কোনো সুইম্-স্যুট-সাইরেন-কে' ইত্যাদি অর্থহীন, পঙ্গু, অশ্লীল ও অসংযত পঙ্ক্তির সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো পড়লে আমাদের মনে সহজেই বিশ্ববাবুর কবিত্বশক্তির ওপর সন্দেহ জমে। আমি উদ্ধৃতি দিয়ে পাঠককে বিব্রত করতে চাইনে। আসলে আমার মনে হয়েছে বিশ্ববাবুর সংযম তার আয়ত্তাধীন নয়। নচেৎ 'হাওয়ার দুপুরে' কবিতাটি কোথায় শেষ হলো বুঝলাম না। অথবা নানা কথার চাপে পরিবর্তিত অংশ অমনি ভারাক্রান্ত কেনই বা।

শব্দের সুষ্ঠু ব্যবহার, অথবা শব্দের বিচিত্র অভিব্যক্তির প্রকাশ বিষয়ে কবির সচেতনতা আশা করে হতাশ হয়েছি। বিশ্ববাবু কবিতায় ধ্বনির মূল্য বোঝেন, তার প্রমাণ আছে, এবং সে কারণেই শব্দ সম্বন্ধে এতটা অসচেতনতা আমাদের বিমূঢ় করে। তিনি শুধু মিলের জন্য এরকম শব্দও ব্যবহার করেন:

Bonn-এ ॥ লগনে ইদানীং ॥ চাইমিং ;

অথবা এই কবিতাটিরই সুরুতে,

স্নানের মেয়ে! সূর্য জলে সাগর ঢেউ তার
ভাঙলো ছবি মনের লবি-মহলে গুঞ্জন
উঠলো যেই দেখলো চোখ সাঁতারু আঙিয়ার
নিলাজ লীলা, রোদের দীপ ছড়ানো অঙ্গন।

কেবলমাত্র মিলের অসংযত ব্যবহারই নয়, আমার ভাবতে অবাক লাগে একটি নগ্ন নারীচিত্র আঁকতে কবিকে কী দুর্জয় প্রচেষ্টা পেতে হয়েছে, কত ইংরিজি, ফরাসী শব্দ ব্যবহার করতে হয়েছে অযথা। এ ছাড়াও বিশ্ববাবুর অতিরিক্ত ইংরেজি শব্দ, অনেক সময় ফরাসী শব্দ ব্যবহারও আমার মনে হয় কবিতার রসগ্রহণের পরিপন্থী।

এবং এতৎসত্ত্বেও তাঁর কবি মন সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই। বিচিত্র প্রচুর উল্লেখ্য ছত্র তাঁর পদ্যে পাওয়া যায়।

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্যের কাব্যগ্রন্থ 'অন্তর্গতি' একজন সচেতন কবির

কাব্যসাধনার স্বাক্ষর হিসেবে আমাকে তৃপ্তি দিয়েছে। বয়ঃজ্যেষ্ঠ কবির প্রভাব হতে বিমুক্ত থেকে কাব্য সাধনা করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। যাঁদের শক্তি সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হয়েছি, তাঁদের মধ্যেও একমাত্র জীবনানন্দ ব্যতীত অন্য কোন্ কবি রবীন্দ্র আবর্ত থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন? 'অন্তর্গতি'র কবিতা গুলোতেও স্পষ্টত বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী ও কোন কোন সময় বুদ্ধদেব বসুর স্বচ্ছ প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয়। এবং বস্তুত বিষ্ণু দে-কে উৎসর্গ করা সুদীর্ঘ কবিতাটি, যার নাম 'সূর্যমুখী' তাতে তো বিষ্ণু দে-র চিত্রকল্প, শব্দবিন্যাস ও লেখার চালে পূর্বোক্ত কবির কথা নিতান্ত অমনোযোগী পাঠকের নিকটও ধরা পড়বে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উক্ত কবিতাটির অন্তর্গত এমন সব ছত্র আছে যা ক্ষমতার পরিচায়ক। যেমন :

অসীম প্রত্যাশী মন। বর্ষনান্তে খোঁজে ইন্দ্রধনু
মেঘের বিচিত্র কোলে কামনার সপ্তদ্যুতিমান।
কিছু তার দিয়েছে আভাস, কন্যা, ঐ বরতনু
গোধূলির স্নিগ্ধতায়—দিগন্তের শান্ত সুমহান।

অথবা এই সব বিচ্ছিন্ন ছত্র :
'দিগন্তের স্তব্ধতায় আসে ঐ অতলান্ত ডাক।' 'তবুও পান্নার মতো এই কান্না দেখো বনে বনে। কখন সবুজ।' ইত্যাদি। আবার 'আরও একটি ইচ্ছা', 'কয়েকটি মুহূর্ত' 'অনৈয়ায়িক'-এর কোন কোন ছত্রে অমিয় চক্রবর্তীর প্রভাব রয়েছে। আমার বক্তব্য, এই সব প্রভাবিত পঙ্‌ক্তিগুলোতেও পূর্ণেন্দু বাবুর আশ্চর্য কবিমনের, সচেতনতার লক্ষণ নানা ছত্রে দেখা গেছে।

সবুজ পাখি কেন তোমার প্রবাল-ঠোঁটে
মোরগ ফুলের মতো মন্ত্র ফোটে?
মন্ত্র নয়, গান তোমার, গান কিসের?
দেখো ফণে ধোঁয়া মেশে, ধোঁয়া বিষের!

এবং 'সহজিয়া', 'একটি নীল মমতা', 'ভাঙা বিকেল' এর মতো স্মরণীয় কবিতাও তিনি লিখেছেন।

অন্তর্গতি পাঠান্তে পূর্ণেন্দুবিকাশ সম্পর্কে আমাদের আশা বর্ধিত হলো।

সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের 'নাবী কলল' কাব্যগ্রন্থে কত আশ্চর্য বিষয়, ও

অপূর্ব সব চিত্রকল্প বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে : কিন্তু বিভিন্ন ছত্রে কবির এসকল অযত্নবিন্যস্ত চিত্রকল্প সম্পূর্ণ কোন অনুভাব উপস্থিত করেনা। কবি আর একটু মনোযোগী হলে উল্লেখযোগ্য কবিতার সংখ্যা বাড়াতে পারতেন। শব্দ চয়নের অতটা শিথিলতা, এবং যান্ত্রিকতা, ফলে পাঠকের মনে ক্লান্তি না ঘটলে তার কবিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ অম্লান না বলেই আমার বিশ্বাস। এমন কি অপ্রস্তুত পাঠকের নিকট কবির কিছু কিছু চিত্রকল্প, উপমা, কখনো কখনো কোন কোন শব্দ, যার অর্থ বহুদূর বিস্তৃত, কোন কোন ব্যাপার যা' ঘটেছে বলে কবিতায় বর্ণনা করা হয়েছে, তা' অসম্ভব ঠেকবে। চেষ্টাকৃত ঠেকবে। হয়ত এর কোন কিছুই চেষ্টাকৃত নয়। সম্ভবত কবির মেজাজ অনুরূপ বলেই আমার বিশ্বাস। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে কবির বর্ণিত ঘটনা সম্পর্কে তাঁর কী অশেষ আত্মপ্রত্যয়! যেমন

"অসহ সুর নিয়ে দুয়োরে কার যাবো।"

অথবা 'চরম গভীরে জানি, । আমি জলদেও আছে সে নীলিম অচল, । যেথা মেলে মনে ধারাবরিষণে বনবাণী।'

মানুষের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, মহত্ত্বের প্রতি তাঁর বিশ্বাস রয়েছে এবং তা তিনি যখন ভাষায় অনুবাদ করেন,

'চারিদিকে গণিকার দল
আশ্চর্য শুদ্ধতা বয়ে শরীরে শরীরে
কামনার ঐকতানে নদী হয়ে যায়।

সে-মুহূর্তে মনে হলো শাপভ্রষ্ট দেবতার দেহ
হঠাৎ পেয়েছি আমি পাপ স্পর্শ করেনা আমাকে।

তখনি মনে হয় এই কবির কাছ থেকে আমরা আরও পরিশীলিত কাব্য আশা করতে পারি। এর আরও একটি কারণ আমার মনে হয়েছে, কবির ভার কখনো সৌন্দর্যতরী ভরাডুবি করাতে পারেনি। সর্বশেষে বলি, 'নাবীকদলের' কিছু কবিতায় গভীর চিন্তার সংকেত আছে যা স্থানে স্থানে নিছক ভাগো-লাগাকে অতিক্রম করেছে।

বাংলা দেশের 'আরও কবিতা পড়ুন' আন্দোলনের সঙ্গে সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম যুক্ত আছে বলেই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ছেঁড়া তাঁবু' পাঠে

আমার এত উৎসাহ জন্মেছিল। কিন্তু অবশেষে বলতে বাধ্য হচ্ছি সন্তোষ বাবু আমাকে কিছুটা হতাশ করেছেন।

সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায় বারংবার অপূর্ব কিছু বলতে চেয়েছেন, এবং সে জন্যে তিনি, অনেক সময় কবিতায় আবহাওয়াও গড়তে পেরেছেন, যদিও আসল কথাটি কখনো বলা হয়নি। যতটুকু আশা নিয়ে ওর যে কোন কবিতা সুরু করা যায়, ঠিক ততটুকু হতাশা আসে কবিতাটির শেষ পাঠান্তে। সে কারণেই তাঁর কবিতা শেষ পর্যন্ত নিছক কয়েকটি ভংগী থেকে গেছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, 'একজন কবি', 'মন্দির', 'অসুখ', 'যেখানে যৌবন ছাড়া বয়েস নেই', 'সে' ইত্যাদি কবিতাগুলো। এর মধ্যে একটি কবিতা আমার চোখে পড়েছে, যার নাম 'রবীন্দ্রনাথ'।

যে বিধি দিলে তুমি
যাই গন্ধর্ব পুরে—
গুণনিধি আমার
সমুদ্র মাছের জলে।

রবীন্দ্রনাথ আমরণ
দূর সরাইয়ে
লাল তাস নীল অমরার
গীতময় উজ্জ্বলতা মদে॥

এই ছোট্ট কবিতাটিতে অন্তত তিনি সহজভাবে নিজের অনুভূতিকে অনুবাদ করতে সক্ষম হয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস। শুধুমাত্র কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ছত্র উদ্ধৃতি দিলে সন্তোষ বাবুর কবিতাকে আরো অর্থহীন মনে হবে। তাঁর কাছ আরও পরিণত কবিতা আমি আশা করি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ 'একা এবং কয়েকজন' পাঠান্তে প্রথম যে কথাটি মনে হয় তা' এই, কবি তাঁর প্রতিটি ব্যবহৃত শব্দ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। তিনি জানেন, যে সব শব্দ তিনি ব্যবহার করছেন, তার দৌড় কোন্ মসজিদ পর্যন্ত। সুতরাং কখনোই তাঁর কবিতায় এমন দেখা যাবে না যে তিনি এক চিন্তা হতে অন্য চিন্তায় মাঝখানের অনেক কথা অকথিত রেখে লাফিয়ে পার হচ্ছেন। প্রতিটি চিন্তার পিঠে পরবর্তী চিন্তা-ভাবনা

পানিনির ব্যাকরণ সূত্রের মতোই আসে। এ কারণেই তাঁর কবিতা কখনোই অবোধ্য হয় নি।

যেমন,

উনিশে বিধবা মেয়ে কাষক্লেশে উনতিরিশে এসে
গর্ভবতী হলো, তার মোমের আলোর মত দেহ
কাঁপালো প্রাণান্ত লজ্জা, বাতাসের কুটিল সন্দেহ
সমস্ত শরীরে মিশে, বিন্দু বিন্দু রক্তে অবশেষে
যন্ত্রণার বন্যা এলো, অন্ধ হলো চক্ষু, দশ দিক,
এবং আড়ালে বলি, আমিই সে চতুর প্রেমিক। (বিবৃতি)

এইরূপ কাব্যশরীর গঠনে একটি অসুবিধা আছে যা' সুনীল বাবুর কবিতাতে দেখা যায়। যেমন,

"আর মাঝে মাঝে
স্বপ্ন দেখবো সেই শ্মশানের পাশে এক আশ্চর্য,
চির হরিৎ বৃক্ষ—তার পাতা ঝরে না, তার মৃত্যু হয়না। (চিরহরিৎ বৃক্ষ)
"দ্বিতীয় পৃথিবী এক প্রতীক্ষায় বসে আছে তারই ছোট ঘরে।" (ঘর)

ইত্যাদি উদ্ধৃতিগুলো অনেক সময় সুনীলবাবুর অন্যান্য কবিতার পাশে অধিক গদ্যময় ঠেকে।

শব্দের ধ্বনি নিয়ে যে সব মূল্যবান পরীক্ষা সাধারণত তরুণ কবিরা করে থাকেন তেমন কোন চিহ্ন সুনীল বাবুর কবিতায় আমি পাই নে। তাতে তাঁর কাব্যে অসংগতি কিছু দেখা যায় না। সহজ, সাধারণ বিশেষণ তাঁর পক্ষে প্রয়োগ অন্যায় হবে, বলা উচিৎ সরল কবিতা রচনায় তিনি দক্ষ। তাঁর মেজাজ যে অনুরূপ তার প্রমাণ, একটি 'মুড' এর চেয়ে, কোন গল্পের ইংগিত অবলম্বনে রচিত কবিতার সংখ্যা এই গ্রন্থে অধিক। এই কারণে তাঁর অধিকাংশ পদ্যই নায়ক-নায়িকা নির্ভর। 'তুমি' 'তোমাকে' 'আমি' 'আমাকে', ইত্যাদি ব্যক্তিস্বাক্ষর-যুক্ত শব্দ তিনি অধিক ব্যবহার করেছেন। এসব কবিতার স্বাদ ভিন্নতর, এতে আমাদের দম আটকিয়ে আসে না, হয়ত ভাবনার জন্ম দেয় না, কিন্তু একটা স্বস্তি পাওয়া যায়। জানি 'মনোরঞ্জন' কথাটি খারাপ, তথাপি বলতে বাধ্য হচ্ছি এ কবিতা আমাদের মনোরঞ্জন করে।

সর্বশেষে, দীর্ঘকাল এমন সুদৃশ্য কাব্যগ্রন্থ হাতে আসেনি, যে বই পেয়ে

মন আনন্দে ভরে ওঠে। সুনীল বাবুর কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। আশা করি এরপরে তিনি হয়ত আর একটু বেহিসেবী হবেন, যার ফলে আমরা আরও প্রাণখোলা কবিতা পাবো।

কমলেশ চক্রবর্তী

পূর্ববাংলার সমকালীন সেরা গল্প : রুহুল আমিন নিজামী সম্পাদিত। স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স, কলিকাতা।

জীবনের নিগূঢ় রস এবং রহস্য উপন্যাস ও গল্প সাহিত্যের প্রাণবস্তু। উপন্যাস যদি জীবনের খণ্ড খণ্ড বহু বিভক্ত অস্তিত্বের সমগ্র জীবনসত্তার রূপায়ন হয়, গল্প তবে সেই খণ্ডিত বহু অস্তিত্বের বিচিত্র উদ্ভাস। বস্তুত উপন্যাস ও গল্পে মৌলিক কোন প্রভেদ নেই। পার্থক্য যা তা শুধু রীতি ও আঙ্গিকের। জীবনের ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাসের জন্ম। ছোট গল্পের ভিত জীবনের খণ্ড চেতনার বৈচিত্রে।

সার্থক উপন্যাসের সংখ্যা বাংলা সাহিত্যে বিরল হলেও গল্প বা ছোট গল্পে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ছোট গল্পে রবীন্দ্রনাথের একক সাফল্য ও অবদান সারা বিশ্বের গল্প সাহিত্যের দিগন্ত-বিস্তারে নতুন সংযোজনা বললেও অত্যুক্তি হবেনা। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া, পূর্বসূরীদের মধ্যে গল্প সাহিত্যে শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী ও প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত। শরৎচন্দ্রের নামের আগে 'ঔপন্যাসিক' শব্দটি বহু ব্যবহৃত হলেও আসলে তার বেশির ভাগ রচনাই ছোট গল্পের লক্ষণাক্রান্ত, দৃশ্যমান আয়তনের পোষাকে মূল অবয়ব ছোট গল্পেরই। শরৎ-চন্দ্রের অসাধারণ খ্যাতি ও প্রায় অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা তার গল্পগুলিকে আশ্রয় করেই। গভীর মানবিক বোধে হৃদয়বান প্রভাত মুখোপাধ্যায় এবং নতুন গদ্যরীতির প্রবর্তক মননশীলতায় উজ্জ্বল প্রমথ চৌধুরী দুজনেই বাংলা গল্পের আসরে কায়েমী আসন ক'রে নিয়েছেন।

এর পরেই তিরিশীয় হাওয়ায় বাংলা গল্প-উপন্যাসের কল্লোলিত প্রবাহের যুগ। জানা অজানার বহু বিচিত্র ও সংশয়াকুল পথে ও খাতে বাংলা গল্প ও উপন্যাসের ধারা প্রবাহিত হ'ল। বাঁধা সড়কের বাইরে এযাবৎ উপেক্ষিত ও

অজ্ঞাত জীবনের ব্যাপক ব্যঞ্জনার অসংখ্য অলিগলির সন্ধান এযুগের সাহিত্যের বিস্ময়কর আবিষ্কার। মহাসমুদ্রের মত জীবনের অতলান্ত রহস্যের ইঙ্গিত এ যুগের সাহিত্যে বিদ্যুত চমকের মত প্রতিফলিত হ'ল। বাংলা দেশ সচকিত হ'ল, উচ্চকিত হ'ল। নতুন প্রত্যয়লব্ধ শক্তির বলিষ্ঠ পদ-ক্ষেপে বাংলা গল্প উপন্যাসের চরিত্র বদল হল। আবেগের সাথে আবিলতাও যে না এল তা নয়। অনেক সোনার ফসলের সাথে অনেক আগাছাও ঘরে উঠল। কনভেনশন বা ট্রাডিশন বর্জনের কালে নতুন সৃষ্টির আবেগে যে জোয়ার আসে কিঞ্চিৎ আবিলতাও তার অপরিহার্য অনুষঙ্গ। এটা প্রাকৃতিক নিয়ম।

তিরিশের এই কালকে সাদা কথায় কল্লোল যুগ ব'লে চিহ্নিত করার তাৎপর্য বোধ হয় এই যে 'কল্লোল' সাহিত্যপত্রটিকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য গোষ্ঠীর জমায়েৎ হয়েছিল নতুন চেতনা ও প্রত্যয়কে তারাই গল্প-উপন্যাসে সঞ্চারিত করে দিয়েছিল। যদিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এযুগের সার্থক রচনার মূল অংশের কৃতিত্বের যারা অধিকারী তাদের মধ্যে সকলেই নতুন আদর্শবোধে সম্পৃক্ত হলেও অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে 'কল্লোল' বা 'কালি-কলমের' সাথে জড়িত ছিলেননা। সাহিত্য রসিক মাত্রই এ তথ্যে অবহিত। সুতরাং নাম উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

গোটা তিরিশ দশক ও চল্লিশের গোড়ার দিক পর্যন্ত বাংলা গল্প উপন্যাস সাহিত্যে যে ফলাও আবাদ হ'ল তার ফসলে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার ধন্য হ'ল। এই কালের মধ্যে কিছু কিছু সার্থক উপন্যাস রচিত হয় অনেক উপন্যাসে সক্ষম প্রয়াসের স্বাক্ষর দেখা যায়। ছোট গল্পের তো কথাই নেই। কিঞ্চিদধিক একটা দশকে বাংলা গল্প যেন একটা শতাব্দীর স্পর্ধায় এগিয়ে গেল। নতুন স্বাদ ও আঙ্গিকে বংলা গল্পের প্রায় অলৌকিক রূপান্তর হ'ল। যদিও সাফল্যের যে উত্তুঙ্গ গৌরীশৃঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আসীন ছিলেন সেখানে পৌঁছোবার মত কোন দুঃসাহসীর আবির্ভাব তখনও হয়নি। তা না হলেও, অজস্র উৎকৃষ্ট, ছোট গল্পের রক্তলক্ষারে বাংলা সাহিত্যের স্বাস্থ্যের দীপ্তি উজ্জ্বলতর হ'ল। তিরিশের শেষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, তারপরে'৪২ এর জাতীয় আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, কালোবাজার ও দেশবিভাগ প্রভৃতি ঘোর বিপর্যয়গুলি একের পর এক এসে গোটা দেশটাকে ছিন্নভিন্ন করে তার স্থিতি-

ব্যাপকতার মূল আঘাতে আঘাতে বিপর্যস্ত করে তুলল। গত মহাযুদ্ধের পর থেকে যে ভয়ংকর দুর্যোগের ঘনঘটা বাংলা দেশ তথা বাঙালীর জীবনকে আচ্ছন্ন করে আছে তার ঘোর আজও কাটলো না। প্রায় দুই দশকব্যাপী এই কাল সাধারণ মানুষের কাছে কালান্তক সদৃশ হলেও শিল্পীর চেতনায় এই কালান্তক কালের রূপ প্রতিভাত হওয়া উচিত ছিল স্থাম-সমান হয়ে। সাধারণ মানুষের যা চরম দুর্যোগ, ভিন্ন অর্থে শিল্পীর জীবনে তাই পরম সুযোগ। কিন্তু আশ্চর্য এই যে আলোচ্য কালের শিল্পমানসে কালচেতনার যথার্থ সাযুজ্য হ'লনা, যার ফলে সার্থক শিল্প-কর্ম রূপে তার প্রতিফলনও সম্ভব হয়নি। প্রকৃতপক্ষে উপন্যাস ও গল্পসৃষ্টির এমন সুযোগ বাংলা দেশে কখনও আর আসেনি। শিড়দাঁড়া সোজা রেখে এদেশের শিল্পীরা এ সুযোগকে কাজে লাগাতে পারেননি সাধারণ মানুষের মত ছিন্নমূল হয়ে কালস্রোতে শুধু ভেসেই গেলেন। শিল্পীর যে সত্তা কালজয়ী, বজ্রের মত কঠিন অথচ কুসুমের মত কোমল তার কোন সন্ধানই পাওয়া গেলনা এ যুগের শিল্প মানসে। এই কালে কালচেতনার দ্যোতক কোন সার্থক উপন্যাস আজ পর্যন্তও রচিত হয়নি। উৎকৃষ্ট গল্পের সংখ্যাও নগণ্য। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে 'বাংলা বিভাগের' পটভূমিকায় একখানাও ভাল উপন্যাস রচিত হয়নি। আদৌ কোন প্রচেষ্টা হয়েছে বলেও আমার জানা নেই। শিল্প মানসের এ রকম দৈন্যদশায় কখনও কখনও মনে হয় এ দেশের শিল্পসত্তা বুঝি ফসিলে পরিণত হয়েছে।

উপন্যাস ও গল্পের ক্ষেত্রে হালের বাংলা সাহিত্যের চেহারা আরও বিকৃত ও হতাশাব্যঞ্জক। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ব্যাতিক্রমের কথা ছেড়ে দিলে, বলতে বাধা হয়না যে সমকালীন সাহিত্যিকরা জীবনের মূল থেকে বিযুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্বকল্পিত এক জগতে আশ্রয় নিয়েছেন। আপাত রিয়ালিজমের চাকচিক্যে বাইরের কাঠামোটা বজায় রেখে এ এক ধরণের কৌশলী পলায়নপ্রবৃত্তি বলেই আমার মনে হয়। কোন কোন ঔপন্যাসিক ও গল্পকারকে দেখা যায় মনোসমীক্ষণের নামে চূড়ান্ত মনোবিকারের জাবর কেটে কেটে মগ্ন হয়ে থাকতে। সমকালীন সাহিত্যের আর একটি দুর্বলতা এই যে প্রায় অধিকাংশ শিল্পীর মানস-ভূগোলের অস্তিত্ব ক'লকাতার চৌহদ্দীতে সীমাবদ্ধ। শামুকের মত এই মহানগরীর চার দেয়ালের খোলসে বহু

সাহিত্যিক প্রয়াস ক্রেদাক্ত ব্যর্থতায় অবক্ষয়িত। জীবনকে বঞ্চনা করে সাহিত্যের চিন্তা অবাস্তব। বহিরাঙ্গিক নাগরিক চাতুর্যে মানুষকে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হলেও মানুষের হৃদয়ে পৌঁছানো যায়না, আর তা না হলে মানুষের সহিত অর্থে সাহিত্যের যে মৌলিক ব্যঞ্জনা তাও নিরর্থকতায় পর্যবসিত হয়।

দীর্ঘ ভূমিকার এই আলোতেই আলোচ্য গ্রন্থ "পূর্ব বাংলার সমকালীন সেরা গল্প" সংকলনের আলোচনার সূত্রপাত করব। পূর্বে উল্লিখিত মহাযুদ্ধের কাল থেকে সাম্প্রতিক কাল অবধি চল্লিশ ও পঞ্চাশের প্রতিকূল কালের নিষ্পেষণে পশ্চিম বাংলার মত পূর্ব বাংলাও সমানভাবে পীড়িত হয়েছে। বাংলা বিভাগের পরে বাস্তুত্যাগের এপার ওপারের হিড়িক ও তজ্জনিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক বিপর্যয়ের মুখোমুখী হয়ে গত দশ বছরে পূর্ববাংলার শিল্পীরা যে দৃঢ় প্রতিরোধী শিল্প-মানসের পরিচয় দিয়েছেন তা রীতিমত বিস্ময়কর। আলোচ্য গ্রন্থখানি এই বলিষ্ঠ শিল্প-মানসেরই সংকলন। অন্যদিকে পশ্চিম বাংলার শিল্পীগোষ্ঠীর অধিকাংশের শিল্পকর্মে প্রতিরোধের ইঙ্গিত বিরলপ্রায় এরা অনেকে হয় কালস্রোতে প্রতিরোধবিহীন দুর্বলতায় আবর্তিত হয়েছেন নয় জীবন থেকে সরে দাঁড়িয়ে বাঁকা চোখের তীর্যকতায় মানুষের মূল সত্তাকেই অস্বীকার করেছেন। শিল্পী যদি মানবিক সত্তার অস্তিত্বে আস্থাবান না হন তবে অনেকগুণ থেকেও তিনি নির্গুন। নাগরালি চাতুর্যে বহিরাঙ্গিক শিল্প সৌকর্যে নিপুণ এপারের সমকালীন গল্পের একটা বৃহৎ অংশ এই নির্গুণ সাহিত্যকর্মের নির্মোকে কোন ক্রমে টিঁকে আছে মাত্র। পূর্ববাংলার শিল্পীরা কিন্তু জীবন থেকে পলায়ন করেনি। ভাঙ্গা-গড়া, বিপর্যয় ও যন্ত্রণার মুখেও মানুষের মানবিক অস্তিত্বের শক্তিতে তারা আস্থা হারায়নি। মানুষের মধ্যে থেকে তারা মানুষকে বুঝতে চেয়েছে, দেখতে চেয়েছে ; তাদের সুখ-দুঃখ ও বেদনায় অনুভাবিত হয়েছে, অনুরণিত হয়েছে। তাই তাদের সাহিত্য রাজধানী ঢাকা নগরকোলাহলের বাইরে রমনা ও ফরাস-গঞ্জের সীমানা পেরিয়ে বুড়ীগঙ্গার স্রোত বেয়ে ছড়িয়ে পড়েছে মাঠে ঘাটে, পল্লীতে প্রান্তরে, চাষীর কুটিরে, মেহনতী মানুষের বস্তিতে। হাসি-কান্না, আশা-নিরাশা, শিল্পীর জীবনবোধ ও গভীর সংবেদনশীলতার স্পর্শে রূপ লাভ করেছে আলোচ্য সংকলনের প্রায় প্রতিটি গল্পে। পূর্ব বাংলার সমকালীন সেরা গল্প সংকলনের এই মূল সুর। এই সুরেরই বিভিন্ন খাদের বিস্তার সংকলিত গল্পগুলিতে।

উত্তরসূরী

কালের বিবর্তনে অন্ধকার ও দুর্যোগ মানুষের জীবনের এক অনিবার্য সত্য। কিন্তু একমাত্র সত্য নয়। মানব এবং মানবতার কালোত্তীর্ণ প্রগতিশীল অস্তিত্বের আস্থাশীলতার আশাবাদে পূর্ববাংলার শিল্পী গোষ্ঠী গভীরভাবে অনুপ্রানিত। জীবনের প্রতি তন্নিষ্ঠ আদর্শবোধের প্রেরণায় তারা একদিকে মানুষের দুঃখ কষ্ট বেদনার সহৃদয় মর্যাদা যেমন দিয়েছেন, অন্যদিকে জীবনের অমর্যাদা ও গ্লানি থেকে উত্তরণের বলিষ্ঠ ইঙ্গিতও দিয়েছেন।

আলাদা আলাদা করে গল্পগুলির বিচার করলে অবশ্যই অনেক দোষ ত্রুটি চোখে পড়ে শিল্প নৈপুণ্যে রসোত্তীর্ণ কোন অসাধারণ ছোট গল্প এই সংকলনের সংগ্রহে আছে বলে আমি মনে করি না; কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা মোটেই বড় কথা নয়। সে রকম আশা করাও অযৌক্তিক। আলোচ্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ শিল্পী বয়সেও অপ্রবীণ। প্রকৃত অর্থে রসোত্তীর্ণ সার্থক শিল্পকর্মের মূলে যে প্রস্তুতি, সাধনা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তা হয়ত এদের অনেকের পক্ষেই এখনো অর্জনসাপেক্ষ। একক ভাবে না হলেও একত্রে, আদর্শগত ঐক্যে, উদার হৃদয়বত্তায়, মানবিক বোধের গভীর অনুভবে এরা সকলেই সার্থক ও উজ্জ্বল। পূর্ববাংলার সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে রেনেসাঁস আন্দোলনের সূত্রধররূপে এরা বিশিষ্ট হয়ে থাকবেন।

এই সংকলনের অন্তর্গত হৃদয়বান শিল্পী গোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষভাবে আমাকে প্রীত করেছে শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ, শাহেদ আলী, আতোয়ার রহমান, আবদুল হাই, জহির রায়হান ও সুচরিত চৌধুরী। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য আবুল কালাম শামসুদ্দিন, বুলবুল চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী, আলউদ্দিন আল আজাদ, বোরহানউদ্দিন জাহাঙ্গীর, সরদার জয়েন উদ্দীন, হাসান হাফিজুর রহমান ও আবদুল গাফফার চৌধুরী। এরা সকলেই শক্তির আক্ষর রেখেছেন নিজেদের রচনায়। সংকলনের প্রথম দুটি গল্পে প্রবীণ শিল্পীদ্বয় তাঁদের খ্যাতি বজায় রেখেছেন।

সম্পাদকের ভূমিকা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা শেষ করি :

"আর একটা কথা। মারমুখো কোন বোধ থেকে বলছিনা—বলছি বাঙালী হিসাবেই। পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গের সাহিত্যের প্রতি কিছুটা বা উদাসীন। এই উদাসীনতা এতে খানিকটা দূর হ'লে আমার প্রয়াস সার্থক বলেই মনে করব।"

কথাটা ভাববার মত।

সুধীন্দ্র দাশগুপ্ত

ভিয়েৎনামের লোককবিতা

প্রথম প্রেম

সে তার গায়ের কোট প্রিয়তমের হাতে তুলে দিয়েছিলো !
বাড়ীতে ফিরে, মা বাবাকে বললো :
যখন ব্রিজ পেরোচ্ছিলেম, হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে গেছে তাকে, গা থেকে।
তার প্রিয়তমের আঙুলে পরিয়ে দিয়েছিলো নিজের অঙ্গুরীয়।
বাড়ীতে ফিরে, মা বাবাকে বললো :
যখন পুল পেরোচ্ছিলেম, হঠাৎ টুপ্ করে পড়ে গেলো সে জলে খসে !
প্রিয়তমকে উপহার দিলো সে তার মাথার টুপি।
বাড়ীতে ফিরে, তাদের বললো : যখন সাঁকো পেরোচ্ছিলেম,
ঝড়ের হাওয়া উড়িয়ে নিয়েছে তাকে, মাথা থেকে।

বাড়ীতে ফিরে পিতা মাতাকে বললো না—
ব্রিজের ওপর হারিয়ে এসেছে, পেরোচ্ছিলো যখন—
সে তার মন !

ঘুম পাড়ানী ছড়া

সোনা মনি ঘুমো রে !
হেমন্তে ভিজে-ভিজে হাওয়া বইছে
সারা রাত হু হু ক'রে কথা কইছে !
সারা রাত মার চোখে এককোঁটা ঘুম নেই,
সোনা মনি ঘুমো রে !
মেঘের চাদর টেনে চাঁদ ঘুমালো

দুষ্টু ওই তারাগুলো খেলা থামালো—
সোনামনি খেলে না,
চোখ দুটো মেলে না !
সারারাত মা'র চোখে ঘুম নেই, ঘুম নেই,
সোনামনি ঘুমো রে !
(ওগো তুমি কাছে নেই, তোমার কথাই
ভেবে ভেবে ঘুমকে তাড়াই ।)

অনুসরণে : বটকৃষ্ণ দে

বসন্ত-গান

আহ্‌মাদ আবু সায়ীদ

চলো, স্বাখো, পরিশেষে ভূমিষ্ট আনন্দ ।

স্বচ্ছন্দ জীবনে—না-পছন্দ
ইচ্ছা, বৃত্তি, গতায়ু এখন ।
চলো, স্বাখো, আয়োজিত সুন্দর জীবন ।

আলোর প্রশংসা ঝোলে গোলাব শাখায়
সকালে, তোমার মুখ হাসিতে উজ্জ্বল ।
দুধ-ঘাম অমৃতে এখন
পরিপ্লুত, অন্তরে খুশীর শ্লোক কী কথা শুনায় ।

চলো, স্বাখো, আয়োজিত অনিন্দ্য জীবন ।

কালের মহৎ লগ্নে উন্মোচিত গোলাব যৌবন,
বসন্ত, অনন্ত তুমি আনন্দ, উজ্জ্বল ।

আরবী ভাষা থেকে অনুবাদ : আবদুস্ সাত্তার

কবি লেবাননের অধিবাসী

রূপসী

পুশ্‌কিন্‌

সকলি সাবলীল সব আশ্চর্য
সকলি পৃথিবীর, রিপুর ঊর্ধ্বে,
সে থাকে নিশ্চুপ লজ্জারুণ মুখ
আপন স্নিগ্ধ রূপের স্বর্গে।
চতুর্দিকে সে হরিণ চোখে চায়
বন্ধু নেই—নেই প্রতিদ্বন্দ্বী,
হারিয়ে যায় তার সে পরিমণ্ডলে
অন্য রূপসীর পাংশু ক্ষন্দী।

যেদিকে অতি দ্রুত যাও না কেন তুমি—
হয়ত প্রেমিকার বিদায় লগ্ন,
মনের মোহনায় লালন কর তুমি
যে কোনো অপরূপ সোণালী স্বপ্ন,
তবু অকস্মাৎ দেখলে তাকে তুমি
থমকে পথে থেমে যাবে অনিচ্ছায়,
অলোকস্বর্গীয় রূপের সকাশে
প্রার্থনায় ধীর আনত শ্রদ্ধায়।

রুশ ভাষা থেকে 'ক্রাসাভিৎসা' কবিতার
অনুবাদ : বিনয় মজুমদার

রাগসঙ্গীতে ঘরাণার বৈশিষ্ট্য

সঙ্গীত জগতে ঘরাণা বা ঘরোয়াণা শব্দটীর অর্থ—বংশগত বিদ্যা পদ্ধতি বা রীতি। যে নিয়ম অবলম্বনে গায়কের গায়কী ও বাদকের বাজনার প দ্ধতি নিরূপিত হয় এবং যে পদ্ধতি বংশানুক্রমে ও শিষ্য-শিষ্যা পরম্পরায় চলে আসে তাঁকেই আমরা "ঘরাণা" বলি। বস্তুত ঘরাণা—কোনও উচ্চস্তরের সাধকের অবদান স্বরূপ। সাধক সাধনায় সিদ্ধ হতে যে সব গুরুর নির্দ্দেশ পালন করে অগ্রসর হয়েছেন তাদের পুঞ্জীভূত জ্ঞানসঞ্চয়ের ফলই—এই ঘরাণা। সুতরাং ঘরাণা যেমন পুরাকাল থেকে চলে আসছে—যেমন "সেনীয় ঘরাণা—তেমন যে কোন সময়ের সাধকের সিদ্ধ জ্ঞানের ফল থেকেও ঘরাণা সৃষ্টি সম্ভব।

ইংরাজিতে "ঘরাণা"কে স্কুল বা স্টাইল (School or Style) বলে। তব্‌লা বাদকের বিভিন্ন "ঘরাণা" কে অনেকে বাজ বলেন। যথা দিল্লীর বাজ লক্ষ্ণৌর বাজ, বেণারসী বাজ ইত্যাদি।

আজকাল প্রায়ই প্রশ্ন করতে শোনা যায়—

(ক) কণ্ঠসঙ্গীতে কিরাণা ঘরাণা অর্থাৎ যে গায়ন পদ্ধতি স্বর্গত ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ সাহেব সৃষ্টি করে গিয়েছেন সেই তুলনায় ওস্তাদ কৈয়াজ খাঁ সাহেবের প্রবর্তিত গায়ন পদ্ধতির মধ্যে কোন রীতিটি শ্রেষ্ঠ ?

(খ) ওস্তাদ হাফেজ আলি খাঁ ও ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সরোদ বাদনের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ ?

(গ) সেতারে পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও বিলায়েৎ খাঁ—এই দুজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এবং বাদনরীতি বা পদ্ধতি সবচেয়ে ভাল ?

উপরোক্ত প্রশ্নগুলি ক্রমে ক্রমে আলোচনা করা যাক—

(ক) সাধনায় সিদ্ধ এই দুই প্রকার গায়ন পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠ ও বহু উচ্চস্তরে অবস্থিত। স্থান, কাল ও পাত্র বা শ্রোতা ভেদে এদের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হয়।

সঙ্গীত সম্মেলনে এই উপরোক্ত তুলনামূলক গায়ক ও বাদকদের গান বাজনা শোনার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তাঁরা দেখেছেন সেখানে শ্রোতাগণ আব্দুল করিম খাঁ সাহেবের কণ্ঠসঙ্গীত ও ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কণ্ঠ সঙ্গীত সমভাবেই মন্ত্রমুগ্ধের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা একমনে শুনেছেন ও আনন্দ পেয়েছেন।

কিন্তু এই গুণীদ্বয়ের সঙ্গীত পরিবেশন ভঙ্গির মধ্যে একটি বিশেষ প্রভেদ লক্ষ্য করার বিষয়। একজন ধ্যানস্থ ঋষির ন্যায় মনে হয় অচেতন অবস্থায় ঘুমে তন্ময় হয়ে, সঙ্গীত পরিবেশনে নিমগ্ন—অন্যজন জ্ঞানী ও সজাগ দরবারী গায়ক—লোকরঞ্জনে প্রবৃত্ত। একজন সঙ্গীতকে ভগবৎ আরাধনা হিসাবে ব্যবহার করছেন, অন্যজন লোক মনোরঞ্জনে ব্যবহার করছেন।

যাঁরা আব্দুল করিম খাঁ সহেবের কণ্ঠে কলকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে—শেষবারের মত "মিঞাকি টোড়ি" আলাপ সকাল দশটা থেকে বারটা পর্যন্ত শুনেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ একাসনে বসে নীরবে শুনেছিলেন সেই ধ্যানমগ্ন সাধকের অপূর্ব্ব সুমধুর দরদ ও গাম্ভীর্য-পূর্ণ স্বরবিস্তার, কণ্ঠ ও নাভিমূল হ'তে নির্গত হলক্ ও খাণ্ডার বাণীর গমকী তান। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের গায়ন পদ্ধতি যদিও একটু অন্য ধরনের—তবু দরবারী গায়ক হিসাবে তার গায়নরীতি ছিল উচ্চাঙ্গের ও রাজসিক। তিনি তাহার কণ্ঠ সঙ্গীত শ্রোতার নিকট সচেতন অবস্থায় পরিবেশন করতেন। এমনও দেখা গিয়ছে—রসিক শ্রোতার বাহবা ধ্বনির সঙ্গেই সঙ্গেই তিনি হাত তুলে সমজদারের প্রশংশাবলী সাদরে গ্রহণ করতেন। রসসৃষ্টির এই অপূর্ব্ব কৌশল তাদের জানা ছিল। ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ সাহেবেরও সেই ক্ষমতা ছিল। তার সেতার বাদ্যে শ্রোতার প্রাণে যে আনন্দ হোত সেইরূপ অধুনা কারও বাজনায় শুনিনি। সাধকের মধ্যে এই যে প্রভেদ তা লক্ষ্য করবার বিষয়। একজন সঙ্গীতকে মানব হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার করতে বা লোক মনোরঞ্জন করতে প্রয়োগ করেছেন, অন্যজনে ভবগৎ আরাধনার মতই সুরব্রহ্মের সাধনায় রত ছিলেন।

ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ সাহেব ও ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের শিষ্য বা শিষ্যা যাঁরা তাঁদের পদ্ধতি বা গায়কি অনুসরণ করেন বা তাদের নিকট শিক্ষা পেয়েছেন তাঁরা কেউই এ সাধকদের সমকক্ষ সাধনার নিকট স্তরেও

পৌঁছাতে পারেননি। সুতরাং অনেক সময় তাদের সঙ্গীত পরিবেশন ভঙ্গী নকল করলে আমাদের নিকট অস্বাভাবিক ও অনুপযুক্ত বা বেখাপ্পা বলে মনে হয়। বিশেষত ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের মরদানা ঢং অনুসরণ করে তা যদি কোনও মহিলা শিল্পী কণ্ঠ-সঙ্গীত পরিবেশন করেন তা প্রশংসনীয় হলেও তবুও শোভনীয় ও সুশ্রাব্য হয় না।

প্রত্যেক ঘরাণার গায়ক বা বাদকের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে যা' দ্বারা এক ঘরাণা হ'তে অন্য ঘর প্রভেদ বিবেচিত হয়। রামপুরের মস্তাক হোসেনের গায়কীর সঙ্গে বড়ে গোলাম আলি খাঁর গায়কীর কোন তুলনা হয় না—একই রাগ এই দুই ওস্তাদ পর পর গান করলেও রাগের রূপ বর্ণণা যদিও এক হ'বে তবুও প্রকাশভঙ্গী দু'জনের দু রকম।

(খ) হাফেজ আলী খাঁ সাহেবের ও ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের সরোদ বাদন পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলার পূর্ব্বে এঁদের "ঘরানা" সম্বন্ধে বা সঙ্গীত শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। এরা উভয়েই ভারতবর্ষের বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ যন্ত্রী। উভয়েই সরোদ বাদ্য যন্ত্রে সিদ্ধহস্ত। উভয়েরই শিক্ষা শেষ পর্যন্ত সেনী ঘরানায়, এক গুরু—তানসেন দৌহিত্র বংশের প্রসিদ্ধ বীনকার উজির খাঁ সাহেবের নিকট—কিন্তু ব্যক্তিবিশেষে যে সঙ্গীত সাধনা পৃথক হয়—এঁরা তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নীচে তাঁদের ঘরানার ইতিহাস ও বাদ্যরীতি সংক্ষেপে বর্ণিত হ'ল।

হাফেজ আলী খাঁ :

ভারতের সরোদ বাদ্যের অন্যতম প্রবর্তক ওস্তাদ্ গোলাম আলি খাঁ তাহার পিতামহ। গোয়ালিয়র রাজ-দরবারে সরোদ বাদক ওস্তাদ নান্নে খাঁ ছিলেন তাঁর পিতা। তাঁর নিকটই প্রথম শিক্ষা পরবর্তী জীবনে তিনি তানসেনের দৌহিত্র বংশের স্বনামধন্য ওস্তাদ উজির খাঁ সাহেবের নিকই আলাপ ও রাগ রাগিণীর শিক্ষা করেছিলেন।

খানদানী ঘরোয়ানার উত্তম শিল্পীর পরিচয় তাঁর ব্যাপ্ত রীতিতে পরিস্ফুট মেজাজ শিল্পীর, শান্ত ধীর স্থির কণ্ঠ সুরেলা আলাপবাদন পদ্ধতিতে পুরোনো ধ্রুপদী চালের বিলম্পদ, মদ্ধ দ্রুত, গমক জোড় সুন্দর স্বাভাবিক ও অনায়াসসাধ্য। তার যন্ত্রে আঘাত ও সুরসৃষ্টির কৌশল কলাকারের

মানসিক সৌন্দর্যের ও পরিচ্ছন্নতার পরিচয় দেয়। বাদ্য বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না বলে প্রায়ই শ্রোতার অতৃপ্তির কারণ হয়। তিনি একসঙ্গে একই রাগের স্বর বিন্যাসে বেশীক্ষণ থাকেন না। কারণ হয়ত পুনরাবৃত্তি দোষ ও একঘেয়েমী এড়াবার জন্য। বাদন ভঙ্গী স্বল্পস্থায়ী হলেও অত্যন্ত সুশ্রাব্য ও আনন্দদায়ক—

ওস্তাদ আলীউদ্দিন খাঁ :

প্রথম সঙ্গীত শিক্ষা গান গৎতোড়া, সরগম,—গোপাল ভট্টাচার্য্যের কাছে (মুলো গোপাল) সানাই, পাখোয়াজ, কর্ণেট, বেহালা, তোলক ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে নন্দবাবু, ওস্তাদ রামকানাইবাবু, রামধন ওস্তাদ ও হাবু দত্ত মহাশয়-গণের নিকট। প্রথম সরোদ শিক্ষা—সুপ্রসিদ্ধ ওস্তাদ আহম্মদ আলি খাঁ কাছে —পরে রামপুরের নবাবের ওস্তাদ প্রসিদ্ধ বীনকার উজীর খাঁ সাহেবের নিকট ধ্রুপদ ও বীনের আলাপের তালিম।

খানদানী ঘরানার উত্তম পদ্ধতি অবলম্বনে আলাপ, গৎতোড়া বাদনে সিদ্ধহস্ত। বাদ্যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় পরিস্ফুট। মেজাজ কখনও শান্ত কখনও বা অস্থির কণ্ঠ সুমধুর বলা যায় না। তবে জ্ঞানী ও গুনী। আলাপ বাদন পদ্ধতি উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদী চালের ও খেয়াল মিশ্রিত তানের, বিবিধ অলঙ্কার যুক্ত জোড়, গমক যুক্ত তান সুন্দর ও সুশ্রাব্য ; অত্যন্ত কঠিন আয়াস সাধ্য বোল ও তৈয়ারী তান বাজাবার প্রচেষ্টায় বাদক সর্ব্বদাই—সক্রিয় থাকার দরুণ কখনও কখনও সুরভ্রষ্টের কারণ হয়। সুর সৃষ্টি-প্রতিভা বিদ্যমান ও মার্জিত। সৌন্দর্যবোধ প্রখর। আলাপ ও গৎ তোড়া—বাদ্যরীতি বেশীক্ষণ-স্থায়ী সম্পূর্ণাঙ্গের ও শ্রোতার তৃপ্তি দায়ক। আলাপের সঙ্গতবিহীন অংশ ও সঙ্গীতাংশের জ্ঞান বাদ্যে পরিস্ফুট। পরিবেশন ভঙ্গী উত্তম কলাকারের পরিচায়ক।

এই সুর শিল্পীদ্বয়ের শ্রেষ্ঠত্বের বিচার করা খুবই কঠিন। উভয়েই গুণী ও কলাকার। একজন ছোটবেলা থেকে অনায়াসে পিতৃদত্ত বিদ্যা জ্ঞান ও ধ্যান অর্জন করে সারাজীবন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত ভোগবিলাসের মধ্যে থেকে সাধনায় রত ও অন্যজন বহু কষ্টে ওস্তাদদের পদসেবা করে সঙ্গীতের জ্ঞান ও ধ্যান শিক্ষা করে সারাজীবন সেই সাধনায় অগ্রসর হয়ে চলেছেন। তবে কষ্ট কখনও বিফলে যায় না—তাই আজ আলাউদ্দিন খাঁর সঙ্গীত মাধুর্যে

ও পাণ্ডিত্যে বাঙ্গালার সকলেই গৌরবান্বিত। আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব যেমন পাণ্ডিত্যে ও সুশিক্ষাদানে খ্যাতি অর্জন করেছেন হাফেজ আলী খাঁ সাহেবও সুর রচনার সৌন্দর্য্য বোধ ও কৌশল প্রদর্শনে খানদানী ঘরের বৈশিষ্ট প্রদর্শন করেছেন।

(গ) ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ মাত্র দশবৎসর বয়সে তাঁর পিতা ভারতবিখ্যাত সেতারী—মদীয় গুরু এনায়েৎ খাঁ সাহেবকে হারিয়েছেন। জ্ঞান হওয়ার পর মাত্র পাঁচ বৎসর খাঁ সাহেব তাঁকে তালিম দিতে পেরেছিলেন। সেতার বাদনের যাবতীয় রীতি (Technique) সে খাঁ সাহেবের কাছেই পেয়েছিল, কিন্তু অল্পবয়সে পিতৃহারা হওয়ার দরুণ বিদ্যা, শিক্ষা ও জ্ঞানের যে গুরুতর অভাব ছিল সাধনায় ও চেষ্টার ফলে সে তাহা পূর্ণ করেছে। সে বাজের দাপটে এনায়েৎ খাঁ সাহেব বিদ্যুৎসম স্পষ্টতান গমকীর তান ও ঝংকার দ্বারা একসময়ে ভারতবর্ষের সকল সেতারীকে নিষ্প্রভ করে রেখেছিলেন বিলায়েৎ পিতার সেই গুণ বংশানুক্রমে পেয়েছে পেয়েছে আর পিতৃতুল্য শিল্পীর মন সুর, লয়, তৈয়ারী, সৌন্দর্যবোধ, বিবিধ অলঙ্কারের প্রয়োগ এই সবেই তাঁর অধিকার ও দখল রয়েছে। বিলায়েৎ খাঁর আলাপ বাদন ও গৎতোড়া বাদন পদ্ধতিতে তাহার পিতামহ ইমদাদ খাঁ সাহেবের ও পিতা এনায়েৎ খাঁ সাহেবের ঘরোনা পরিস্ফুট। তাহার আলাপ বন্ধান রীতির আলাপের অনুকরণে গঠিত।

পণ্ডিত রবিশঙ্করের সঙ্গীত সাধনাও প্রশংসনীয় ; আলাউদ্দিন খাঁর জামাতা হওয়ার ফলে তিনি পুত্রের তালিম পেয়েছেন ও সাধনায় অগ্রসর হয়েছেন সেতারী হিসাবে ভারত কেন অধুনা জগৎ বিখ্যাত সুনাম অর্জন করেছেন। তাহার প্রথম সঙ্গীত ভ্রাতা উদয়শঙ্করের নৃত্য সঙ্গীতের সঙ্গে ওস্তাদ আলা-উদ্দিন খাঁ সাহেবের নিকট শিক্ষার ফলে তাহার সেতার বাদ্যে সরোদ যন্ত্রের কতকগুলি বোলমিশ্রিত কাজ পাওয়া যায় যা সেতারের বাজকে নূতন অলঙ্কারে সমৃদ্ধ করেছে। পণ্ডিত রবিশঙ্করেরও উচ্চাঙ্গের আলাপ পদ্ধতি সেনীয় ঘরানায় অনুকরণে। তাহার খড়জীমন্দরের তারে অর্থাৎ আমাদের ব্রাহ্মণ স্থানে মন্দ্র সপ্তকের আলাপের গম্ভীর কাজ অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও প্রশংসনীয়। গৎতোড়ায় বিবিধ ছন্দ, বোল ও অলঙ্কারের কাজ উল্লেখযোগ্য।

জিতেন্দ্রমোহন সেন

রবীন্দ্রসঙ্গীতে রাগ প্রয়োগ

অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর গান রচনা করে গেছেন। তাঁর গানের রস সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হলে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে আলোচনা করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রসংগীতে রাগের ব্যবহারও একটি বিশেষ দিক।

রাগের প্রধান উদ্দেশ্য শ্রবনেন্দ্রিয়কে রঞ্জন করা। অর্থাৎ শুনতে ভালো হওয়া চাই। এ জন্যই দেখা যায় পণ্ডিত ব্যাঙ্কটমুখী প্রবর্তিত বাহাত্তর ঠাটের মধ্যে মাত্র দশটি ঠাট গ্রহণযোগ্য হয়েছে, এবং ঔড়ব জাতি বা পাঁচটি স্বরের কম স্বর-সংখ্যা দিয়ে রাগ-গঠন সম্ভব বিবেচিত করা হয় নি। একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক, স্থান ও কাল ভেদে রাগ পরিবর্তনশীল। সে জন্যই উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের রাগরূপ ও রাগ নিয়মাবলী ভিন্ন এবং শতাব্দী পূর্ব ও পরের রাগ-রূপে পার্থক্য লক্ষিত হয়।

সকলেই জানেন উৎকৃষ্ট সংগীত শোনার সুযোগ রবীন্দ্রনাথের যেমন হয়েছিল, এমন খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে। উৎকৃষ্ট সংগীতের ভাব ও রূপকে তিনি উত্তমরূপে অন্তরে যথাযথ গ্রহণ করেছিলেন এবং অনুকরণীয়ভাবে স্বীয় সংগীত রচনায় প্রকাশ করেছিলেন। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, ভারতীয় সংগীতের বৈশিষ্ট্য ও ধারাবাহিকতা (tradition) রবীন্দ্রসংগীতে যথাযথ রক্ষিত হয়েছে। এই উক্তি-সম্পর্কিত তথ্য না পড়া বা না শোনা থাকলেও একমাত্র রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা ও অনুশীলন থেকেই অনুভব করা সহজ যে সুর-যোজনার দিক থেকে রবীন্দ্রসংগীতে তিনটি ধারা খুব স্পষ্ট: প্রথমত ভারতীয় বিশেষ করে উত্তর ভারতীয় রাগ সংগীতের ধারা দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্র-পূর্ব সংগীত রচয়িতাদের সংগীত ধারা এবং তৃতীয়ত লোক সংগীতের ধারা। রবীন্দ্র সংগীতে রাগপ্রয়োগে এই তিনটি ধারার প্রভাব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

রাগ-প্রয়োগের দিক থেকে বিবেচনা করলে রবীন্দ্রসংগীতকে মোটামুটি দু ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত রাগের ভিত্তিতে রচিত গান, দ্বিতীয়ত মিশ্র রাগের ভিত্তিতে রচিত গান। এই দুটি শ্রেণীর মধ্যে নানা বৈচিত্র্যের সন্ধান মেলে, যা আলোচনাযোগ্য।

রাগের ভিত্তিতে রচিত গান : এই গানগুলি তিনভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা চলে—মূল গানের যথাযথ আদর্শে রচিত, মূল গানের ছায়াবলম্বনে রচিত এবং স্বাধীনভাবে রচিত গান।

মূলগানের যথাযথ আদর্শে রচিত গান বলা যায় সেই গানগুলিকে যে-গুলির সুর ও ছন্দ হুবহু অন্য কোনো গান থেকে নেওয়া। এই রকম গানের সংখ্যা খুবই কম এবং লক্ষ্য করলে এতেও রবীন্দ্রবৈশিষ্ট্যের সন্ধান মেলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'প্রচণ্ড গর্জনে আসিল এ কী দুর্দিন' গানটির উল্লেখ করা চলে। গানটির সুর ও ছন্দ হুবহু মূল 'প্রচণ্ড গর্জন নবজল বরষা ঋতু' গানের অনুরূপ। বিষয়বস্তু হিসেবে জানকী দাস রচিত মূল গানটি বর্ষার একটি গান; রবীন্দ্র সঙ্গীতটি পূজা-পর্যায়ে স্থান পেয়েছে—যদিও 'প্রচণ্ড গর্জনে আসিল এ কী দুর্দিন' গানটি বর্ষানুষ্ঠানে গাওয়ার রীতিও প্রচলিত আছে। তাছাড়া সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথা হল এই, দুটি গান গাওয়ার 'চাল' স্বতন্ত্র। 'শূন্য হাতে ফিরি হে', 'চরণধ্বনি শুনি তব নাথ', 'আজি বহিছে বসন্ত পবন', 'দাঁড়াও মন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড' আজে ইত্যাদি গানের সুর অনেকাংশে মূল গানের মতো হলেও কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে।

মূল গানের ছায়াবলম্বনে রচিত গানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রবীন্দ্র-গানের পার্থক্য তিন প্রকার—সুরে, ছন্দে ও লয়ে। মূলাদর্শে রচিত গানের মধ্যে এ রকম গানের সংখ্যাই বেশি। সুরের গঠন ও ছন্দের গতি এতই পৃথক যে ভাঙা-গানটি শোনার সময়, মূল গানের প্রভাব বা স্মৃতি মন থেকে সরে যায়। কোথা যে উধাও হল' 'কার বাঁশি নিশি ভোরে', 'এ কী করুণা করুণাময়' ইত্যাদি গান এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

রাগের ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে রচিত গান। আমি কেমন করিয়া জানাব, কি গাব আমি কি শুনাব, এবার নীরব করে দাও হে ইত্যাদি গান সার্থকভাবে রাগ প্রয়োগের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। রাগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনুভূতি ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এরূপ সুরযোজনা সহজ হয়েছে।

মিশ্র রাগের ভিত্তিতে রচিন গান : এই শ্রেণীর গানেও বৈচিত্র্য বড়ো কম নেই। একাধিক রাগের মিশ্রণ হলে বলা হয় মিশ্র রাগ। প্রচলিত মিশ্র রাগে রবীন্দ্রনাথ অনেক গান রচনা করেছেন। যেমন, পরজ-বসন্ত, বেহাগ-খাম্বাজ, রাগেশ্রী-বাহার ইত্যাদি। প্রচলিত মিশ্র রাগ সম্বন্ধে কিছু বলা

আবশ্যক। ধরা যাক, পরজ-বসন্ত দুটি স্বতন্ত্র রাগ। কোনো গুণী ও প্রতিভাধর ওস্তাদ দুটি রাগের মিশ্রণ ঘটালেন, শ্রুতিমধুর মিশ্র রাগের সৃষ্টি হল—পরজ-বসন্ত। রাগের প্রধান উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিলল, শ্রুতি-মধুর মিশ্র-রাগের সৃষ্টি হল। তেমনি হল—বেহাগ-শাম্বাজ, রাগেশ্রী-বাহার। রবীন্দ্রনাথ এই মিশ্র রাগগুলিকে গ্রহণ করলেন তাঁর সংগীত-রচনায়। তা ছাড়া, তিনি আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। সুর, কথার সম্পদকে, ভাবকে প্রকাশ করার সহায়তা করল। বেহাগে স্থান পেল কোমল নিষাদ, ভৈঁরো ঠাটের রাগে স্থান পেল কোমল গান্ধার ও কোমল নিষাদ, একাধিক রাগের শ্রুতি-মধুর ও অভূতপূর্ব মিশ্রণ হল। যুগ-যুগ ধরে রাগের বিবর্তন এ ভাবেই চলে আসছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, স্থান ও কাল ভেদে রাগ গতিশীল, পরিবর্তনশীল। সংস্কারমুক্ত হয়ে চিন্তা করলেই বুঝা যাবে, রবীন্দ্র-যোজিত এই সকল নূতন স্বর ও সুর-প্রয়োগ সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত ভালভাবে আলোচনা না হতে পারে, কিন্তু অ-শাস্ত্রীয় হয় নি। একটা বিশেষ যুগের শাস্ত্র নিয়ে কথা নয়, শাস্ত্রের আদ্যন্ত ইতিহাস প্রসঙ্গেবিবেচ্য।

রবীন্দ্রসংগীতে রাগ-প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে এসে পড়ে—সেজন্য সংক্ষেপে আলোচিত হল। রাগসংগীতে আলাপ রাগ-রূপ বিকাশে একটি প্রধান সহায়। নির্দিষ্ট স্বর-ব্যবহার, আরোহণ-অবরোহণ-ক্রম, বাদী, সম্বাদী, রাগের চলন-নিয়মের সাহায্যে গায়ক রাগের রূপ ফুটিয়ে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ আলাপ গ্রহণ করেছেন অন্যভাবে। তাঁর কতকগুলি বিশেষ গানে ঢালা ভাবে বা আলাপী-ঢঙে গাওয়ার রীতি প্রচলন করে গেছেন। এই গানগুলি শুনলে মনে হয় যেন, রাগের আলাপের ওপর কথা বসানো—তালের ছক-কাটা ছন্দোবদ্ধ গান নয়। রাগালাপের শুধু স্বরের ধ্বনি নয়, তার সঙ্গে বাণীর মিলন। তানকেও রবীন্দ্রনাথ বিশেষ বিশেষ গানের সুরের ভিতরেই গ্রহণ করেছেন। তেমনি রাগ প্রকাশের যা কিছু বৈশিষ্ট্য, রবীন্দ্রসংগীতের সুর-গঠনের মধ্যেই আছে। রবীন্দ্রসংগীত কথা ও সুরের মিলিত রূপ। বিভিন্ন ভাব-প্রকাশের জন্য, বাণীকে অব্যাহত রাখার জন্য রাগ-প্রয়োগের চিরাচরিত ধারাকে তিনি গ্রহণ করেছেন এবং নূতন ধারাকে প্রবর্তন করেছেন। শেষোক্ত এই নূতন ধারা বিশেষভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা-যোগ্য। রাগের প্রধান উদ্দেশ্য

রঞ্জন করা, এবং রাগ-প্রযোগের এই নূতন ধারায় রচিত রবীন্দ্রসংগীতগুলি যখন নিঃসন্দেহে শ্রুতিরসোত্তীর্ণ তখন রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত রাগ-প্রয়োগের এই নূতন ধারার গ্রহণ যোগ্যতা সম্বন্ধে তর্ক বা দ্বি-মতের অবসান কোথায় ?

প্রফুল্লকুমার দাস

রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপি

কমলবনের মধুপরাজি এলো হে কমলভবনে।
কী সুধাগন্ধ এসেছে আজি নববসন্তপবনে॥
অমল চরণ ঘেরিয়া পুলকে শত শতদল ফুটিল
বারতা তাহারি দ্যুলোকে ভূলোকে ছুটিল ভুবনে ভুবনে॥
অহে তারকায় কিরণে কিরণে বাজিয়া উঠিছে রাগিণী,
গীতগুঞ্জন কুজনকাকলি আকুলি উঠিছে শ্রবণে।
সাগর গাহিছে কল্লোলগাথা, বায়ু বাজাইছে শঙ্খ—
সামগান উঠে বনপল্লবে, মঙ্গলগীত জীবনে॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার

II (রিপা পা মা রমা জ্ঞা রা সা রা সরা ন্‌সা-রজ্ঞা র্রা) I
ক০ ম ল ব০ নে র ম ধু প০ রা০ ০০ জি

I (প্‌ ধ্‌ সা সা রা রসা । রসা রা-পা ম জ্ঞা-রসা-রা)}
এ সো হে ক ম ল০ ত০ ব ০ নে০ ০০ ০

I রণা পা ণধা ধর্সণা-ধা পা । পা পা পা পধা-মা পা
কী০ সু ধা০ গ০ ০ ন্‌ ধ এ সে ছে আ০ ০ জি

I পমা পর্সা র্সর্রা । ধর্সা-পধা পা । মা পা-মপধপা । -মপা ম জ্ঞা-রসরা II
ন০ ব০ ব০ ল০ ০ন্‌ ত প ব ০০০০ ০০ নে ০০০

না না না নানর্সাধনর্স । র্সা র্সা র্সা র্সা র্সনা র্সা
অ ম ল চ র০ ণ০০ মে রি য়া পু ল০ কে

I র্সনা র্সা র্রা । রর্জ্ঞা র্রা র্সা । না র্সা-নর্রা । ণা -া -া
শ০ ত শ ত০ দ ল ফু টি ০০ ল ০ ০

I ধা ধা ধা ধা ধা পা । ধা ধপর্সা পা । ধা পা পা
বা র তা তা হা রি দ্যু লো০ কে ভূ লো কে

উত্তরশ্বরী

I সা সা সা রা রসা। রসা রা-পা মজ্ঞা-রসা-রা
ছু টি ল ছু র নে০ ভু০ র ০ নে০ ০ ০ ০

II {মা পা পা পমা পা -া মণা ণা ণা ধা পা পা I
গ্র হে তা র০ কা য় কি০ র ণে কি র ণে

I মা পা মপধা। ধা ধণা পা মা পা-ধপমপা। ম জ্ঞা -া -া I
বা জি য়া০০ উ ঠি০ ছে রা গি ০০০০ ণী ০ ০

জ্ঞ
জ্ঞা জ্ঞা মা -া রা রা রা রা রা সা সা সা
গী ত ও ন্ জ ন কু জ ন কা ক লি

I রা মা মা মা পা পধা। মা পা -ধপমপা। ম জ্ঞা -া -া}
আ কু লি উ ঠি ছে০ শ্র ব ০০০০ ণে ০ ০

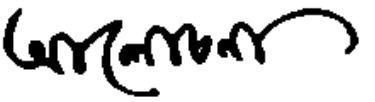
I না না না নর্সা ধনর্সা র্সা -া সা। র্সা র্সনা র্সা I
সা গ র গা হি০ ছে০০ ক ল্ লো ল গা০ ধা

I র্সনা র্সা র্রা। র্রা -র্সা র্রর্মা। জ্ঞা -া -া । জ্ঞর্মা -র্রা -র্সা I
বা০ য়ু বা জ্ঞা ই ছে০ শ ০ ঙ খ০ ০ ০

I র্সনা র্সর্রা র্সা -ণা ণা ণা ধা ধসা ণর্সা। -ণা ধা পা I
সা০ ম০ গা ন্ উ ঠে ব ম০ প০ ল্ ল বে

I সা -া রা । রজ্ঞা রা সা। রসা রা -পা। মজ্ঞা -রসা -রা II II
ম ঙ্ গ ল০ গী ত জী০ ব ০ নে০ ০০ ০

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে



বাংলা সাময়িক পত্রের সূচনা

বর্তমান কালে সংবাদ-পত্র মানব জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়েছে। কিন্তু এর উদ্ভবকাল খুব বেশি দিনের নয়। মাত্র দুশো বছরের মধ্যেই এর সীমারেখা ধরা পড়ে। ইংরেজের এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণ-শিল্পও এদেশে আমদানী হয়। মুদ্রণ শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক সাহিত্যেরও প্রসার হয়। কলকাতায় প্রথম প্রকাশিত James Augustus Hicky-র "Bengal Gazette" প্রকাশিত হয় ১৭৮০ খৃস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি। তারপর কয়েক বছরের মধ্যে প্রকাশিত হয় ইণ্ডিয়া গেজেট, ক্যালকাটা গেজেট, বেঙ্গল হরকরা প্রভৃতি সাময়িক পত্র। এদের মধ্যে ক্যালকাটা গেজেট একমাত্র আজও জীবিত রয়েছে। তার একমাত্র কারণ সরকারী মুখপাত্র বলে। ক্যালকাটা গেজেট-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় মার্চ মাসের ১৭৮৪ খৃস্টাব্দে।

এগুলি ছিল ইংরাজি পত্র। তবে ক্যালকাটা গেজেটে মাঝে মাঝে নানা সরকারী বাংলা বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশিত হত। এই বিজ্ঞপ্তিগুলি ইংরেজির অনুবাদ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামপুর মিশনের পাদরিরাই বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত সাময়িক-পত্র প্রকাশ করেন ১৮১৮ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। এই পত্রিকার নাম দিগ্দর্শন। জোশুয়া মার্শমানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শমান এর সম্পাদক ছিলেন। সেদিনের এই বিদেশী জন বাঙলা দেশে যে নতুন যুগের সূচনা করেন তার উত্তরসূরী হিসাবে আমরা তার ধারা প্রবাহিত রাখতে পেরেছি। "যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ" এই পত্রিকার কলেবরে পূর্ণ ছিল। এই পত্রিকা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। কিন্তু তখনকার

দিনে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে এক উপযোগিতা লক্ষ্য করে পাঠ্য-পুস্তক হিসাবে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি এই পত্রিকার বহুখণ্ড ক্রয় করেছিলেন।

সাময়িক পত্রকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও প্রচার করে অমরতা লাভ করেছেন কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। সংবাদ প্রভাকর গুপ্ত-কবির এক অদ্বিতীয় কীর্তি। এর প্রথম প্রকাশ হয় ২৮-এ জানুয়ারি ১৮৩১ খৃস্টাব্দে। নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে পত্রিকাখানিকে চালিয়ে এর স্থায়ী মর্যাদা দান করেন গুপ্ত-কবি। স্থায়ী বলা হল এই জন্য যে ঈশ্বরচন্দ্রের অকাল বিয়োগে এর প্রবাহ রুদ্ধ হয়নি। তাছাড়া এর লেখক হিসাবে যে সব ব্যক্তির সংস্পর্শ গুপ্ত-কবি লাভ করেছিলেন তাঁরা বেশির ভাগই ছিলেন সে যুগের মনীষী জন। তাঁরা প্রভাকরের বিলুপ্তির পরও নানাভাবে সাময়িক-সাহিত্য প্রচার করে বাংলাভাষা ও বাঙালী জনের সেবা করেছেন। এরই উত্তর সাধক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' ও 'প্রচার' পত্রিকা সম্পাদনা করে অমরতা লাভ করেছেন। আজ বাঙলা দেশ নানাভাবে হতশ্রী হয়েছে। কিন্তু সমগ্র ভারতে সাময়িক পত্র প্রকাশ ও প্রচারে যে বৈচিত্র্য বাঙালী জাতি এনেছেন, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ থাকব নানা জানা-অজানা পূর্বসূরীদের কাছে। তাঁদের অক্লান্ত সেবাতেই এ চেষ্টা ফলপ্রদ হয়েছে :

যূথিকা গুপ্ত

বাংলা আধুনিক কবিতার গতি প্রকৃতি জানতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতার বই পড়ুন ॥

অমিয় চক্রবর্তী	পারাপার । পালাবদল
অরুণ মিত্র	উৎসের দিকে
অরুণ ভট্টাচার্য	ময়ূরাক্ষী
আলোক সরকার	আলোকিত সমন্বয়
কিরণশংকর সেনগুপ্ত	স্বর ও অন্যান্য কবিতা
চিত্ত ঘোষ	অন্তরা
পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য	তৃতীয় নয়ন
পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য	অন্তর্গতি
রাম বসু	যখন যন্ত্রণা
বটকৃষ্ণ দাস	পাখনা
বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়	নিরন্ত নির্ঝর
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	লখিন্দর
সঞ্জয় ভট্টাচার্য	পদাবলী
সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়	ছেঁড়া তাবু



॥ সকল সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায় ॥

REASON ROMANTICISM AND REVOLUTION

IN TWO VOLUMES

Volume One

Contents :

Introduction Philosophy of History
Human Nature
The Law-Governed Universe
The Revolt of Man (Renaissance)
The Revolt of the Angels (Reformation)
The Natural Law
The Birth of Modern Philosophy
The New Science
The Enlightenment
The Great Revolution—I
The Great Revolution—II

Price Rs. 10.50 ; 21s $ 3.00

Volume Two

Romanticism and Reaction
The History of Romanticism
Romantic Extravagance
Liberalism Origin and Tradition
Pallacies of Liberalism
Utilitarianism
Neo-Clasical Rationalism
Hegel to Marx
Marxism
The Twins of Irrationalism
The Crisis of the Twentieth Century
The Way Out
New Humanism

Price Rs. 12/- 24s. : $ 3.50

RENAISSANCE PUBLISHERS PRIVATE LTD.

POST BOX 2636 : CALCUTTA

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক টেম্পল প্রেস ২ শ্যামরত্ন
লেন কলকাতা ৪ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উত্তরসূরী

●

রথীন রায় : জগদীশচন্দ্র ও বাংলা সাহিত্য।
শিবনারায়ণ রায় : বরিস পাস্তেরনাক। শ্যামাদাস সেনগুপ্ত : গ্যেটে ও শিলেরের সহমর্মিতা।
সুরজিৎ দাশগুপ্ত : সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

অরুণ ভট্টাচার্যের একটি সম্পূর্ণ নাট্যকাব্য।
বরিস পাস্তেরনাকের কবিতার অনুবাদ।
প্রতিনিধিস্থানীয় তরুণ কবিদের কবিতা

'বিলিফ ও লিটারেচার' সম্পর্কিত সাহিত্য আলোচনার অংশ গ্রহণ করেছেন আবু সয়ীদ আইয়ুব পি, পদ্মরাজু, পুণ্যশ্লোক রায় ও অরুণ ভট্টাচার্য॥

●

ষষ্ঠ বর্ষ নব পর্যায় ২য় সংখ্যা।
মাঘ-চৈত্র ১৩৬৫

আপনার জামাকাপড় কাচবার জন্যে সেরা

—টাটার ৫০১ স্পেশাল সাবান

আপনার জামাকাপড়ের বিশেষ যত্ন নিতে হ'লে টাটার ৫০১ স্পেশাল সাবানে কাচুন! এই সাবান ব্যবহার করলে জামাকাপড় ধবধবে পরিষ্কার হবে খুব সিল্কি জামাকাপড়ও কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। জামাকাপড় কাচতে হ'লেই টাটার ৫০১ স্পেশাল সাবান ব্যবহার করবেন।



নতুন চন্দ্রবে ও লাল রঙের মোড়ক দেখে নেবেন।

টাটা অয়েল মিলস্ কোং লিঃ

উত্তরসূরী

ষষ্ঠ বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ মাঘ-চৈত্র

প্রবন্ধ

রথীন্দ্রনাথ রায় : আচার্য জগদীশচন্দ্র ও বাংলা সাহিত্য। ৯৭। শ্যামাদাস সেনগুপ্ত : গ্যেটে ও শিলেরের সহমর্মিতা। ১১৫। সুরজিৎ দাশগুপ্ত : কবিপরিচিতি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ১০৮। শিবনারায়ণ রায় : বরিস পাস্তেরনাক। ১৬৭।

কবিতাবলী

অরুণ ভট্টাচার্য : মোমবাতি ও একটি নারীর ভালোবাসা (নাট্যকাব্য)। ১২৭। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মানস রায়চৌধুরী। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকৃতি ভট্টাচার্য। মোহিত চট্টোপাধ্যায়। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত। শক্তি চট্টোপাধ্যায়। শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়। আলোক সরকার। শান্তি লাহিড়ী। শংকর চট্টোপাধ্যায়। কমলেশ চক্রবর্তী। রণজিৎ সিংহ। দিলীপ রায়। দীপক মজুমদার। অনিরুদ্ধ কর। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বটকৃষ্ণ দাস।

বিদেশী কবিতা

বরিস পাস্তেরনাক। অনুবাদ : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

ক্রোড়পত্র

বিলিফ এ্যণ্ড লিটারেচার সম্পর্কিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন আবু সয়ীদ আইয়ুব, পি, পদ্মরাজু, পুণ্যশ্লোক রায় ও অরুণ ভট্টাচার্য

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য

৯বি-৮ কালিচরণ রোড। কলিকাতা ২

There is enduring companionship where tastes are similar. Like cycling, for example.

COMPANIONSHIP

Tastes always meet when it comes to a Raleigh, for this bicycle, distinguished by its attractive finish and graceful proportions, will go along with you for years and years... never failing you and never complaining.



RALEIGH

The World's Most Famous Bicycle

SRC-59

উত্তরসূরী

মাঘ-চৈত্র ॥ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা ॥ ১৩৬৫

আচার্য জগদীশচন্দ্র ও বাংলা সাহিত্য

রথীন্দ্রনাথ রায়

আচার্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনার বিস্ময়কর ইতিহাস আজ সুবিদিত। কিন্তু এই সাধনার পশ্চাৎপটে আছে একটি সৃষ্টিসুখর যুগ-জীবনের প্রবল উৎকণ্ঠা। উনিশ শতকের বাংলাদেশ তার জীবনাবেগ নানাভাবে প্রকাশিত করতে চেয়েছিল। পাশ্চাত্য দর্শন সাহিত্য ও বিচিত্র চিন্তাধারা বাঙালীর মানসলোকে নব-চেতনার সৃষ্টি করেছিল। সংস্কৃতি ক্ষেত্রের বিভিন্ন শাখার মতো নব্য বিজ্ঞানও বাঙালী চিত্তকে কৌতূহলী করে তুলেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন চিন্তানায়কের রচনার মধ্যেও বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার স্পষ্ট ও অস্পষ্ট চিহ্ন নানাভাবে বিদ্যমান। তবু শুধু নবজাগ্রত কৌতূহল ও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার দ্বারা ফলিতবিজ্ঞানকে আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল না। বীক্ষণাগারে বিজ্ঞান সরস্বতীর মূর্তি তাই তখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বাঙালী জীবনের সদ্যজাগ্রত বিজ্ঞান-কৌতূহলকে আচার্য জগদীশচন্দ্রই সর্বপ্রথম সার্থক কর্মরূপ দিলেন। শতবর্ষ পূর্বে জগদীশ-চন্দ্রের আবির্ভাব তাই এক মহৎ সম্ভাবনার সূচনা করেছে। তিনিই সর্বপ্রথম নব্যভারতের বিজ্ঞান-সরস্বতীকে বিশ্ব-মনীষার সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন।

বিজ্ঞান-সাধনা জগদীশচন্দ্রের কর্ম-সাধনার কেন্দ্র হলেও বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গেও তাঁর সংযোগ কম ছিল না। সচরাচর সাহিত্য ও বিজ্ঞানের জগতকে সম্পূর্ণ পৃথক জগত বলেই মনে হয়। বিজ্ঞানকে নিতান্ত টেকনিক্যাল বিদ্যার অঙ্গীভূত করে বিচার করলে বিজ্ঞানকে তার শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দেওয়া সম্ভব হবে না। উচ্চতর বিজ্ঞানও একটি দর্শন। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের সাহিত্যপ্রীতি ও সাহিত্যসাধনা আপাতদৃষ্টিতে

বিস্ময়কর মনে হওয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু জগদীশ প্রতিভার মূলসূত্রটি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে সাহিত্যপ্রীতিও তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভারই একটি বিশিষ্ট রূপমাত্র। বিজ্ঞানকে জগদীশচন্দ্র একটি টেক্‌নিক্যাল বিদ্যা হিসেবেই আয়ত্ত করতে চাননি, বিজ্ঞান-সাধনার ভিতর দিয়ে তিনি উচ্চতর ভাবলোকে প্রবেশ করেছিলেন,—সেখানে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সীমারেখাটুকুও যেন নিশ্চিহ্ন হয়েছে। তাই তাঁর পক্ষে সাহিত্যসাধনা ও বিজ্ঞানসাধনার মধ্যে কোনো বিরোধ ঘটেনি।

জগদীশচন্দ্রের প্রতিভার স্বরূপধর্মটিকে রবীন্দ্রনাথ খুব সুন্দর করে বলেছেন তাঁর একটি প্রবন্ধে : "বিজ্ঞান ও রস সাহিত্যের প্রকোষ্ঠ সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন মহলে, কিন্তু তার মধ্যে যাওয়া-আসার দেনা-পাওনার পথ আছে। জগদীশচন্দ্র ছিলেন সেই পথের পথিক।"(১) জগদীশচন্দ্র তাঁর বিজ্ঞান-সাধনার যে সমুচ্চ শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন তার সঙ্গে সাহিত্যের কোন বিরোধ নেই। তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলির মধ্যে আছে এক ভাব-গভীর দার্শনিক দৃষ্টি—যে দৃষ্টি সাহিত্য সৃষ্টিরও প্রাণ। যেখানে তিনি বিশ্ব-রহস্য জিজ্ঞাসায় উৎকণ্ঠিত, সেখানে কবির জিজ্ঞাসার সঙ্গে কোনো বিরোধ ঘটার সম্ভাবনা নেই। সাহিত্যিকসত্তা জগদীশচন্দ্রের কোনো স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নয়, তাঁর বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসারই একটি রূপভেদ মাত্র। এ সম্বন্ধে তাঁর একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

"কবি এই বিশ্ব জগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে পান, তাঁহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না।.....বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিনরাত্রি কাজ করিতেছে বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই মানব-ভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।(২)

উদ্ধৃত অংশটিতে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের উপলব্ধি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিজ্ঞান সাধনায় তিনি যে প্রকাশাতীত রহস্যকে উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করেছেন, তা-ই তাঁর রস-সাহিত্য চর্চারও ভিত্তিমূল রচনা করেছে। ব্যক্তের আড়ালে অব্যক্ত, প্রকাশের আড়ালে রহস্যময় অপ্রকাশ ও জড়ের আড়ালে অনন্ত চৈতন্য প্রবাহ আবিষ্কারের সাধনাই বৈজ্ঞানিক জগদীশ-চন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সাধনা। 'অগোচরের অপরূপ প্রকাশ' আবিষ্কারে কবিরও চরম উপলব্ধি :

শুনতে শুনতে সরে গেল সংসারের ব্যবহারিক আচ্ছাদনটা,
যেন কুঁড়ি থেকে পূর্ণ হয়ে ফুটে বেরোল
অগোচরের অপরূপ প্রকাশ ;
তার লঘু গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল আকাশে ;
অপ্রাপণীয়ের সে দীর্ঘনিশ্বাস,
দুরূহ দুরাশার সে অনুচ্চারিত ভাষা।(৩)

বিজ্ঞান ও রস-সাহিত্যের যে দেনা-পাওনার কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, জগদীশচন্দ্রের মনোজীবনে তার সহজ ও সাবলীল রূপটি ফুটে উঠেছিল। বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক জগদীশচন্দ্র এখানে এক ও অভিন্ন।

জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব একটি স্মরণীয় ঘটনা। বিজ্ঞানী ও কবি কেউ তখনো বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ করেননি। কিন্তু তাঁরা ছিলেন পরস্পর গুণগ্রাহী, দুজনের অনন্যসাধারণ সম্ভাবনাই দুজন অত্যন্ত সহজে বুঝেছিলেন। জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপ বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। প্রীতি-মাধুর্যে, শ্রদ্ধায় ও ব্যক্তিহৃদয়ের অকুণ্ঠ আত্মপ্রকাশে চিঠিগুলি লাবণ্যমণ্ডিত। চিঠিগুলি পড়লে মনে হয়, কবির ও বৈজ্ঞানিকের জগতের মধ্যে কোথায় যেন একটি নিগূঢ় মিল আছে। জগদীশচন্দ্রের জীবনীকার প্যাট্রিক গেডিস তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন :

On the occasion of Bose's return (April, 1897) from his successful visit to Europe in 1896, Tagore called to congratulate him and, not finding him at home, left on his work-table

a great blossom of magnolia, as a fitting and characteristic message of regard. Since that time the two have been increasingly together, each other, each complementing and thereby widening and deepening the other's characteristic outlook on nature and life.....(৪)

জগদীশচন্দ্রের রসবোধ ও আদর্শবাদ কত গভীর ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন পত্রালোচনার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার পর থেকেই তিনি নানাভাবে তাঁর কবিবন্ধুটিকে উৎসাহিত করেছেন। 'কথা' কাব্যের পরিকল্পনা তখন কবিচিত্তে আশ্রয় লাভ করেছে। নবসৃষ্টির সম্ভাবনায় তিনি তখন উৎকণ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে লিখছেন: "কতকগুলি পৌরাণিক গল্প আমার মস্তিষ্কের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে—যেমন করিয়া হৌক তাহাদের একটা গতি করিতে হইবে—তাহারা আমার কন্যাদায়ের মত···"(৫) এই চিঠির দু'দিন আগে (২০শে মে) জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য: "আপনার পৌরাণিক কবিতাগুলি সর্বাংশে সুন্দর হইয়াছে। এগুলি কবে সম্পূর্ণ করিবেন?···মহাভারত হইতে আরও অনেকগুলি লিখিবেন।"(৬) রবীন্দ্রনাথের 'কথা' ও 'কাহিনী'র অনেকগুলি কবিতার মূলে আছে জগদীশচন্দ্রের প্রেরণা ও উৎসাহবাণী। জগদীশচন্দ্রের রসদৃষ্টি ও সাহিত্যবিচারের মধ্যে তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ২০শে মে-র চিঠির এক জায়গায় তিনি কর্ণচরিত্র সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য:

"একবার কর্ণ সম্বন্ধে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। ভীষ্মের দেবচরিত্রে আমরা অভিভূত হই, কিন্তু কর্ণের দোষগুণ মিশ্রিত অপরিপূর্ণ জীবনের সহিত আমাদের অনেকটা সহানুভূতি হয়। ঘটনাচক্রে যাহার জীবন পূর্ণ হইতে পারে নাই, যাহার জীবনে ক্ষুদ্রতা ও মহৎ ভাবের সংগ্রাম সর্বদা প্রজ্বলিত ছিল, যে এক এক সময়ে মানুষ হইয়াও দেবতা হইতে পারিত, এবং যাহার পরাজয় জয় অপেক্ষাও মহত্তর, তাহার দিকে মন সহজেই আকৃষ্ট হয়।"(৭)

এর কিছুকাল পরে 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' রচিত হয় (১৫ই ফাল্গুন, ১৩০৬)। জগদীশচন্দ্রের উৎসাহ ও প্রেরণাই যে কবিকে এই বিখ্যাত কাব্যনাট্য-

রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।(৮) কবি তাঁর 'কথা' কাব্যখানি জগদীশচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন। জগদীশচন্দ্রের কর্ণ সম্পর্কিত পত্রাংশটির আর একটি মূল্য আছে। তিনি এই মিতাক্ষর মন্তব্যটির মধ্যে কর্ণচরিত্রের 'অন্তর্নিহিত ট্রাজিক স্বরূপকেই উদ্‌ঘাটিত করেছেন। সামান্য পত্রাংশটুকুতে তাঁর রসবোধের সূক্ষ্মতা ও বিশ্লেষণী অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপের মধ্যে সমকালীন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে এই বিশ্রুতকীর্তি বৈজ্ঞানিকের যে কতখানি অনুরাগ ছিল তা জানা যায়। বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কেও তাঁর দৃষ্টি অত্যন্ত সজাগ ছিল। এই সময় তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে সমকালীন সাহিত্য সম্পর্কে প্রতিটি খবর রাখতেন। ইওরোপের বিজ্ঞানমন্দিরে যখন তিনি সম্বর্ধিত হন, তখনো তিনি মাতৃভাষাকে বিস্মৃত হননি। বিশ্বসাহিত্যে বাংলা-ভাষার মর্যাদার জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত থাকতেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি লিখেছেন: "তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে আমি তাহা হইতে দিব না। তুমি তোমার কবিতাগুলি কেন এরূপ ভাষায় লিখ যাহাতে অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব? কিন্তু তোমার গল্পগুলি এদেশে প্রকাশ করিব।"(৯) জগদীশচন্দ্রের চিঠি থেকে জানা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করিয়ে বিদেশে প্রচার করার জন্য তাঁর কি অপরিসীম আগ্রহ ছিল! রবীন্দ্রনাথও জগদীশচন্দ্রের সাহিত্য রসবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন: "আমার গল্পের দ্বিতীয় খণ্ড আর দিন দশেকের মধ্যেই বাহির হইয়া যাইবে। দুই খণ্ড তোমার হস্তগত হইলে নির্বাচন করিবার সুবিধা হইবে।"(১০)

রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ পর্বটি তাঁর শিল্পী-জীবনের একটি স্মরণীয় লগ্ন। জগদীশচন্দ্র সেখানে প্রতিদিন উপস্থিত হতেন। কবির সঙ্গে তাঁর এই শর্ত থাকত যে, প্রতিদিন তাঁকে এক একটি গল্প লিখে শোনাতে হবে। গল্পগুচ্ছের অনেকগুলি গল্প জগদীশচন্দ্রের অনুরোধে লিখিত। জগদীশচন্দ্রের জীবনীকার প্যাট্রিক গেডিস লিখেছেন:

Once on receiving an invitation from the poet to stay with him at his house at Silaida on the river Padma, Bose

accepted it with the demand of the fullest and highest hospitality his friend could render him—that of a new story to be written everyday, and read to him every evening..... (১১)

বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের মধ্যে যে কত বড় একটি সংবেদনশীল বিমুগ্ধ কবিমন ছিল তা তাঁর দু একটি পত্রাংশ উদ্ধার করলেই পরিস্ফুট হবে। ১লা মে ১৯০২ তারিখের চিঠিতে তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন: "সেদিন তোমার কতগুলি কবিতা পড়িতেছিলাম, সেই শিলাইদহের প্রান্তর ও নদী, সেই আকাশ ও বালুর চর আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে। বলিতে পার কি এই হৃদয়ের আকর্ষণের অর্থ কি? তোমার কি মনে হয় যে এই পৃথিবীর ছায়ার অন্তরালে আত্মা আত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া যায়?"(১২) রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকা কাব্য জগদীশচন্দ্র কিভাবে আস্বাদন করেছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর লেখা ১৯০২-এর ৩০শে মে তারিখের একটি চিঠি থেকে: "সন্ধ্যার পর তোমার ঘরে যেন বসিয়াছি। আমার ক্রোড়ে আমার ছোট বন্ধুটি বসিয়া আছে, অদূরে বন্ধুজায়া, আর তুমি তোমার লেখা পড়িয়া শুনাইতেছ। আমি তোমার লেখাগুলি পড়িতেছিলাম, তোমার স্বর যেন শুনিতে পাইতেছি। তুমি যে কালিদাসের সময়ের কথা লিখিয়াছ, মনে হয় যেন পূর্বজন্মের কথা শুনিতেছি। সে সব দিনের কথা স্মরণ করিয়া মন কেমন পুলকে বিহ্বল হয়। এরূপ মধুর স্মৃতি, এরূপ উজ্জ্বল সরল প্রেম, এরূপ সুখ, এরূপ কল্যাণ অন্য কোন জাতিতে কি কখনও ছিল? তোমার আর একটি কথা আমার নিকট বড়ই ভাল লাগিয়াছে—সে কথা কল্যাণী—তুমি ঠিকই বলিয়াছ এ কথার অর্থ অন্য ভাষায় প্রকাশ পায় না।"(১৩)

এই পত্রাংশ দুটির মধ্যে বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্রের যে মনোজীবনের ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাতে বন্ধুপ্রীতির নিবিড়তার সঙ্গে একটি আস্বাদনধর্মী মনের সহজ রসপিপাসা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে। ছিন্নপত্রের বিমুগ্ধচিত্ত রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে। জগদীশচন্দ্র জড়জীবনের মধ্যে চেতনাপ্রবাহ আবিষ্কার করেছিলেন। বিজ্ঞানের বস্তুসত্যকে তিনি এক দার্শনিক প্রজ্ঞার দ্বারা মণ্ডিত করেছিলেন। বিজ্ঞানসাধক হয়েও তিনি কোনোদিন হৃদয়ধর্ম

ও কল্পনার ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত হননি। কালিদাসের যুগ তাই তাঁর বাসনালোক স্পন্দিত করে তুলেছে। বিশুদ্ধ জ্ঞানসাধনার কঠিন দীপ্তি তাঁর চিত্ততলকে মরুভূমি করে তোলেনি, কারণ সেখানে ছিল রসের সহজ সঞ্চয়। বিজ্ঞানী ও ব্যক্তি জগদীশচন্দ্রের প্রতিভার ভিত্তিমূলে এই সত্যটিও প্রণিধানযোগ্য।

জগদীশচন্দ্রের সাহিত্যরসবোধ ও মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ যে কত গভীর ছিল, সে সম্পর্কে আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ১৯০৭-এর জুন মাস। তখন গয়ার জেলা-জজ ছিলেন সাহিত্য-রসিক সুপণ্ডিত লোকেন্দ্রনাথ পালিত। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও তখন সেখানে বদলি হয়েছিলেন। তর্ক-বিতর্ক আলাপ-আলোচনায় তখন গয়ায় একটি সুন্দর সাহিত্যিক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। এই সময় জগদীশচন্দ্রও গয়ায় এসেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের পরিচয় ছিল, কিন্তু এখানে এসে সে পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হল। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীত ও কবিশক্তি সম্পর্কে তিনি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন। দ্বিজেন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে জগদীশচন্দ্রের সেদিনকার বিচার যথার্থ রসজ্ঞের বিচার। তিনি একখানি চিঠিতে দ্বিজেন্দ্রজীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লিখেছিলেন :

"নিপুণ শিল্পীর হস্তে, আমাদের মাতৃভাষার কি যে অসীম ক্ষমতা সেদিন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সে ভাষায় করুণধ্বনি মানবের অক্ষমতা, প্রেমের অতৃপ্ত বাসনা ও নৈরাশ্যের শোক গাহিয়াছিলেন, সেই ভাষারই অন্য রাগিণীতে অদৃষ্টের প্রতিকূল আচরণে উপেক্ষা, মানবের শৌর্য ও মরণের আলিঙ্গন-ভিক্ষা ভৈরব নিনাদে ধ্বনিত হইল।"(১৪)

দ্বিজেন্দ্রলালের সুবিখ্যাত 'আমার দেশ' সঙ্গীতটির প্রেরণামূলেও ছিল স্বদেশভক্ত সাহিত্যরসিক জগদীশচন্দ্রের নির্দেশ। জগদীশচন্দ্রই কবিকে বলেছিলেন : "আপনি রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস প্রভৃতির অনুপম চরিত-গাথা বঙ্গবাসীকে শুনাইতেছেন বটে : কিন্তু তাঁহারা বাঙালীর সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি বা একেবারেই আপন ঘরের জন নহেন। এখন এমন আদর্শ বাঙালীকে দেখাইতে হইবে—যাহাতে এই মুমূর্ষু জাতটা আত্মশক্তিতে আস্থাবান হইয়া আত্মোন্নতির জন্য আগ্রহান্বিত হয়। আমাদের এই বাংলাদেশের আবহাওয়ায় জন্মিয়া, আমাদের ভিতর দিয়াই বাড়িয়া-উঠিয়া সমগ্র জগতের শীর্ষস্থান

অধিকার করিতে পারিয়াছেন,—যদি সম্ভব হয়, যদি পারেন তো সেই আদর্শ এই বাঙালী জাতিকে দেখাইয়া, আবার তাহাদিগকে জিয়াইয়া, মাতাইয়া তুলুন।"(১৫)

জগদীশচন্দ্রের এই নির্দেশ অনুসারেই দ্বিজেন্দ্রলালের সুবিখ্যাত 'বঙ্গ আমার জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ' সঙ্গীতটি রচিত হয়েছিল। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে এই ঘটনাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনা তাঁর বিচিত্র জিজ্ঞাসার দ্বারা ঐশ্বর্যময় হয়ে উঠেছে। সমসাময়িক রাজনীতি, শিক্ষাসমস্যা, সাহিত্য, চিত্রকলা, প্রভৃতি নানাবিষয় তাঁর মনকে আন্দোলিত করেছিল। কারণ তিনি যন্ত্র-নির্ভর 'কারিগরি বিদ্যা'র বিজ্ঞানী ছিলেন না, তিনি ছিলেন দার্শনিক ও সৌন্দর্যপিপাসু কবি। তাই বিজ্ঞানকে তিনি উচ্চতর দার্শনিক জিজ্ঞাসায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বিজ্ঞানকে তিনি দর্শন করে তুলেছিলেন।

॥ ৪ ॥

জগদীশচন্দ্রের বাংলা রচনার পরিধি নিতান্তই স্বল্পায়তন। বিভিন্ন সময় 'মুকুল', 'দাসী', 'প্রবাসী', 'সাহিত্য', 'ভারতবর্ষ', প্রভৃতি পত্রিকায় যে কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি একত্রিত করে জগদীশচন্দ্রের একমাত্র বাংলা গ্রন্থ 'অব্যক্ত' (প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩২৮) প্রকাশিত হয়। জগদীশচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত বাংলা রচনা 'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে' রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত অধুনালুপ্ত 'দাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (এপ্রিল, ১৮৯৫)। কিন্তু বাংলাসাহিত্যে তাঁর এই সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ সেদিনকার সাহিত্যিক সমাজে সোল্লাস অভ্যর্থনা লাভ করেছিল। প্রথম বাংলা রচনা হলেও এইটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সত্যকে তিনি উচ্চতর কাব্যসৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছেন। বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা ও দার্শনিক জিজ্ঞাসা এখানে সমার্থক হয়ে উঠেছে। পৌরাণিক কাহিনীকে তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ তথ্য-সর্বস্ব হয়ে ওঠেনি। কারণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সঙ্গে একটি সৃষ্টিরহস্যভেদী কবিদৃষ্টি এই রচনাটিকে মাধুর্যমণ্ডিত করেছে। ভাষার কাব্যশ্রী, তৈলমসৃণ সহজ প্রবাহ ও রূপময় রূপকচিত্রগুলি রচনাটিকে রসোত্তীর্ণ করেছে। কবি

জগদীশচন্দ্রের এমন সহজ ও অকুণ্ঠ আত্মপ্রকাশ তাঁর অন্য কোনো বাংলা রচনায় নেই। 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' একটি গন্ধে রচিত গীতিকবিতার মতো। 'মহাদেবের জটা হইতে'—এই বিশ্বাস ও বোধকে আশ্রয় করে জগদীশচন্দ্রের পৌরাণিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চেতনা কেন্দ্র-সংহত হয়েছে। পৌরাণিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসকে রূপময় করে তোলার জন্য যে কবিদৃষ্টির প্রয়োজন, জগদীশচন্দ্রের রচনায় তা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই শিল্পরূপের সঙ্গে এক সর্বঙ্কর উপলব্ধি রচনাটিকে ভাব-গভীর করে তুলেছে: "শিব রুদ্র ও সংহারক! এখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। মানসচক্ষে উৎস হইতে বারিকণার সাগরোদ্দেশে যাত্রা ও পুনরায় উৎস প্রত্যাবর্তন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এই মহাচক্র প্রবাহিত স্রোতে সৃষ্টি ও প্রলয় রূপ পরস্পরের পার্শ্বে স্থাপিত দেখিলাম।"

'যুক্তকর' প্রবন্ধটিকে একটি চিত্র-সমালোচনা বলা যায়। কিন্তু অতি-বিশ্লেষণে ও তথ্যপ্রাচুর্যে প্রবন্ধটি ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি। চিত্রগুলিকে অবলম্বন করে জগদীশচন্দ্রের রসানুভূতি এক নূতন ভাবলোক সৃষ্টি করেছে। রং ও রেখাবিন্যাসের কৌশলকে অতিক্রম করে তিনি আর একটি জগৎ আবিষ্কার করেছেন। শিল্পকে তিনি 'আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে' নূতন ভাবসত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শঙ্কিতা জননী বুদ্ধদেবের আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন। লেখক এই চিত্রটির মধ্যে এক সার্বজনীন আবেদন অনুভব করেছেন। দেশকালের ব্যবধান অতিক্রম করে এক চিরন্তন সত্য তাঁর ভাবদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। বুদ্ধের কাছে প্রার্থনাপরায়ণা জননীমূর্তি দেখে সুজাতার উদ্বেলিত মাতৃহৃদয়ের ছবি ভেসে উঠেছে—খণ্ডকালের সীমা মুহূর্তে অপসারিত হয়েছে:

"মূর্তির নীচেই একখানা পাথরের উপরে নিদ্রিত শিশু, নিকটেই জননী ঊর্ধ্বোত্থিত যুক্তকরে পুত্রের মঙ্গলের জন্য বুদ্ধদেবের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছে। ...অমনি মানস-চক্ষে আর এক দৃশ্য দেখিলাম। বোধিবৃক্ষতলে উপবাসক্লিষ্ট মুমূর্ষু গৌতম। দুইজন দেখিয়া সুজাতার মাতৃহৃদয় উথলিত। দেখিতে দেখিতে অতীত ও বর্তমানের মাঝখানে মমতা ও স্নেহরচিত একটি সেতু গঠিত হইল এবং সেকাল ও একালের ব্যবধান ঘুচিয়া গেল।"

আবেগ-স্পন্দিত মনের কাব্যময় রূপায়ণ গদ্যরচনাটিকে শিল্পিত করে

তুলেছে। জগদীশচন্দ্রের এই প্রবন্ধটি বলেন্দ্রনাথের 'চিত্র ও কাব্য' গ্রন্থটির কোনো কোনো রচনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু সামান্যই, কিন্তু বিষয়নিষ্ঠা কখনো বড়ো হয়ে ওঠেনি, বিষয়ের সূত্র-সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ কেন্দ্র করে লেখকের রসিক আত্মার মৃদু-মূর্ছনা সুক্ষ্মসার গন্ধধূপের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। জগদীশচন্দ্রের সৌন্দর্যানুভূতি এখানে উর্ধ্বতর ভাবস্বর্গে আরোহণ করেছে, সৌন্দর্যানুভূতি এক আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধিতে পরিণত হয়েছে।

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে জগদীশচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি তিনবছর এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে সভাপতি হিসেবে তিনি যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে সাহিত্য পরিষদ শুধু পুরাতনকেই পুনরাবিষ্কার করবে না, বর্তমানযুগের জীবন্ত চিন্তাধারার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে নূতন সাহিত্যসৃষ্টির সহায়তা করবে। সাহিত্য পরিষদের কর্মধারাকে যুগোপযোগী করে তোলার কথাও তিনি ভেবেছিলেন: "আমাদের সাহিত্য কেবলমাত্র পুরাতনগ্রন্থ প্রকাশ লইয়া থাকিবে না বর্তমান যুগের নব নব সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতিকে একত্র করিয়া একটি জীবন্ত সাহিত্য গঠিত করিয়া তুলিবে। ইহাই আমি সাহিত্য পরিষদের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য মনে করি।"

জগদীশচন্দ্রের জীবনাদর্শ ও জীবনজিজ্ঞাসার মূলমন্ত্র 'দীক্ষা' প্রবন্ধটিতে পরিস্ফুট হয়েছে। প্রাণদেবতার পূজারী জগদীশচন্দ্র চেতন ও অচেতনের মধ্যে একটি নিগূঢ় চৈতন্যশক্তিকে অনুভব করেছেন। এই বিশ্বব্যাপক চৈতন্যশক্তির লীলা অনুভব করার জন্য মানুষের মধ্যেও অনন্ত সম্ভবনার ইতিহাস আবিষ্কার করেছেন: "...তোমাদের অন্তরে দৈবদৃষ্টি আছে, তাহা উজ্জ্বল কর। হয়ত প্রকৃতির মধ্যে একটা দিশা, একটা উদ্দেশ্য দেখিতে পাইবে। দেখিতে পাইবে যে, এই বিশ্ব জীবন্ত, জড়পিণ্ড মাত্র নহে। তাহার আহার উল্কাপিণ্ড, তাহার শিরায় শিরায় গলিত ধাতুর স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সামান্য ধূলিকণাও বিনষ্ট হয় না, ক্ষুদ্রশক্তিও বিনাশ পায় না; জীবনও হয়ত তবে অবিনশ্বর। মানসিক শক্তিতেই জীবনের চরমোচ্ছ্বাস।" জগদীশচন্দ্র তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যে এই প্রাণতত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেছেন। উদ্ধৃত মন্তব্যটিতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা ও প্রসারতাই উপলব্ধি করা যায়। 'আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ', 'গাছের কথা', 'উদ্ভিদের জন্ম ও

মৃত্যু', 'নির্বাক জীবন,' 'আহত উদ্ভিদ' প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মূলসূত্রটি এই স্বল্পায়তন প্রবন্ধটিতে লক্ষ্য করা যায়। সংক্ষিপ্ত হলেও প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য।

•

বাংলাসাহিত্যে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। সংখ্যায় কম হলেও বিষয়গৌরবে ও রচনাসৌষ্ঠবে তাঁর এই শ্রেণীর রচনাগুলি উচ্চতর সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত। বিজ্ঞানকে রসসাহিত্যে পরিণত করতে হলে শক্তির প্রয়োজন। কারণ 'জ্ঞানের কথা' ও 'ভাবের কথার' মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"যাহা জ্ঞানের কথা, তাহা প্রচার হইয়া গেলেই তাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়া শেষ হইয়া যায়। মানুষের জ্ঞান সম্বন্ধে নূতন আবিষ্কারের দ্বারা পুরাতন আবিষ্কার আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে।···কিন্তু হৃদয়ভাবের কথা, প্রচারের দ্বারা পুরাতন হয় না ; আগুন গরম, সূর্য গোল, জল তরল, ইহা একবার জানিলেই চুকিয়া যায়, দ্বিতীয়বার কেহ যদি আমাদের নূতন শিক্ষার মতো জানাইতে আসে, তবে ধৈর্য রক্ষা করা কঠিন হয়। কিন্তু ভাবের কথা বার বার অনুভব করিয়া ভ্রান্তিবোধ হয় না। সূর্য যে পূর্বদিকে ওঠে, এ-কথা আর আমাদের মন আকর্ষণ করে না—কিন্তু সূর্যোদয়ের যে সৌন্দর্য ও আনন্দ, তাহা জীবসৃষ্টির পর হইতে আজ পর্যন্ত আমাদের কাছে অম্লান আছে।"(১৬)

বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুকে সাহিত্যপদবাচ্য করতে হলে 'জ্ঞানের কথা'-কে 'ভাবের কথা'-য় পরিণত করতে হবে। উন্নত শিল্প-দৃষ্টি ছাড়া জ্ঞাননির্ভর প্রত্যক্ষকে চিরন্তন ভাবসত্যে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। জগদীশচন্দ্র ছিলেন সেই দুর্লভ শিল্পদৃষ্টির অধিকারী। 'জ্ঞানের কথা'-কে তিনি এক উচ্চতর ভাবসত্যে প্রতিষ্ঠিত করে তার সঙ্গে তিনি তাঁর ব্যক্তিহৃদয়ের রসস্পন্দন মিলিয়ে দিয়েছিলেন। তাই প্রত্যক্ষগম্য প্রমাণসিদ্ধ ও তথ্যাশ্রয়ী বস্তু সত্য ও লাবণ্য-মণ্ডিত রসমূর্তি নিয়েই উপস্থিত হয়েছে।

'আকাশস্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ' প্রবন্ধটি প্রধানতঃ পদার্থবিদ্যার ধ্বনিতত্ত্বের (sound) উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে যা জড়, তা সব সময়ই শক্তি ও তেজের দ্বারা স্পন্দিত হয়। এই বৈজ্ঞানিক সত্যটিকে জগদীশচন্দ্র এক বিশ্বব্যাপক উপলব্ধির (cosmic realisation)

পটভূমিকায় ফুটিয়ে তুলেছেন। জার্মান কবি রিকুটারের দেবদূতের উক্তিকে তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থন হিসেবে উদ্ধার করেছেন। কবিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে এখানে বৈজ্ঞানিকের উপলব্ধির কোনো বিরোধ ঘটেনি। জড়জগতে শক্তির লীলা বর্ণনা করে তিনি সেই লীলাকে জীবজগতের মধ্যেও অনুভব করেছেন। এখানে বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠেছেন কবি :

"বসন্তের স্পর্শে নিদ্রিত পৃথিবী জাগরিত করিয়া, প্রান্তর বন আচ্ছন্ন করিয়া উদ্ভিদ-শিশু অন্ধকার হইতে মস্তক তুলিল। দেখিতে দেখিতে হরিৎপ্রান্তর প্রস্থনিত। শরৎকাল আসিল, কোথায় সেই বসন্তের জীবনোচ্ছ্বাস? পুষ্প বৃন্তচ্যুত, জীর্ণপত্র ভূপতিত, তরুদেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত। জাগরণের পরেই নিদ্রা!

আবার বসন্ত ফিরিয়া আসিল; শুষ্ক পুষ্পদলে আচ্ছাদিত, বীজে নিহিত, নিদ্রিত বৃক্ষ-শিশু পুনরায় জাগিয়া উঠিল। বৃক্ষ মৃত্যুর আগমনে জীবনবিন্দু বীজে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। সেই বিন্দু হইতে বৃক্ষ পুনর্জীবন লাভ করিল। ...আজ যে পুষ্প-কলিকাটি অকাতরে বৃন্তচ্যুত করিতেছি, তাহার অণুতে কোটি বৎসর পূর্বের জীবনোচ্ছ্বাস নিহিত রহিয়াছে।"

জড় ও জীবের মধ্যে 'কোটি বৎসর পূর্বের জীবনোচ্ছ্বাসে'র স্বরূপটিকে জগদীশচন্দ্র সহজ-স্বচ্ছন্দ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটির মধ্যে জগদীশচন্দ্রের রহস্য-জিজ্ঞাসা এমন এক জায়গায় এসে উপস্থিত হয়েছে, যেখানে কবি ও দার্শনিকের প্রশ্ন-চঞ্চল উৎকণ্ঠার সঙ্গে তার কোনো বিরোধ নেই। জগদীশ-চন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনার চূড়ান্তসিদ্ধি তাঁর উদ্ভিদ-সম্পর্কিত গবেষণায়। তিনি পদার্থবিদ্যা থেকে জীববিদ্যার নিগূঢ় মর্মস্থলে প্রবেশ করেছিলেন। 'নির্বাক জীবন', 'আহত উদ্ভিদ', 'স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনাপ্রবাহ' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি প্রাণতত্ত্বের এক সর্বব্যাপী উপলব্ধি করেছেন। গাছ আহত হলে সঙ্কুচিত হয়, অবসাদের সময় এই সাড়া হয় ক্ষীণতর। জগদীশচন্দ্র এই শ্রেণীর প্রবন্ধগুলিতে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই বলেছেন। কিন্তু সেই বৈজ্ঞানিক সত্যটিকে তিনি অত্যন্ত সহজে ও স্বভাবসিদ্ধ সাবলীলভঙ্গীতে বলেছেন। উদ্ভিদের মৃত্যুবর্ণনাটি যেমন জীবন্ত, তেমনি হৃদয়গ্রাহী। শুধু বৈজ্ঞানিকের কৌতূহলই নয়, তার সঙ্গে এক মানবীয় সংবেদনশীলতাও যুক্ত হয়ে বর্ণনাটিকে চিত্রধর্মী করে তুলেছে :

"মৃত্যুর রুদ্র আহ্বান যখন আসিয়া পৌঁছে তখন গাছ তাহার শেষ উত্তর কেমন করিয়া দেয়? মানুষের মৃত্যুকালে যেমন একটা দারুণ আক্ষেপ সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া বহিয়া যায় তেমনি দেখিতে পাই, অন্তিম মুহূর্তে বৃক্ষদেহের মধ্য দিয়াও একটা বিপুল কুঞ্চনের আক্ষেপ প্রকাশ পায়। এই সময়ে একটি বিদ্যুৎপ্রবাহ মুহূর্তের জন্য মুমূর্ষু বৃক্ষ-গাত্রে তীব্রবেগে ধাবিত হয়। লিপিযন্ত্রে এই সময় হঠাৎ জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়—ঊর্ধ্বগামী রেখা নিম্নদিকে ছুটিয়া গিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে সাহিত্যে পরিণত করতে হলে তাকে রূপময় করে তোলার প্রয়োজন। রচনার কলাকৌশলই তত্ত্বকে হৃদয়ের সমীপবর্তী করে। এইজন্য চিত্র, রূপকল্পনা উপমাদি প্রসাধনের প্রয়োজন। জগদীশ-চন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলির মধ্যে কলাকৌশলের সাহায্যে বক্তব্যকে রূপময় করে তোলা হয়েছে। 'আহত উদ্ভিদ' প্রবন্ধের প্রারম্ভেই জগদীশ-চন্দ্র তাঁর বক্তব্য বিষয়কে রচনাকৌশলে ও হৃদয়ানুভূতিতে রূপময় করে তুলেছেন:

"শুভ্র তুষার-প্রান্তর যাহাদের জীবনধারায় রক্তিম হইয়াছে তাহাদের অন্তিম বেদনা আমাদের হৃদয়কে আঘাত করিতেছে। কি এই আকর্ষণ যাহা সকল ব্যবধান ঘুচাইয়া দেয়, যাহা নিকটকেও নিকটতর করে, যাহাতে পর ও আপন ভুলিয়া যাই? সমবেদনাই সেই আকর্ষণ, কেবল সহানুভূতি-শক্তিতেই আমাদের জীবনে প্রকৃত সত্য প্রতিভাত হয়। চির-সহিষ্ণু এই উদ্ভিদরাজ্য নিশ্চলভাবে আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান।··· বিবিধ শক্তিদ্বারা ইহারা আহত হইতেছে, কিন্তু আহতদের কোন ক্রন্দন-ধ্বনি উত্থিত হইতেছে না। এই অতি সংযত, মৌন ও অক্রন্দিত জীবনেরও যে এক মর্মভেদী ইতিহাস আছে তাহা বর্ণনা করিব।"

জগদীশচন্দ্র এই প্রাণশক্তিকে জড়, উদ্ভিদ ও মানবলোকে অনুভব করেছিলেন। এই প্রাণতত্ত্বই তো আনন্দরূপ, সেইখানেই বন্ধনমুক্তি। প্রাচীন ভারতের ঋষিরাও এই প্রাণতত্ত্বেরই অপূর্ব লীলা প্রত্যক্ষ করে বলেছিলেন: "প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, প্রাণেন জাতানি জীবন্তি, প্রাণং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।" (তৈত্তরীয় ৩।৩) উপনিষদের ঋষিরা প্রাণকেই ব্রহ্ম বলেছেন—সমস্ত

বস্তু প্রাণ থেকেই উদ্ভূত হয়, প্রাণেই স্থিতিলাভ করে এবং প্রাণেই লয় হয়। জগদীশচন্দ্র প্রাণের বিশ্ব ব্যাপক বিস্তৃতিকে প্রয়োগ-বিজ্ঞানের সাহায্যেই উপলব্ধি করেছিলেন বটে, কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় ঋষির জিজ্ঞাসার সঙ্গে কোনো বিরোধ ঘটেনি। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র ও কবি রবীন্দ্রনাথ এখানে একই পথের পথিক। রবীন্দ্রনাথের বৃক্ষবন্দনা কবিতার মধ্যে যে বিজ্ঞান সত্যটি আছে, সেই সত্যটিই জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে কাব্য হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রজীবনীকার 'বৃক্ষবন্দনা' কবিতাটি সম্পর্কে বলেছেন: "সমস্ত বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে তরুর স্থান কোথায়—তাহা যেন এই কবিতায় মূর্ত। বিজ্ঞানের তথ্যকে কী আশ্চর্যভাবে তত্ত্বে রূপায়িত করিয়াছেন।"(২৭) এই উক্তিটিকে একটু পরিবর্তিত করে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সম্পর্কে বলা যায়: বৈজ্ঞানিক তথ্যকে কী আশ্চর্যভাবে তিনি রসে পরিণত করেছেন!

বাংলা সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দুর্বল। বর্তমানকালে পত্র-পত্রিকায় কিছু কিছু 'পপুলার সায়েন্স' জাতীয় রচনা লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার (বিশ্বভারতী) কল্যাণে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানকে নানাভাবে প্রকাশ করার প্রশংসনীয় উদ্যোগ চলেছে। কিন্তু জগদীশচন্দ্র যখন বাংলাভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী রচনা করেন, তখনও বাংলা সাহিত্যে এই জাতীয় প্রবন্ধ রচনার শৈশবকাল। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত বিবিধার্থ সংগ্রহে, মিশনারী সাহেবদের কিছু কিছু অনুবাদে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ আলোচিত হত, তার মধ্যে জ্ঞাতব্য তথ্য থাকলেও, সাহিত্যধর্ম বিশেষ কিছুই ছিল না। প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যে যথার্থ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের প্রবর্তন করেছেন অক্ষয়কুমার দত্ত। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও 'বিজ্ঞান রহস্য' লিখেছিলেন।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকের হাতের বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধের একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে। অক্ষয়কুমার বা বঙ্কিমচন্দ্র বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। বিজ্ঞান সম্পর্কিত ইংরেজি রচনাবলীই আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ভিত্তি রচনা করেছে। তবু বাংলাভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার প্রাথমিক প্রচেষ্টা

হিসেবে সে যুগের মুষ্টিমেয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলির মূল্য কম নয়। বৈজ্ঞানিকের হাতের প্রবন্ধ সর্বপ্রথম উচ্চতর রসসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে জগদীশচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায়। রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন জাত লেখক—তাঁর রচনার পরিধি যেমন বিপুল তেমনি বহু বিচিত্র। জগদীশ-চন্দ্রের অধিকাংশ রচনাই ইংরেজিতে, বাংলা রচনার সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু এই স্বল্পসংখ্যক রচনার মধ্যেই জগদীশচন্দ্রের নিপুণ শিল্পসৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। 'অব্যক্ত' পড়ার পর রবীন্দ্রনাথ যে আক্ষেপ করেছিলেন, সে আক্ষেপ আমাদেরও: "...যদিও বিজ্ঞানবাণীকেই তুমি তোমার সুয়োরাণী করিয়াছ তবু সাহিত্যসরস্বতী সে পদের দাবী করিতে পারিত—কেবল তোমার অনবধানেই সে অনাদৃত হইয়া আছে।"(১৮)

পরিভাষার কণ্টকমুক্ত করে বিজ্ঞানকে কত সহজভাবে প্রকাশ করা যায়, জগদীশচন্দ্রের প্রবন্ধের মধ্যে তারও পরিচয় পাওয়া যায়। 'গাছের কথা,' 'উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু,' 'যন্ত্রের সাধন,' প্রবন্ধ তিনটি শিশুদের জন্য লেখা। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রথম দুটি প্রবন্ধে তাঁর বহুপরিক্ষিত বৈজ্ঞানিক সত্যকেই শিশুর মনের উপযোগী করে পরিবেশন করেছেন। তৃতীয় প্রবন্ধটিতে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের মৃত্যুভয়হীন সত্যসন্ধানের কাহিনী সরস ও চিত্তাকর্ষক করে বলেছেন। প্রবন্ধগুলি সহজ গল্পচ্ছলে লেখা—দুরূহকে সহজ করেছেন, তত্ত্বকে গল্পে পরিণত করেছেন। বর্তমানকালের সংবাদপত্রে শিশুদের পৃষ্ঠায় ও ছোটদের মাসিক পত্রিকায় শিশুপাঠ্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে জগদীশচন্দ্র পথিকৃৎদেরই একজন।

"এইচ বসু, পারফিউমার হাউস, কলিকাতা" প্রতি বৎসর গল্প-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতেন। যাঁর লেখা শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হত তিনি নগদ টাকা পুরস্কার পেতেন। পুরস্কারদাতার একটি পণ্যের নাম গল্পের মধ্যে দিতে হত। প্রথম বছর (১৩০৩) জগদীশচন্দ্র এই পুরস্কার পান। "কুন্তলীন পুরস্কার" প্রাপ্ত এই গল্পটির নাম ছিল 'নিরুদ্দেশের কাহিনী।' 'অব্যক্ত' গ্রন্থে এই গল্পটি কিছু পরিবর্তিত হয়ে 'পলাতক তুফান' নামে মুদ্রিত হয়। গল্পটি যে বৈজ্ঞানিকের রচনা তার প্রমাণ আছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় হল গল্পটির অন্তর্নিহিত কৌতুক রস। গল্পটি দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে হাওয়া অফিস ও বৈজ্ঞানিকদের ঝড়সম্পর্কিত

জল্পনা-কল্পনা ও গবেষণার কৌতুককর দিক বর্ণিত হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে কৌতূহলকে তীব্র ও চূড়ান্ত করে তুলে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এক বিচিত্র অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স সৃষ্টি করেছেন। যে প্রবল সামুদ্রিক ঝড়ের জন্য আব-হাওয়া অফিস ও বৈজ্ঞানিক মহল নানা গবেষণায় বিচলিত, জাহাজের কাপ্তান বিমর্ষ ও জাহাজ আরোহীরা ভীত ত্রস্ত, এক শিশি 'কুন্তল-কেশরী'-ই তার সমাধান করেছে। লেখকের উদ্ভট উদ্ভাবনীশক্তি ও অসঙ্গতির রন্ধ্রপথ আবিষ্কারের সুকৌশল প্রশংসনীয়।

জগদীশচন্দ্রের রচনার মধ্যে মাঝে মাঝে হাস্তরসের স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি আত্মপ্রকাশ করেছে। হাসির আলোয় বিষয়ের জটিলতা ও গভীরতা অনেক-খানি সহজ হয়ে উঠেছে। দু'একটি উদাহরণ দিলে বক্তব্য পরিস্ফুট হবে :

(ক) "কথা ব্যবহার সম্বন্ধে সাবধান হওয়া আবশ্যক। কারণ বিলাতের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত বলেন যে, খোলা ছাড়াইয়া জীবিত ঝিনুক অথবা অয়ষ্টারকে যখন গলধঃকরণ করা হয় তখন ঝিনুক কোন কষ্টই অনুভব করে না, বরঞ্চ পাক-গহ্বরের উষ্ণতা অনুভব করিয়া উল্লসিত হয়। ব্যাঙের উদরস্থ হইয়া কেহ ফিরিয়া আসে নাই, সুতরাং পাকস্থলীর অন্তর্গত হইবার সুখ চিরকাল অনির্বচনীয়ই থাকিবে।"—(আহত উদ্ভিদ)

(খ) সে যাহা হউক, বুঝিতে পারিলাম—হিরণ্যকশিপুকে দিয়া বরং হরিনাম উচ্চারণ করান যাইতে পারে, কিন্তু ইংরেজকে বাঙ্গালা কিম্বা সংস্কৃত বলান একেবারেই অসম্ভব। এইজন্যই আমাদের হরিকে হ্যারী হইতে হয়। এই সকল দেখিয়া কলের 'বুদ্ধিমান' নামকরণের ইচ্ছা একেবারে চলিয়া গিয়াছে। বুদ্ধিমান তাহা হইলে বার্‌ডোয়ান হইত।"—(আহত উদ্ভিদ)

জগদীশচন্দ্রের বাংলা রচনার একটি নিজস্ব স্টাইল আছে। হাস্তরস তাঁর স্বক্ষেত্র না হলেও মাঝে মাঝে স্নিগ্ধহাস্তের রজত-রেখা বক্তব্যবিষয়টিকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে। হাস্তরসের মূলতত্ত্বটিকে তিনি 'স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা প্রবাহ' প্রবন্ধে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন : "বাহিরের আঘাতের মাত্রা মৃদু হইলে সচরাচর তাহা সুখকর বলিয়া মনে করি, কিন্তু আঘাতের মাত্রা বাড়াইলে অন্যরূপ অনুভূতি হইয়া থাকে। মৃদুস্পর্শ সুখকর, কিন্তু ইষ্টকা-ঘাত কোনরূপেই সুখজনক নহে।" জগদীশচন্দ্রের এই উক্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'কৌতুকহাস্য' (পঞ্চভূত) প্রবন্ধের একটি মিল আছে। (১৯)

আসলে তাঁর মন ছিল গভীরস্থায়ী, দার্শনিক ভাবাপন্ন। তাই যা কিছু লিখেছেন তার মধ্যেই তাঁর ভাবুক চিত্তের প্রতিফলন আছে। সামান্য একটি বিষয় তার গভীরাশ্রয়ী মনের স্পর্শে অপরূপ হয়ে উঠত। এই সমস্ত অংশে জগদীশচন্দ্রের গদ্য স্টাইল সর্বোত্তম সিদ্ধিলাভ করেছে। যেমন—

"অনেক সময়ে এক অপূর্ণতা আসিয়া পৃথিবীর সৌন্দর্য ও সজীবতা অপহরণ করে। আলো ও অন্ধকারের সমাবেশ ভিন্ন সুচিত্র হয় না। কেবল আলো কিম্বা অন্ধকারে চিত্র অপরিস্ফুট থাকে।···আলো ও ছায়া সুখ ও অপরিহার্য দুঃখ তখন স্ব স্ব নির্দিষ্ট স্থানে সমাবিষ্ট হয়। তখন সেই দুইখানি উত্তোলিত যুক্তহস্ত হইতে কিরণ-রেখা অন্ধকার ভেদ করিয়া সমস্ত দৃশ্য জ্যোতির্ময় করে।"

ভাষার মধ্যে কোথাও আতিশয্য নেই ; মাধুর্য্যে ও প্রসন্নতায় এই স্টাইল কোথাও কোথাও গীতিকাব্যোচিত মহিমা লাভ করেছে। 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' তাঁর গদ্যরীতির সর্বোত্তম প্রমাণ। চিত্র ও সঙ্গীতের নিগূঢ় সমন্বয়ের সঙ্গে এক মহিমান্বিত দিব্যদৃষ্টি এখানে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের এমন সুষমামণ্ডিত ঐক্য বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় না। বৈজ্ঞানিককে দার্শনিক ভূমিতে উন্নীত করে জগদীশচন্দ্র কবিদৃষ্টিরও অধিকারী হয়েছেন তাঁর স্বল্পায়তন বাংলা রচনার মধ্যে তাই শিল্পীর হাতের ছাপ সুস্পষ্ট।

গ্রন্থ-পঞ্জী

১। জগদীশচন্দ্র : প্রবাসী পৌষ, ১৩৪৪

২। বিজ্ঞানে সাহিত্য : বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর ময়মনসিংহ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ (১৯১১)

৩। পত্রপুট, ৫ নং

4. The life and Jagadish Chandra Bose (1920) p. 222.

৫। চিঠিপত্র, ষষ্ঠ খণ্ড, ১৮৯১-এর ২৬শে মে লিখিত চিঠি

৬। চিঠিপত্র, ষষ্ঠ খণ্ড, গ্রন্থ পরিচয়, পৃঃ ১৫৭

৭। পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ

৮। "কাহিনী খণ্ড ছাপাইয়া দিবার পর কবি 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' লিখিতে আরম্ভ করেন বলিয়া মনে হয়। উহার রচনা সমাপ্ত হইল ১৫ই ফাল্গুন। সহজেই অনুমান করা যায় যে মুদ্রণকার্য প্রায় শেষ হইয়া আসিলে রচনায় হাত দেন।"—রবীন্দ্রজীবনী (প্রথম খণ্ড) : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৬২

৯। পত্র। লণ্ডন ২ নভেম্বর ১৯০০। প্রবাসী ১৩৩৩ পৃঃ ৪১৩

১০। ১২ ডিসেম্বর ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে লিখিত চিঠি। চিঠিপত্র ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৮

১১। The life and work of Sir Jagadish Chandra Bose, p. 222

চিঠি পত্র ষষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ২১০

পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ২১২

দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৪৭৪

পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৭৬

সাহিত্যের সামগ্রী : সাহিত্য

রবীন্দ্রজীবনী (৩য় খণ্ড) : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২০৭

চিঠিপত্র ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৭০

"আমাদের জন্য আমরা ইচ্ছাপূর্বক যে পরিমাণে কষ্ট ও অশান্তি জাগ্রত করিয়া তুলি, তাহাতে আমাদের চেতনাশক্তিকে উত্তেজিত করিয়া দেয়। কৌতুকও সেই জাতীয় সুখাবহ দুঃখ।···এই সীমা ঈষৎ অতিক্রম করিলেই কৌতুক প্রকৃত পীড়ায় পরিণত হইয়া উঠে।"—কৌতুকহাস্য : পঞ্চভূত

গ্যেটে ও শিলেরের সহমর্মিতা

শ্যামাদাস সেনগুপ্ত

জার্মাণ সাহিত্যের ইতিহাসে বোধ করি সবচেয়ে শুভদিন যবে গ্যেটে এবং শিলেরের সঙ্গে পরস্পরের পরিচয় হয়। এ সাক্ষাৎকার উভয়ের জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা—বিশেষত গ্যেটের জীবনে ত বটেই। গ্যেটের সাহিত্য জীবনের পরিবর্তন আনেন শিলের। শিলেরের বিশ্লেষণমূলক মননশীলতার ফলে গ্যেটে নিজেকে আবার নতুন করে পেলেন—নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করলেন।

শিলের বাস করতেন Jenaতে। উদ্ভিদবিজ্ঞান মহাসভার এক অধিবেশনের পর এই দুই কবির পরিচয় ঘটে। এই পরিচয় অবশেষে অটুট হৃদ্যতায় পরিণত হয়। গ্যেটে ব্যক্তিগত জীবনে প্রায় চৌদ্দ হাজার চিঠি লিখেছিলেন যা অধিকাংশ সাহিত্য-বিষয়ক—ব্যক্তিগত পর্যায়ে সেগুলো প্রায়ই পড়ে না। গ্যেটের সঙ্গে শিলেরের পরিচয় হওয়ার অব্যবহিত পরে শিলের একখানা পত্র লেখেন গ্যেটেকে। পত্র-সাহিত্যের সাধারণ আওতার বাইরে—কারণ সেই পত্রখানা একটা প্রবন্ধ বলে অনায়াসে অভিহিত করা যায়। সেই পত্রের মারফত শিলের গ্যেটের চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করেন। তার আন্তর ভাবনিষ্ঠ ধারণাকে আরও পরিস্ফুট করেন শিলের—গ্যেটে নিজের ব্যক্তিমানস মুকুরের মধ্যে দেখতে পেলেন। এই প্রসঙ্গে শিলের বলেছিলেন: গ্যেটেকে তিনি যে চিঠি লিখেছেন সেটা বোধহয় চিঠির স্তরে পৌঁছাবেনা কারণ সেটা চিঠি নয়—একটা প্রবন্ধের নামান্তর—আর সেই প্রবন্ধের মধ্যে গ্যেটে যদি নিজের ব্যক্তিমানসকে সম্যকরূপে প্রতিফলিত হতে দেখেন তাহলে সেই প্রতিফলনের রূপটি কবিগুরু গ্যেটে যেন নিজে থেকে মুছে না ফেলেন।

এই চিঠি পাওয়ার পর থেকে গ্যেটের সাহিত্য জীবন শতধায় প্রকাশিত হয়। শিলের গ্যেটেকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন কারণ তিনিও সেই সব চিন্তার স্তরে বিচরণ করতেন। গ্যেটেকে তিনি লিখেছিলেন: প্রকৃতির বাণী যিনি আহরণ করতে চান, সম্যকরূপে অনুধাবন করতে চান তার

মধ্যে একটা সদাজাগ্রত শক্তির দরকার। শক্তির দরকার এই কারণে যে বিরাট প্রকৃতির নিকট মানুষ নগণ্য—প্রকৃতির স্বরূপকে জানতে গেলে মানুষের ব্যক্তিত্ব দরকার—কারণ নিজের ব্যক্তিত্ব না থাকলে নিজের ওপর আস্থা না থাকলে মানুষ অতলে তলিয়ে যাবে। প্রকৃতির বিকাশ ও অভিব্যক্তির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন স্তর। এই স্তর বিরাট এক কাঠামোর ওপর স্থিতিশীল হয়ে রয়েছে। অখণ্ড প্রকৃতি জটীলতার সঙ্গে মানুষের ভেতর ও বাইরের রূপে অখণ্ডতার মধ্যে আবিষ্কার করবার প্রয়াস করেছেন কবি।

যথাযথভাবে এই সব সত্তাকে গ্রথিত করে পুনরায় নতুনভাবে সৃজন করে মানুষের গোপন রূপকে কবি ধরবার প্রয়াস করেছেন—কারণ সৃজনধর্মী মানুষের মধ্যে ও প্রকৃতির মধ্যে একটা রহস্য চলছে। কবির এ প্রয়াস সম্ভবপর হয়েছে কারণ বৃহৎ ব্যাপ্তির সৌন্দর্যময়তার মধ্যে কবির হৃদয় বিস্তৃত, সৌন্দর্যবোধ দ্বারা কবি উদ্দীপ্ত। সৌন্দর্যের বিভিন্ন স্তরে কবির হৃদয় গভীরে শিকড় চালিয়েছে। প্রকৃতিকে চেনবার জানবার যে আকাঙ্ক্ষা তা মহৎ আকাঙ্ক্ষা। কবির মধ্যে রূপধর্মিতা আছে—প্রকৃতির চিত্রকল্পকে বাঙ্ময় রূপ দেবার প্রচেষ্টা আছে। প্রকৃতির অখণ্ডরূপকে নির্ণয় করবার জন্যই এ উৎসাহ কবির। খণ্ড সত্তার মধ্যে প্রকৃতির যে পরম লীলা তা অনন্তময়ের রূপকে গ্রহণ করবার জন্য, সামগ্রিক রূপকে রূপান্তরিত করবার জন্য এ-অনুধাবন পর্ব কবি দ্রুততার সঙ্গে শেষ করেননি। অত্যন্ত ধীর গতিতে এক গভীর দৃষ্টিবোধ দ্বারা গ্যেটে নিজেকে সে জটীল রহস্যবোধ এবং জটীল রহস্যময়তার রূপকে উদ্ঘাটন করবার চেষ্টা করেছেন বস্তুর মারফত, ঘটনার মাধ্যমে। এই বস্তু বা ঘটনার মধ্যেই কবি থেমে যান নি। বস্তু ও ঘটনার বিম্ব প্রতিবিম্ব রূপকে ছাড়িয়ে তিনি আরও বহুদূর এগিয়েছেন। তিনি বস্তুত জ্ঞানের রাজ্যে চলে গিয়েছেন। জ্ঞানের সীমিতি কবির শেষ নয়—ঋষির দৃষ্টি দিয়ে তিনি বস্তু ও ঘটনার ভেতরে গিয়ে এক প্রজ্ঞার স্তরে পৌঁছে গিয়েছেন।

অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন কবির এই বিশ্লেষণমূলক পত্র পেয়ে আবার গ্যেটে নিজেকে চিনলেন। তা ছাড়া শিলেরের প্রবন্ধ পড়ে গ্যেটে লিখলেন যে তিনি সেই অমৃত পানীয় পান করেছেন—যা তার মত লোকের কাছে উপাদেয় শুধু নয়—কণ্ঠ ও রসনা পর্যন্ত সঞ্চারিত হয়ে ওঠে; তা ছাড়া এই চিঠি দেহের সমস্ত শিরায় সঙ্গীতের স্বনন জাগিয়ে তুলেছে।

তারপরে তিনি আরও লিখলেন যে তারা দু'জনে একসঙ্গে কাজ করবেন—এবং একসঙ্গে কাজ করলে তাদের মধ্যে যে অসংস্কৃত রূপটি আছে—সেটা পরিশীলিত হয়ে যাবে। অনেকে তাদের এই একই চিন্তা-ধারার মত ও পথ দেখে প্রীত হতে পারেন নি—তাই শিলেরের কবিমন পাছে আহত হয় সেইজন্যে শিলেরকে তিনি লিখলেন বিশ্বাস ও দৃঢ়তা নিয়ে একসঙ্গে তারা পরম সত্যকে অনুধাবন করবার জন্য এগিয়ে যাবেন। তারপর তিনি নিজের কবিতার যোগ্যতা যাচাই করবার জন্য কিছু কবিতা পাঠান। কখন কোন উপন্যাস লিখছেন, কোন বইয়ের প্রুফ দেখছেন এ সব ছোট খাট সংবাদ চিঠি মারফত শিলেরকে সরবরাহ করতেন। হাস্য-রসাত্মক ক্ষুদ্র কবিতা লিখে শিলেরের কাছে পাঠাতেন। উদ্দেশ্য এই যে তার মধ্যে থেকে কিছু গ্রহণ ও বর্জন করে তিনি যেন নতুন কিছু রূপ উদ্ঘাটন করেন। গ্যেটে পল্লী অঞ্চলে একটা জীবনের সঙ্গতি লক্ষ্য করে-ছিলেন। তখন হচ্ছে যুগসন্ধি—যন্ত্রশিল্পের প্রসার দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। সে জনজীবনের সঙ্গে কবিগুরু সখ্য অনুভব করছেন কাজের মধ্যে। দেশের জল হাওয়ায় সাধারণ লোকের জীবনের মধ্যে একটা ছন্দিত সুর তখন প্রবহমান।

কবিগুরু যে সব সময় কবিতার ক্ষেত্রে বিচরণ করতেন তা নয়, স্থাপত্য শিল্প বিষয়েও তার আগ্রহ ছিল প্রচুর ; এ বিষয়ে তিনি অনেক পড়াশুনোও করতেন। কখনও কি উপন্যাস লিখছেন তাও জানাতেন শিলেরকে।

অনেক সময় নাটক লেখবার আগে কবিগুরু নাটকের পাত্রপাত্রীর বর্ণনা দিয়ে শিলেরের কাছে পাঠিয়ে দিতেন আর বলতেন এর একটা যোগসূত্র শিলের যেন ধরিয়ে দেন। শিলের কর্তৃক Xenia অনুমোদিত হয়েছিল। শিলেরের কবিতার একখানি সঞ্চয়ন বার করবেন বলে লেখেন তিনি। গ্যেটে লিখতেন, সামান্য তুচ্ছ ও এলোমেলো জিনিষের মধ্যে থেকে তারা উত্তম জিনিষগুলো বেছে নেবেন। সাধারণ লোকের ভাব ও ধ্যানধারণা কবিতার মাধ্যমে বিবৃতি প্রকাশ করার কথা তিনিই বলেন কারণ তা হলে সাধারণ লোক কবিদের বুঝতে পারবে এবং তারা উপহাস করবে না লেখকের আন্তরিকতাকে। তিনি আরও জানান Horen পুস্তক সমালোচনা করা হলে একটা বেশ কৌতুক পাওয়া যাবে।

কবিগুরু মাঝে মাঝে বিঠোফেনের Don Giovanni র সুরবৈচিত্র শুনতেন। অপেরায় যাতায়াত করতেন। খাওয়াদাওয়া, নৃত্যগীত, মুখোস নৃত্য প্রভৃতির মধ্যে পাঠাভ্যাস চললো তাঁর! শিলের একবার কিছু wall paper চেয়েছিলেন —তার নমুনা পাঠিয়ে দেন। কোথায় নীল এবং গোলাপী রঙ মানাবে সে বিষয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। কবিগুরু যে হাস্তরসাত্মক ক্ষুদ্র সাহিত্য শিলেরকে পাঠিয়েছেন তার সব কিছু নকল রাখলেন—কারণ সেগুলো খুব হাস্যোদীপক। একস্থানে নিজে তিনি লিখেছেন Eighth Book এর মধ্যে শিলেরের কতখানি প্রভাব পড়েছে। কতগুলি দৃশ্য শিলেরের ভাবনা অনুযায়ী গ্রহণ করেছিলেন— কারণ দোষত্রুটিগুলো শিলের দেখিয়েছিলেন, তার ফলে ভুল-ত্রুটিগুলো শোধন করে নেন। শিলেরের এই সহযোগিতার প্রভাব তাঁর সাহিত্য জীবনে তিনি অনুভব করেছেন। এই মিলিত প্রভাব সম্ভব হয়েছে কারণ তিনি সৌন্দর্যচর্চার অনুশীলন করেছেন। সাহিত্য জগতে এ সহযোগিতা তিনি শিলেরের কাছ থেকেই পেয়েছেন।

অনেক সময় কোন কোন লেখার শীট কবিগুরু পাঠিয়ে দিতেন। শিলেরের মন্তব্য থাকত তার পাশে। আর কবিগুরু শিলেরের মন্তব্যের পাশে নিজের মতামত ব্যক্ত করতেন। তিনি এ কাজ করতেন কারণ ভেতরকার দোষগুলো তাতে শোধন হবে। মানুষের নিজের মধ্যে যে দোষত্রুটী তা শুধরোবার জন্য অন্তরতম বন্ধুকে তার দিয়েছিলেন; শিলেরের বুদ্ধিদীপ্ত মতামতও লেখনীর স্পর্শ দ্বারা যাতে কবিগুরুর অসংস্কৃত রূপ দূর হয়ে যায় তার জন্য প্রায় লিখতেন। মানুষের সত্তার মধ্যে জটীলতা আছে, এই জটীলতা এক দুর্ভেদ্য বাধা সৃষ্টি করে। মানুষ যা বলতে চায় লেখার সময় তা প্রকাশ হয় না কারণ নিজের আবর্তজালে মানুষ খেই হারিয়ে ফেলে। তা ছাড়া মধ্যে মধ্যে বাস্তবজীবনের অভিব্যক্তি মহাকবির কাছে এত ব্যাপক হয়েছে যার ফলে তিনি তাঁর কাজ, লেখা ও নিজস্ব স্বরূপ ভুলে যেতেন। লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যেতেন। কোন রকম বাগ্মীতার প্রকাশ দিয়ে নিজেকে জাহির করতে চাইতেন না। সাধারণ লোকের সঙ্গে সাধরণভাবে কথা বলার পক্ষপাতী ছিলেন এই কারণে যে তাদের দ্বারা তিনি নিজের যথার্থ স্বরূপ বুঝতে পারতেন।

কাব্যরচনার সময় ভেতরে ভেতর কবিগুরুর অন্তর্দ্বন্দ্ব চলত। কবিতা লিখতে হলে বাহ্য পৃথিবীর রূপকে স্বীকার করতে হবে। তবেই প্রকৃতির রহস্য

সাধারণ বস্তুর ভেতর হতে সঙ্গীতে রূপান্তরিত হবে। প্রকৃতির মধ্যে তিনি সুন্দরকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছেন।

প্রজাপতির ওপরে তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান। ফুলের ওপর তিনি এক অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। তারপর তিনি ইতিহাসের দিকে ঝুঁকে পড়েন। মাঝে মাঝে কবিগুরু বুঝতে পারতেন নিজেকে তিনি যেন অন্তরূপে প্রকাশ করছেন। প্রজাপতি আর ফুলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সম্ভবত পরে রঙের বর্ণবাহারের ওপর প্রবন্ধ লেখেন।

তারপর তিনি মহাকাব্য বিষয়ে আলোচনা করেছেন। মহাকাব্য বিষয়ে তিনি বলতেন যে মহাকাব্যের বিস্তৃতি সামনে এবং পেছনে ছড়িয়ে আছে। মহাকাব্যে জীবনবোধ অত্যন্ত ব্যাপক, সেই জন্য মহাকাব্য এক পূর্ণ জীবনবেদ। এ প্রসঙ্গে নাটকেরও অবতারণা করেছেন। মহাকাব্যে নাটকের মত এক প্রগাঢ় যোগসূত্র নেই। নাটকের চেয়ে মহাকাব্যে যুক্তি প্রয়োগ বেশী। নাটক সব সময় যুক্তিতর্ক দ্বারা পরিচালিত হয় না। চুল-চেরা যুক্তি দ্বারা নাটক রচিত হলে নাটকের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। নাটকের অগ্রগতি নাটকের কাহিনীকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। তা ছাড়া বিপরীত উদ্দেশ্য আছে —যে বিপরীত উদ্দেশ্য চূড়ান্ত পরিণতিকে আড়াল করে রাখে। এই বিপরীত উদ্দেশ্যের ফলে নাটকের মধ্যে একটা প্রবল উৎকণ্ঠা থাকে। নাটক আরম্ভ এবং শেষ হওয়ার আগে ও পরে যে ফলাফল দেখা যায় তার সঙ্গে বিস্তৃত হয় কল্পনা, দুর্ঘটনা ও নিয়তি। অবশ্য এই কল্পনা দুর্ঘটনা ও নিয়তির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বাস্তব পৃথিবী ও নৈতিক পৃথিবী। তা ছাড়া নাটকের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে সূচনা এবং দৃশ্যমান মঞ্চ।

আর কবিতায় আছে এমন একটি অবিভাজ্য একক, যা কোন লোক— সে মৃত হোক বা জীবিত হোক—বিচার করতে পারে না। তাছাড়া কবিতার মধ্যে মহাকাব্যের কোন বাইরের লক্ষণ থাকবে না, কবিতার মধ্যে কোন বিপরীত উদ্দেশ্যও থাকে না। কবিতা হচ্ছে এক পরম স্বরূপ, এক স্বকীয় সত্তা। কবিতা মানুষের বাইরের প্রকৃতি দেখে না, মানুষের অন্তরে যে লীলা চলছে তা-ই কবিতা প্রকাশ করে—কবিতা পৃথিবীর চিত্রধর্মিতার মধ্য দিয়ে প্রজ্ঞার দিকে চলে যায়। কবিতা শুধুমাত্র ছবি আঁকা নয়।

নিজে কাউন্ট-এ গদ্য কবিতা প্রচলন করেও তিনি তা কেটে দিয়েছিলেন,

কারণ তিনি মনে করতেন ছন্দ ও সুর না থাকলে কবিতার প্রাণ থাকে না। আর যাতে প্রাণ না থাকে তা কারও মনোরঞ্জন করতে পারে না। এমন কি নাটকও কবিতায় লিখতে হবে। উদ্যানে শুকনো জলাধার নির্মাণ অথবা নির্মল হ্রদিতে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া থাকা যেমন বিষময় তেমনি কবিতাও গদ্যে লেখা বিষময়। এ রকম কবিতা লেখা হলে কবিতার স্তর হতে বিচ্যুতি আসে। কবিকে নানা বিচ্ছিন্ন চিন্তা আঘাত করে—প্রেমিকের সৎ পথে থাকা যেমন বাঞ্ছনীয় কবির পক্ষে নির্ভেজাল কাব্যচর্চাও তেমন স্থির আদর্শ। বিচার, বিবেচনা এবং উত্তম ধ্যানধারণা হতে উদ্ভূত না হলে কবিতা লেখবার কল্পনাই কবিগুরু করতে পারতেন না। শিলের Wallenstein নাটক গদ্যে লিখেছিলেন —কবিগুরু ছন্দোময় করে তুলতে অনুরোধ জানান।

মহাকাব্য বিষয়ে আবার বলেছেন যে এ কবিতা যেন ছন্দপ্রবাহের মধ্যে শেষ না হয়। কতগুলি ছন্দপ্রবাহের কুয়াশার পংক্তি দিয়ে শিল্পী যেন নিজের ব্যর্থতার পরিচয় না দেন। মহাকাব্যে বাস্তববোধ অত্যন্ত দরকার। পত্র-সাহিত্যে উপন্যাস লিখলে সেটাকে তিনি নাটকের স্তরেই ফেলবেন। পত্রসাহিত্যে উপন্যাস লিখে মধ্যে মধ্যে পাত্র-পাত্রীর সংলাপ যদি জুড়ে দেওয়া যায় তা হলে সেটা আরও খারাপ। আর সব চেয়ে খারাপ উপন্যাসকে যদি নাটকে রূপান্তরিত করা যায়। উপন্যাস লোকে চায় কারণ উপন্যাসে নানা রকম জীবনের বিন্যাস গ্রথিত থাকে। নাটকের আখ্যানবস্তু এক। সুতরাং নাট্যকারকে জীবনের নানা অসংলগ্ন প্রবাহের ধারাকে বাদ দিতে হয়। নাটকের একক প্রাণ পরিস্ফুট করবার জন্য নাট্যকারকে অত্যন্ত বস্তুধর্মিতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। নাটকের আখ্যানবস্তুর বাইরে যে নানা প্রবণতা তা লেখককে পরিত্যাগ করতে হয়। সুতরাং উদ্দাম ও চটুল দৃশ্য কল্পনার অবতারণা থাকে না, এই উদ্দাম ও কল্পনার প্রসারতা উপন্যাসে দেখা যায়—যা সাধারণ লোক গ্রহণ করে। শিল্প এক একটি যাদুময়ী পরিমণ্ডল সৃষ্টি করবে—যার পাশে সাহিত্যের নানা শাখা নিজের দার্ঢ্যতাকে প্রকাশ করতে সুযোগ পায় আপন বৈশিষ্ট্য দিয়ে। পূর্বসূরীরা নিজেদের পরিমণ্ডলকে এরূপ সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। মানুষের মধ্যে যে শিল্পচেতনা তা নিজের পথে অগ্রসর হয়—রূপান্তরিত করে অন্যরূপে পরিবেশন করলে তা থেকে মহৎ কিছু হয় না। নাটকের মধ্যে একটা নিয়তি কাজ করে যাচ্ছে—এ নাটক শুধু মঞ্চে

নয়, পৃথিবীর মঞ্চেও বিধৃত হচ্ছে। পৃথিবীর ওপরে সে নিয়তির ক্রূর খেলা চলছে, তার জন্য ব্যক্তি ও ঘটনা অর্থপূর্ণভাবে জড়িয়ে আছে—এবং এর মধ্যে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগতের একটা ক্ষীণ চিহ্ন থাকে ; এই নিয়তি আগে থেকেই সব কিছু যেন গুছিয়ে রাখে। অসহায় মানুষ নিয়তির হাতে ক্রীড়নক হয়ে পড়ে—অন্ধের মত বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়ায় মাত্র। এইটাই হচ্ছে নিয়তির ক্রূর খেলা।

এই নিয়তি কোনক্রমে মানুষকে তার উদ্দেশ্য সাধন করতে দেবে না। লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে মানুষের পথ। নায়ক নিজের ক্ষমতার ওপর আস্থা রাখতে পারবে না—যুক্তি হারিয়ে ফেলবে ; এই যুক্তির বিচার পার্শ্ব চরিত্রের লোকেরা করে থাকে—এবং যুক্তির বিচার নায়কের পক্ষেও অসুবিধার কারণ হয়ে ওঠে। ট্রাজেডির মধ্যে যে বিষাদ-করুণা থাকে তা যেন সকলে অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভব করতে পারে।

কাব্যের ক্ষেত্রে যন্দা লক্ষ্য করে তিনি শিলেরকে লিখেছিলেন যে কবিতার দুর্দশার কারণ হচ্ছে কবিতার রূপ সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেদের নিদারুণ অজ্ঞতা। কবিতার মাধ্যমে কবি অসীমকে সীমিতির পর্যায়ে আনেন। তা ছাড়া বাইরের বাজারের চাহিদা দেখে কবিতা লেখা ও সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কবিত্বের নাম নিয়ে যারা কাব্যচর্চা করেন তাদের সাফল্য বিষয়ে তিনি সন্দিহান ছিলেন। কবিরা হবে আত্মনিষ্ঠ, নিজের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সমগ্র বস্তুকে অনুধাবন করলেই তবে কবির দৃষ্টি সহজ ও সুন্দর হবে—আত্মনির্ভরশীল কবি হওয়া ততক্ষণ সম্ভব নয় যতক্ষণ না কবি নিজেকে বিভিন্ন বস্তুর মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করতে পারছেন। তা ছাড়া স্বচ্ছ সহজ রূপ অনুভূতির গভীরতার মাধ্যমেই ধরা সম্ভব। এইখানেই কবির আনন্দ।

এর বিপরীত প্রবৃত্তি তার মধ্যে অনেক সময় কাজ করত। কারণ তার ব্যক্তিত্ব ছিল অদ্ভুত। মানুষ নিজেকে সব সময় চিনতে পারে না—এই ছিল কবিগুরুর মত। মানুষ নিজের জালের মধ্যে থেকে মধ্যবিন্দুতে নিজেকে সৃষ্টি করে চলছে। এর ফলে কবিগুরুর কবিসত্তা আরও ব্যাপকভাবে কবিতার ক্ষেত্রে ঘুরে ঘুরে বিচরণ করছে। মানুষের এই কবিসত্তা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে—এই কবি-মন থাকার ফলে সমগ্র জীবন ও জগতের সঙ্গে কবি সঙ্গলাভ করে থাকে। স্বীকার করা যেতে পারে মানুষ যুক্তিতর্ক দ্বারা পরিচালিত

হচ্ছে, তবুও এই সুসমঞ্জস যুক্তি ও তর্কের মধ্যে একটা হেঁয়ালি যেন থেকে যায়। মাঝে মাঝে কবি বিরাট পৃথিবীকে একটা সংকীর্ণ গোলাকার বৃত্তে এনে পৃথিবীর যান্ত্রিক নিপুণতা লক্ষ্য করে ভাবতেন যে এটা মানুষের সৃষ্টি। এই জীবজগত মানুষের জৈব পাশব প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত।

শিলেরকে একবার তিনি লিখেছিলেন প্রতিভা বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতসারে কাজ করে চলে। নির্জন মানুষের মন প্রতিভাবানদের প্রতিভা বিষয়ে কিছু জানতে দেয় না। আবার তিনি লিখেছেন প্রতিভা হচ্ছে পৃথিবীতে একটা আকস্মিক ঘটনা। আবার কখনো মনে হয়েছে প্রতিভা সেই সব মানুষদের আছে যারা নিজেদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও যুক্তি তর্কের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। নিজেকে শোধন করলে বোধ হয় প্রতিভার স্ফূর্তি হয়। কারণ চিন্তা ও কাজের যথাযথ প্রয়োগ করে প্রতিভাবান লোকেরা বিরাট কীর্তি পৃথিবীতে রেখে যায়। যে-যুগে যত প্রতিভাবান জন্মেছে সে-যুগে সাধারণ লোকেরাও ততটাই উপকৃত হয়েছে।

শিলেরের ওপর গ্যেটের প্রচুর আস্থা ছিল। শিলেরের পত্র পেয়ে একবার তিনি লিখেছিলেন যে তিনি আবার 'ইলিয়াড' পড়ছেন। এই উক্তি থেকে বোঝা যায় শিলেরের ওপর তার কতখানি উচ্চ ধারণা ছিল। তাদের এই আন্তর হৃদত্যা সম্ভব হয়েছিল প্রকৃতি-প্রীতি থেকে। বস্তুর ব্যাখ্যাকারী হিসাবে কবিকে তিনি অন্তরে গ্রহণ করছেন। বস্তুর বাইরের রূপ ও বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক অবহিত হওয়ার জন্য পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

মানুষের আন্তর রূপ যে জটীল তা কবিগুরুকে শিলের শিখিয়েছেন। এ থেকেও বোঝা যায় শিলেরের কাছে কতখনি ঋণ তিনি গ্রহণ করেছেন। শিলেরকে আরও বলেছিলেন যে তার যাত্রাপথ তাকে বিভ্রান্ত করে—বস্তুর ব্যবহার করতে গেলে তিনি হদিস পান না তার। কবি কোন কিছু করবার আকাঙ্ক্ষাও হারিয়ে ফেলেছিলেন। তার এই বন্ধ্যা স্বরূপ কীভাবে যে কবিকে অভিভূত করল তা কবি বুঝতে পারেন নি—তবে কবির মধ্যে যে একটা আঘাতহীনতা আগে থেকেই সুরু হয়েছে—এ তিনি শিলেরের কাছে স্বীকার করেছেন।

শিলের-এর 'Musenalmanach' কবিতা পড়ে কবি শিল্পীর কুশলতার প্রশংসা করেছিলেন। কবিতার প্রাণকে উজ্জীবিত করতে হলে কবিতার মধ্যে

থাকবে অনুভূতি ও স্মৃতি। চিত্রশিল্পীদের অঙ্কিত ছবির মত স্মৃতির ভেতরে থেকে এক আনন্দ রসে আপ্লুত করে কবিতা। আর্ট সৃষ্টি যতদিন হয় নি ততদিন পর্যন্ত আর্টের সার্থকতা কেউ বুঝতে পারে নি। আর্ট সৃষ্টি হওয়ার পর দুটি জিনিষ এল।• জিনিষ দুটি হচ্ছে আর্টের প্রশংসা ও আর্টের বিরুদ্ধে দোষারোপ। তবে আর্ট হচ্ছে আসলে ভাবগত। যারা আর্ট বিষয়ে কোনরূপ প্রশ্ন করতে চান না তারা আর্টের সঙ্গে অনেক কিছু নিজের মনোমত জুড়ে দিতে চান—এরাই আর্টকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। তা ছাড়া বিশেষ ধরণের নঙর্থক সমালোচনা আর্টকে কিছু দিতে পারে না—এই পরিপ্রেক্ষিতে শিলেরকে কবি আহ্বান করেন অন্তত কিছু লিখতে। শিলেরের অভিজ্ঞতা আছে, প্রতিভা ও চিন্তা দ্বারা পরিশীলিত তার বনিয়াদ। এই বনিয়াদের ওপর নাট্যকার-কবিদের আবির্ভূত হওয়া সাহিত্যজগতে একান্ত প্রয়োজন।

তারপর তিনি বলেছেন প্রকৃতিকে জানলেই শুধু হবে না। শিশুর কাছে আপেল খাওয়া এবং পতনশীল আপেল থেকে নিউটনের সূত্র বার করার মধ্যে পার্থক্য আছে। সেই রকম প্রকৃতিকেই জানলেই হবে না—মানুষের মধ্যে প্রকৃতির বাণীকে আহরণ করে সম্যক উপলব্ধিই বড় কথা। প্রকৃতির মধ্যে চূড়ান্ত সত্য বলে স্বীকৃত জিনিষটি রহস্যে আবৃত। তবু একদল দার্শনিক আছে যারা নিজেদের ধ্যানধারণাকে বিশ্বাস করে। অপরের বিশ্বাস ও যুক্তিতর্কের ওপর তারা ধার ধারে না। তারা নিজের স্বীকৃত গণ্ডীর বাইরে অন্য সামগ্রীকে বিদ্বেষের চোখে দেখে। জৈব জীবের মধ্যে বাহ্যিক যে কার্যকারিতা আছে তা নৈসর্গিক কার্যকারণ ব্যাখ্যা করে—এবং দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা হতে সব কয়েকটিকে স্বীকার করা যেতে পারে। আপন গণ্ডীর মধ্যে জৈব সত্তায় কার্যকারিতার প্রতি গ্যেটের আকর্ষণ ছিল! অবশ্য অনেকে আছে যারা বস্তুর ভিতরকার সত্তার রূপকে সহজে স্বীকার করতে চায় না। কবিগুরুর ধারণা এই যে কেবলমাত্র বাইরে থেকে অগ্রসর হলে পরম সত্তার কাছে যাওয়া যায় না। আর যারা ভেতর থেকে বস্তুর যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করতে চান তারা বস্তুকে ধরতে পারে না। সুতরাং সবচেয়ে নিরাপদ স্থান হল দুই চিন্তা জগতে বাস করা যতক্ষণ খণ্ড ও অখণ্ড রূপকে জানা না যাচ্ছে। এটা অবশ্য তিনি রহস্যচ্ছলে বলেছিলেন কী না তা জানা যায় না। অন্তর্দ্বন্দ্বে সঙ্কট যদি হয়ে থাকে তবে এ মন্তব্য একেবারেই সম্ভব নয় কবির পক্ষে।

শিলেরের সহযোগী ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব গ্যেটেকে অত্যন্ত উত্তপ্ত করেছিল। ফলস্বরূপ গ্যেটের শক্তি ও আকাঙ্ক্ষা আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে—কারণ তিনি আনন্দ পেয়েছিলেন সেই আন্তরিকতা ও সহযোগিতার মধ্যে। কবিগুরু শিলেরকে জানিয়েছিলেন যে কোনরকম বিশেষ উৎসাহ ব্যতিরেকেই তিনি পথপরিক্রমা সুরু করবেন। এ পথপরিক্রমা একটা নতুন সত্যের সূচনা করবে। শিলেরের স্পর্শ তার মনে সঞ্চারিত হল। সক্রিয়ভাবে তারা একসঙ্গে কাজ করবেন বলে ঠিক করলেন গ্যেটে। কারণ তারা পথপরিক্রমায় এমন এক স্থানে উপনীত হয়েছেন যা দুজনেই সন্ধান করছিলেন। গ্যেটে বুঝতে পেরেছিলেন তার মধ্যে একটা আশ্চর্য বোধ কাজ করছে; তবু মানুষ নিজেকে পরিচালনা করে ততক্ষণ যতক্ষণ পর্যন্ত সেই অভাব ও সন্দেহকে নিজের ইচ্ছাধীন রাখতে সক্ষম হয়। শিলেরকে তিনি দোসর হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন বোধ করি এই কারণে যে তার মত অখণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জার্মাণ নর্ডিককে শিলের বুঝতে পেরেছিলেন। আর সম্ভবত শিলের ব্যতীত তাকে পরিচালনা করবার কেউ ছিল না। পরিশেষে একটা পত্রে গ্যেটে লিখছেন, বিশেষ একটি জিনিষ মানুষকে আনন্দ দিতে পারে না। আনন্দকে প্রকাশ করতে হবে রচনারীতি ও প্রকাশের মধ্যে দিয়ে; বস্তুর সারবত্তা আছে বলেই ভিন্ন জিনিষের মধ্য দিয়ে আনন্দ উপলব্ধি করা যায়। বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যেই আনন্দের প্রকাশ—তবে আনন্দকে প্রকাশ করবার পথ এক—কারণ অনুসন্ধানের পথ বিভিন্ন হলেও সেই বিভিন্ন পথ এক আনন্দকে প্রকাশ করে। তবে আবার এক বিপরীত মন্তব্যও প্রায়ই গ্যেটে করতেন। তিনি বলেছিলেন স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়ে জৈবসত্তার রূপকে আবিষ্কার করবার, বোঝবার প্রয়াস করবার পরও তিনি যেন কিছু বুঝতে পারছেন না।

শিলেরের পত্র থেকে জানা যায় গ্যেটে বিদেশী সাহিত্য পড়তেন। মিলটনের 'প্যারাডাইস্ লষ্ট' তিনি পড়েছিলেন। এ পুস্তক বিষয়ে শোভন মন্তব্য করলেও 'প্যারাডাইস লষ্ট' কাব্যকে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে নিতে পারেন নি। বাঙালী পাঠক শুনলে প্রীত হবেন যে গ্যেটে 'গীতগোবিন্দ'এর অনুবাদ পড়েছিলেন। 'গীতগোবিন্দ' পড়ে তিনি প্রীত হন। তবে অনুবাদক কয়েকটা অংশ বর্জন করেছিলেন অত্যন্ত ইন্দ্রিয়ধর্মিতার জন্য। গ্যেটে সেই অনুবাদককে ক্ষমার চোখে দেখেননি। তিনি বলেছিলেন

অনুবাদকের সৌন্দর্য-বোধের অভাব থাকার দরুণ সুন্দরকে অনুবাদক গ্রহণ করতে পারেননি। এবং তা যদি অসুন্দর হয়ে থাকে তাহলে অনুবাদক সম্ভবত ভুল করে অনুবাদ করেছিলেন।

গ্যেটে আইনজীবী হওয়ার বাসনায় ছাত্রজীবন সুরু করেছিলেন—যৌবনে অভিনয়ও করেছিলেন—তবু পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে তার জার্মাণ গথিক মন যে অভিনয় করে গেল তা অনন্যসাধারণ তিনি ছিলেন খাঁটি নর্ডিক জার্মাণ। গ্রীক ধ্যানধারণাকে অন্তরে তিনি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন কারণ তিনি ছিলেন আর্য। বহু দেবদেবী পুজো করত গ্রীকরা। আর্য-সভ্যতার যে পরিশীলিত রূপ তা দিয়ে তিনি সব কিছু সুন্দর ও মহানকে গ্রহণ করেছেন। আর এই সুন্দর ও মহান গ্রথিত হয়েছে, জার্মাণ স্থপতিবিদ্যার মতই, তার মনে। এই সুদৃঢ়ভিত্তিক গথিক কলার মতনই ছিল তার মন, যে মন পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চের দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও গভীরতাকে ভেদ করে অনন্ত প্রজ্ঞার রাজ্যে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে সর্বদেশে সর্বকালে।

মোমবাতি ও একটি নারীর ভালোবাসা

(একটি প্রতীকী নাট্যকাব্য)*

অরুণ ভট্টাচার্য

প্রস্তাবনা :

সংসার সমাজকে ত্যাগ করে যে নারী চলে এসেছিল ভালবাসাকে একমাত্র সত্য জেনে, অভিজ্ঞতায় অবশেষে বুঝলো, সংসারে ভালোবাসাই হয়তো একমাত্র বস্তু নয়। এবম্বিধ আঘাতের ফলস্বরূপ অসুস্থতা ও মৃত্যুকামনায় তার দিনরজনী অতিবাহিত হতে লাগল।

আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে বুঝতে চেষ্টা করতো নিজেকে—বাতাসের শব্দে জানতো বাইরের পৃথিবীর প্রাণ চঞ্চলতা, ছাতিম গাছের ছায়ায় পেত আশ্রয়, নীলমনিলতা দিত সৌন্দর্য ও বাঁচবার স্বাদ।

পুরুষ নিজেরই আত্মতৃপ্তিতে যে তাকে ভালোবেসেছিল একথা বুঝতে পেরে তার অন্তর্জ্বালার অবধি ছিল না। নারীর শরীরে যে রহস্যময়তা ছিল—সে আবরণ খসে যাবার পরই তার কামনা শেষ হ'ল। সঙ্গীতে সে প্রেরণা পেল নতুন করে বাঁচবার—প্রকৃতির সঙ্গে সুরসৃষ্টির যে সংযোগ—তা তাকে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিল। নারী অবশেষে বুঝলো, যে ছন্দ চতুর্দিকে প্রবহমান তাই পুরুষ আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইছে, বুঝলো পুরুষকে ভালোবাসার মধ্যে নিহিত আছে সুখ, প্রকৃতিকে ভালোবাসার মধ্যে আনন্দ—এ কথা সে যখন নতুন করে বুঝলো তখন পুরুষের এই দ্বৈত সত্তার কাছে পুনরায় আত্মসমর্পন করলো। কেননা সমর্পনেই আনন্দ এবং শান্তি॥

[এই নাটকটি প্রয়োজনীয় নির্দেশমত মঞ্চস্থ করা যাবে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। সেহেতু নির্দেশ এত বিস্তৃতভাবে দেওয়া হ'ল যে পাঠক মনে মনে সমস্ত দৃশ্য কল্পনা করে নিতে পারবেন। যার রাগসঙ্গীতে শ্রুতিজ্ঞান আছে তিনি বুঝবেন কেন বিভিন্ন অবস্থায় তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বাদ্যযন্ত্র এবং বিভিন্ন সময়ে তিনটি পরস্পর বিরোধী রাগরূপের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।]

মোমবাতি ও একটি নারীর ভালোবাসা

চরিত্র :

আয়না : মানুষের সমান বয়েসী

ছাতিম গাছ

বাতাস

পুরুষ

নারী

মধ্যরাত্রি প্রথম দৃশ্যে

শেষরাত্রি দ্বিতীয় দৃশ্যে

দুপুর তৃতীয় দৃশ্যে

সময় : চৈত্র, বৈশাখ ও আষাঢ়ের তিনটি বিচ্ছিন্ন দিন ।

স্থান : বীরভূমের খোয়াই এর ধারে ছোট বাংলো। যার বাংলো তিনি এখন মৃত। মাটির তৈরী। গাঢ় লাল ধুলোর রঙই বাংলোর গায়। দেওয়ালের ওপর গোলপাতার ছাউনী। দু চারটে গাছ এদিক ওদিক। কাঁটালতার বেড়া ডিঙিয়ে ছোট উঠোন। মাটি-জমানো বেদী বসবার, বৃত্তাকার, কিছু কাঁটা গাছ। আর টবের গাছ এধার ওধার। দক্ষিণের জানলার ধারে ঠায় দাঁড়িয়ে অন্যতম প্রধান চরিত্র ছাতিম গাছ। উত্তরের বাতাস আসে, থামে, জানলা দিয়ে ঘরে যায়। ছাতিম গাছে পাতারা তখন শির্ শির্ করে কথা কয়ে ওঠে। অন্য সময় এ বাংলো এত নিস্তব্ধ যে কোন দিন কেউ কখনোই যেন কথা বলেনি। এই পৃথিবীর যেন কোন শব্দ এখানে পৌঁছোয়না।

প্রথম দৃশ্য

[দৃশ্য যখন উঠবে দেখা যাবে ঘরের একাংশে প্রকাণ্ড আয়না—মানুষের সমান বয়েসী যেন। নাটকের প্রথম চরিত্র, যা সবাইকে গোড়াতেই অভিভূত করবে। শুধু আয়নাই। কাঁচ শুধুমাত্র, কাঠের বেড় নেই। ঝক্‌ঝকে ঘন বুনোট—যেন সমস্ত আলো-কে মুহূর্তে বিচ্ছুরিত করতে পারে, এত সাদা যেন সকল অন্ধকার-কে গ্রাস করতে পারে। একটি টবের পাতাবাহার জানলা দিয়ে বাইরে গিয়েছে—ছাতিম গাছের প্রকাণ্ড বেড়কে জড়িয়ে সুখে আছে।

আর বাইরে থেকে নীলমণিলতা ঘরের জানলায় জালের মত জড়িয়ে আছে, যেন বিছানায় শায়িত মেয়েটিকে দেখছে। মনে হয় ঐ নারী একমাত্র এই নীলমণিলতাকে আশ্রয় করেই পরম নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকে। একটি ছোট গোল টেবিল—তার ওপর কিছু সাদা কাগজে সামান্য গান আর কবিতার খসড়া, এলোমেলো। মোমবাতির আলোয় কোণে কোণে তাল তাল অন্ধকার। পাঁচটি ঘন মোমবাতি গোল করে সেজ্-এর পর সাজানো। মাঝে মাঝে হাওয়ায় নিভে গেলে আবার জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিছানায় গাঢ় লাল রঙ এর চাদর। নরম বালিশে মাথা দিয়ে মেয়েটি শুয়ে থাকবে। দীর্ঘ দিনের অসুস্থতায় পাণ্ডুর মুখশ্রী। বিছানায় যেন মিশে আছে—হঠাৎ চোখে পড়ে না, তার অস্তিত্ব কল্পনা করে নিতে হয় মাত্র। অন্য প্রান্তে বসবার জাজিম মত। পুরুষটি সেখানে বসে মধ্যমে তানপুরো মেলাচ্ছে। নরম ঠাণ্ডা সুর ঘুরে ঘুরে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ছে। মোমবাতির আলো হ্রস্ব দীর্ঘ ছায়া ফেলছে দেওয়ালে। দূর কোণায় তাকালে আয়নার ভেতরে অস্পষ্টভাবে মেয়েটির ক্লান্ত শয্যা চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে মালকোষের নীচু পর্দায় সরোদের আলাপ শোনা যাবে।]

হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে বাতাস ঢুকলো ঘরে, উত্তর থেকে। আয়না ভয়ানক জোরে কেঁপে উঠলো। তানপুরোর শব্দ থেমে গেল। মেয়েটি যেন ঘুম থেকে উঠে একবার চোখ মেললো—কিন্তু কথা বললো না, অবাক হল না। কেবল আয়নার দিকে তাকিয়ে রইল ; নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে প্রথমে পুরুষই কথা বলল।

পুরুষ : স্তব্ধতা, তোমার মুখে এখনো ক্লান্তির চিহ্ন আছে ?

[আবার এক দমক বাতাস ঢুকলো ঘরে। পাতাবাহার কুঁচকে দুমরে উঠলো ভয়ে—হাতিম গাছের আশ্রয়কে আরো সমর্থভাবে জড়িয়ে ধরলো। মেয়েটি কোন সাড়া দিল না, যেন শোনেনি।]

পুরুষ : স্তব্ধতা, এবার তোমাকে
এই গাঢ় রাত্রির রঙে
সাজাবে সময়। মুখ তোলো। বলো একবার,
বিষণ্ণতা অন্ধকার নয়।

[পুরুষটি এবার থামলো। আয়নার দিকে তাকালো। এবার মেয়েটিকে দেখা যাবেনা—গাঢ় অন্ধকার যেন তাকে ঢেকে ফেলবে। আর কোণ থেকে

শুধু আয়নাকে দেখা যাবে—তির্যক অবস্থায়—আরো সামনে এগিয়ে আসবে, ঘরে যেন শুধুমাত্র পুরুষটি এবং আয়না—আর কেউ নেই—আয়নার ভেতর থেকে কে শ্রান্ত গলায় কথা বলে উঠবে :]

আয়না : আমাকে কোথাও নিয়ে চল স্থবিরতা—এই মৃত্যু
মানে অন্ধকার. মানে কঠিন নিয়তি
আমাকে কি ক্লান্ত করেছে !
দুহাত বাড়াও। ধরো
আঙুল আমার।

[আয়নার ভেতর থেকে কোন নারী যেন উঠবার চেষ্টা করবে। শীর্ণ আঙুলগুলি দেখা যাবে। তারপর আবার শুয়ে পড়বে। দুহাতে মুখ ঢেকে। পুরুষটি সেই দিকে তাকিয়ে থাকবে। তারপর]

পুরুষ : না না লজ্জিত হয়োনা সুখ, মুখ তোলো
দেখো বাইরে ছাতিম তলায়
সূর্যকে আড়াল করে অন্ধকার এনেছে শরীরে,
বিষণ্ণতা ভরেছে হৃদয়,
অসুস্থ শয্যায় সে বিকেলের শান্তি নিয়ে চোখে
সময়কে পাড়ি দেবে।

[তারপর অনেকক্ষণ শুব্ধতা। দৃশ্যপট বদলালো। আয়না দূরে সরে যাবে। মেয়েটিকে আবার দেখা যাবে। নীলমণিলতার জাল পেড়িয়ে যে আকাশ তাকে ছাতিম গাছের ডালপালা ছাড়িয়ে এখন আর নীল দেখায়না—বরঞ্চ ঈষৎ ধূসর রঙে উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে যেন সঙ্গীহীন দাঁড়িয়ে আছে। আর সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এই একটিমাত্র ঘরেই যেন যা কিছু বিষণ্ণতা বা সুখ অবশিষ্ট রয়েছে। পুরুষটি বহুক্ষণ নিশ্চুপ থাকবার পর আবার তানপুরো ছাড়তে লাগলো। মধ্যমের সুরটি থেকে খরজে এসে বার বার গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে যেতে থাকলো। আয়না আবার দূর থেকেই কথা বললো। এবার ক্ষীণ অস্পষ্ট কণ্ঠ। তানপুরো তথাপি থামলোনা—সুরের সঙ্গে মিলে সেই অস্পষ্ট ক্লান্ত কণ্ঠ একটি বিষণ্ণতা ছড়িয়ে দিল ছাতিম গাছের শাখায় শাখায়—এবার সমস্ত কথা কিছুটা বিলম্বিত লয়ে হবে।]

আয়না : যে অসুখে শরীর মন সারা বিকেল ক্লান্ত
ঈষৎ নীল আকাশটার চোখে
তার কি অন্য কোন এক গভীর মানে আছে !

[এরপর কণ্ঠস্বর আর একটু স্পষ্ট হ'ল, ওপরের ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল— দৃঢ় ভঙ্গিতে যেন বলে যেতে থাকলো]

আয়না : তখন বিকেল, সমস্ত শখ উপহাসের ঋতু—
খোলস ছাড়ায়, সাপের মত, মনের গূঢ় ইচ্ছা।
এখন রাত্রি, সমস্ত রঙ নিজের মুখে ঘসে
আজব সঙ্ সাজল যে যার মত—
মূর্খ বালক একা তখন মেলার ধারে ঘোরে।

[হঠাৎ আচমকা বাতাসে মোমবাতিগুলি সবই নিভে গেল। ঘরময় নিস্তব্ধতা। তারপর আবার শব্দ ভেসে আসলো]

আয়না : তবু নীরব নিশীথিনী দূরে কাছে মগ্ন থেকে আলো
ছড়ায় এবং আমার কঠিন অসুখ নিয়ে শুরু
নারীর মত বিষণ্ণতা পাবে আরেক ভোর—
বিফলতা তখন তার অপার বিশেষণে
অনন্যতায় উজ্জ্বল হবে।

[এমন সময় বাইরের অন্ধকার দেখা যাবে জানলা দিয়ে। দূরে দূরে খোয়াই এর উঁচু নীচু জমিতে অন্ধকার জমে জমে থাকবে। সাঁ সাঁ করে বাতাসের একটানা আওয়াজ আসবে। নীলমণিলতা যেন ভয় পেয়ে জানলার প্রান্তগুলো আরো ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ধরবে। শেষ কয়েকটি লাইন ধীরে ধীরে আয়নার ভেতর থেকে আবৃত্তি শোনা যাবে। খুবই বিলম্বিত লয়ে।]

আয়না : এ হেন অমানিশায়
আরো গভীর প্রশ্ন করে অসুখ শরীর শান্ত।
কার্তিকের আকাশ জুড়ে একটি নীল নক্ষত্রের চোখ
রূপকথার গল্প যেন, ফুরোয়োনা যার আয়ু এবং দীপ্ত।

[এবার ছন্দের রেশটুকু আর থাকবেনা। শুধুমাত্র তানপুরোর সুর। সবগুলো মোমবাতি জ্বলে উঠল এবার।]

পুরুষ : তাহলে আমাকে দেখো ; যন্ত্রণায় বিভক্ত শরীর—

[মেয়েটি উঠবার চেষ্টা করল। হাত বাড়িয়ে নীলমণিলতাটিকে ধরল, আদর করলো। আঙুলের ডগায় ডগায় লতাটিকে নিয়ে বুকে জড়িয়ে রাখলো]

পুরুষ : আমৃত্যু যন্ত্রণা তার, ধিকি ধিকি তুষের আগুনে
এলোমেলো কুঞ্চিত শরীর,
দাহ দগ্ধ দিনের পাণ্ডুরতা আশৈশব স্মৃতিতে উদ্বেল।
আর অবিন্যস্ত রূপরেখায়
কাজললতা চোখ তার।

[দূরে আকাশের দিকে চেয়ে, কিছুটা হতাশ কণ্ঠে]

আমার ত কিছুই সম্বল নেই, কিছু নেই—
আশার নিরাশার নিখিল ভুবনে
হতবাক্ বিস্মিত ব্যাধবিতাড়িত হরিণীর মত
গাছ ঘাস শিশিরের মসৃন চাদরে শুয়ে আছি,
নক্ষত্রের দিকে চেয়ে।

[লাল আলো পড়লো মুখে। এক ঝলকে সমস্ত শরীর যেন উত্তাপ পেল। কপালের শিরাগুলো দপ্ দপ্ করছে দেখা গেল। কিছুটা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল]

পুরুষ : আশা নিরাশার মৌন দ্বন্দ্বে
গোপন পাপের মত অশরীরী অস্তিত্ব নিয়ে
লালন করেছি তাকে।
বিধাতা আমাকে এখন
নিষ্ঠুর শাসনের শৃঙ্খলে বেঁধেছেন।
কেবলি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছি!

[মেয়েটি এবার নীলমণিলতা ফেলে দিল। মনে হ'ল যেন কিছু বলতে চায়—ক্লান্ত করুণ কণ্ঠ শোনা গেল আবার আয়না থেকে]

আয়না : আমার শরীর আমার অস্তিত্ব,—
নয়তো তোমাকে
অনুভব করি কি দিয়ে!
আর এই যে যন্ত্রণা
তোমাকে পাওয়ার না পাওয়ার,

দুই-ই আসার মত আশা নিয়ে,—
একে দুহাতে ঠেলে কতদূর রাখি বলো !
[এবার পুরুষের দিকে চেয়ে কিছুটা নিষ্প হ কণ্ঠে]
তোমাকে বলবো ভাবি :
সংকোচে সংশয়ে ক্ষোভে তোমাকে দূরে রাখি।
আমার আকাঙ্ক্ষা দিয়ে তোমাকে
মন্দিরের বিবর্ণ বেদীতে বসিয়ে রেখেছি,—কেননা
নিরবধি আমার বিফল আর্তির
অন্য এক নাম ভালোবাসা—
যা তুমি নিতে পারোনি। পারবেনা।
[এবার কণ্ঠ উত্তেজিত, ক্ষুব্ধ]
এ ভালোবাসার অন্য নাম বিফলতা—মৃত্যু—মত্ততা,
যা আমি নিরন্তর কামনা করেছি ॥

[প্রচণ্ড তীব্র তীক্ষ্ণ কান্নার শব্দ শোনা যাবে। দমকা হওয়ায় মোমবাতিগুলি সব নিভে যাবে। তানপুরোর সুরের সঙ্গে মালকোষের নীচু পর্দার আলাপ সরোদে সোচ্চার হয়ে ঘরময় অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবে। ছাতিম গাছের পাতার সাঁ সাঁ শব্দ কেবল—ঘরময় কিছু কিছু শুকনো পাতা ছড়িয়ে পড়বে। নীলমণিলতা জানলার ধারে ধারে আছড়ে পড়বে এবং মেয়েটিকে উপুর হয়ে থাকতে দেখা যাবে।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[এবারকার ঘর নিরাভরণ। সমস্ত জায়গাই যেন আয়না জুড়ে থাকবে। উত্তরকোণে পাঁচটি মোমবাতি একসঙ্গে জ্বলবে। জানলার ধারে টবের পাতাবাহার ও আফরির মত নীলমণিলতা। বাইরে ছাতিম গাছ। শেষ রাত্রির ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢুকছে নিঃশব্দে। ছেলেটি ঘুমোচ্ছে অঘোরে। শুধু বাইরে থেকে একটি বাজনার সুর ভেসে আসছে। মনে হচ্ছে কে যেন রাস্তা দিয়ে বেহালায় কালেংড়ার সুর বাজাচ্ছে। করুণ অথচ উচ্ছল শব্দে ঘর ভরে যাচ্ছে। মেয়েটির গায়ে চাদর জড়ানো, নিরাভরণ ঘরের মতই তারও শরীর

নিরাভরণ। একবার মাত্র পুরুষটিকে দেখা গেল, তারপরই মনে হ'ল আজিমের শরীরে তার শরীর জড়িয়ে আছে। কোন চেতনা নেই যেন।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মেয়েটি চাদর খুললো। একটি মাত্র ঢিলে জামা গায়ে—রাত্রিবেলার পোষাক শরীরে, আয়নায় সমস্ত শরীর দেখা যাবে।]

নারী : এমন নিমগ্ন তুমি, ভোরের বাতাস যাকে ডাকে
ছায়ার শরীরে। ক্লান্ত পদক্ষেপ যদি শোনো কভু
নিরস্ত্র আমাকে ভাবো, দেখো এ শরীরে অন্তর্জ্বালা,
জুড়াবে কখন মাগো!

[আয়নায় মেয়েটির অদ্ভুত হাসি দেখা গেল—বিষণ্ণতা ছাড়াও আরও কিছু ছিল যা আকর্ষণ করে। বাইরে বোধ হয় চাঁদ ছিল। ছাতিম গাছের ছায়া জানলা দিয়ে এককোণে পড়ে আছে যেন। মেয়েটি সেদিকে একবার তাকালো। অনুভব করলো যেন ছাতিম গাছের ঠাণ্ডা ছায়া—তারপর বাইরে তাকালো।]

সম্ভবত সফল রন্ধ্রে স্বাস্থ্য দেবে, নিপুণতা
তবু মানাবেনা আর। আমার মুদ্রণ অবসরও
মিলবেনা। নিষ্ঠুর নিয়তি তাকে ভর করে আছে।

[হঠাৎ আজিমের কাছে এসে বসলো। ছেলেটির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মুখে প্রসন্ন শান্তি দেখা গেল। খুবই অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রচণ্ড হাওয়ার ঝড় উঠলো যেন—নীলমণিলতার আকরি সব ছিঁড়ে যেতে চাইল। মেয়েটি একবার জানলা বন্ধ করতে গেল। দেখলো চাঁদ কখন ডুবে গেছে মুহূর্তেই—ঘন পুঞ্জীভূত মেঘের পর মেঘ জমে জমে আকাশকে কালো করেছে। ঝড়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে বহুদূরে। যেন সে এবার কাছে আসছে। ঝড়ের শব্দে ছেলেটির ঘুম ভাঙলো। একবার উঠে জানলার ধারে গেল, আবার ফিরলো। কালেংড়ার সুর তখনো, ঝড়ের মধ্যেও, অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। আজিমের একপাশে রাখা সরোদটি তুলে নিয়ে ছেলেটি নিবিষ্ট মনে একই সুর বাজাতে থাকলো। প্রথমেই খুব দ্রুত লয়ে, যেন ঝড়ের গতির সঙ্গে সংগতি রেখে। মেয়েটি আগাগোড়া নিঃশব্দে সমস্তই লক্ষ্য করলো। তারপর জানলার কাছে গেল, যদিও জানলা বন্ধ করলোনা। তার বিষণ্ণতা ততক্ষণে মিলিয়ে গেছে একেবারেই। নীলমণিলতা আঁকড়ে ধরে মেয়েটি উৎসুক কণ্ঠে বলে যেতে থাকলো।]

নারী : আমাকে ডাকো কেন, ডাকো কেন!

আমার সকল শরীর বিসর্জ্জর, মন মুমূর্ষু
গাছপাতার ঝাপসা হাওয়ায় বিবর্ণ রূপরেখা
ভিজে মাটির, স্যাঁওলার গন্ধে যন্ত্রণাকাতর।

আমাকে তবু ডাকো কেন!

যা কিছু পারি, যা কিছু জানি বলে
এতদিন মনে হয়েছে
প্রতিদিনের জানাশোনায় তার অর্থ মলিন হ'ল—
অহংকারের সলতে পুড়িয়ে নতুন করে বুঝলুম
আমার শরীর মনে নোংরা কলঙ্কের কাহিনী লেখা।

[এবার মেয়েটি আয়নায় তার নগ্ন শরীরকে দেখবে। মুখে জটীল হাসি দেখা যাবে।]

আমার যা কিছু তুমি সত্য ভেবেছো
তা সত্যের মুখোশ,
যা কিছু সুন্দর ভেবেছো
তা কুৎসিত কামনার পোষাকী সংস্করণ।

তুমি জানোনা বলে ভালোবাসো
আমি জানি বলেই দূরে সরে যেতে চাই।

আমাকে তবু ডাকো কেন, ডাকো কেন!

[ঘরময় হাওয়ার অশান্ত উল্লাস—পঞ্চপ্রদীপের আলো নিভে গেল। বাইরে প্রচণ্ড ঝড়—মেয়েটি অন্ধকারে ডুবে গেল—জাজিমের কাছে দাঁড়িয়ে ছেলেটির মাথা বুকে রাখলো। অস্থির হাতে মাথা বুকের ভেতর চেপে ধরতে চাইলো; ছেলেটি একবার তাকালো—আবার পরক্ষণেই পরম নিশ্চিন্তে চোখ বুঁজে একমনে বাজাতে থাকলো; এই আদর, এই ভালোবাসা যেন তার প্রত্যাশিত ছিল! এমন সময় প্রচণ্ড বৃষ্টি নামলো, মেয়েটির আঁচল ভিজতে থাকলো; ঘরময় জলের শব্দ, ঠাণ্ডা বাতাসের অস্থিরতা। কেউ তবু উঠলোনা—অন্ধকারেই মেয়েটির কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল। যেন ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে]

মেয়েটি : তোমার সংলগ্ন ঘরে
আমাকে কিছুটা জায়গা ছেড়ে দিও, দিও
খানিকটা আলো আর উত্তাপ।

•

এখন জলের ঋতু, নিরানন্দ আকাশে
আমার তোমার উদ্বেল হৃদয়কে
আয়নার মত ধরে রাখি, যদি না
মনের পাগল ইচ্ছারা
জল হয়ে জল হয়ে ঝড়ে পড়ে।

[এবার ছেলেটির সমস্ত শরীরকে জোরে সকল শক্তিতে জড়িয়ে ধরবে—নির্বোধের মত উচ্চকণ্ঠে বলবে]

তোমার সংলগ্ন ঘরে—
আমাকে কিছুটা আশ্রয় দিও,
খানিকটা আলো দিও, আর উত্তাপ
যার গাঢ়তায় আমার শীতল দেহটা
সারা রাত উষ্ণ থাকে, উষ্ণ থাকে॥

[মেয়েটি সেই অন্ধকারে, ঘন বৃষ্টির রাত্রে,—যেন আদিম পৃথিবীর দুটি নর নারী—এমনি একান্ত নির্ভরতায়, ছেলেটির পাশে শুয়ে পড়লো। বাইরে অশান্ত মাতামাতি—তীক্ষ্ণ বিদ্যুতের আলোয় মাঝে মাঝে নিষ্প্রদীপ ঘরে আলো জ্বলে জ্বলে উঠছিল—

কালেংড়ার সুর এখন আবার শোনা যাবে। ধীর মন্থর বিলম্বিত আলাপ মাত্র।]

তৃতীয় দৃশ্য

[দুপুর—যতদূর তাকানো যায় লাল মাটির রুক্ষতা। ঝড়ের পর সমস্ত শান্ত ; প্রকৃতির স্নিগ্ধতা মনকে সহজেই আকর্ষণ করে যেন। গাছপালায়, উঠোনে, দূর খোয়াই এর উঁচু নীচু ঢালে নীলমণিলতা প্রশান্ত হাসি ছড়িয়ে আছে। মেয়েটি জানলার ধারে দাঁড়িয়ে—ক্লান্তির ছাপ নেই। মেয়েটির বিছানায় ছেলেটি বসে গৌড় সারং এর সুরে সেতার বাজাচ্ছে। রৌদ্র ফাঁক

দিয়ে কখন ঘরে ঢুকেছে। ছেলেটি বাজাতে বাজাতে হঠাৎ থামবে। জানলার ধারে গিয়ে মেয়েটির হাত ধরে তাকে বিছানায় বসাবে। বলবে]

পুরুষ : এই আমার ঘর। আমার আকাশ

এধার ওধার শুকনো পাতার ভীড়
কবিতার খসড়ায় ধূপদানি, ছাই,
মলিনতা মৃত্যু যন্ত্রণা,—
এই আমার ঘর। আমার বাসর

রাত্রিশেষের বিচ্ছেদে কান্না—
অপরূপ নদীর বিস্তারে স্বপ্ন
একুল ওকুল ভীরু প্রার্থনায় মগ্নতা,—
এই আমার ঘর। আমার সান্ত্বনা।

[মেয়েটির উজ্জ্বল মুখে রৌদ্রের হাসি ছড়িয়ে পড়বে ; সেইদিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলবে]

সংসার আমাকে ডাকে। আর না
কোথাও যাবনা। এখানে দ্বিধাদুর্বল
দিন, সংক্ষিপ্ত রাত্রি
নদীর মত সরলরেখায়, বিন্যস্ত।

সংসার আমাকে ডাকে ডাকুক
এই আমার ঘর, আমার আয়না—
আর না, কোথাও যাবনা।

[মেয়েটি উঠে কোণের দিকে মোমবাতিগুলো আবার জ্বালাবে। ঘরের চারদিকে চারটি আয়না থাকবে এবং প্রজ্জ্বলিত মোমবাতিগুলির অঙ্কুরন্ত প্রতিবিম্ব চারিদিকে দেখা যাবে। মনে হবে, বাংলোর ছোট ঘরটির যেন শেষ নেই—অনন্ত দৈর্ঘ তার, অনন্ত উজ্জ্বলতা। ছেলেটি একমনে দেখতে থাকলো, কিছু বললেনা। মেয়েটি তারপর জানলার ধারে গিয়ে নীলমণিলতাকে আদর

করতে থাকলো। একটি লতা তার চোখে পড়লো হাতিম গাছকে আশ্রয় করেছে, তারপর আকাশের দিকে উঠেছে। আর সে যেন দুর্বল নয়, আর নেই কোন পরনির্ভরতা। মেয়েটি ফিরে তাকালো। ছেলেটিকে ডেকে বললো]

মেয়েটি : কি আশ্চর্য, দেখো নীলমণিলতা ভোরে
আমাকে ডাকছে যেন,—মৃত্তিকা নিয়ত,—
নিশান্তে অপূর্ব দৃশ্যে শোভাময় দ্বীপ
স্নান করে বেনাজলে। হালকা দুপুর
মণিময় রত্ন আর কস্তুরী ধূপের
সুগন্ধ আশ্রয় পেল। পরম আদরে
সুখী নীলমণিলতা দ্বীপের প্রাচীরে
কণ্ঠহার হয়ে দোলে।

[এমন সময় এক ঝলক রৌদ্র এসে পড়ল তার মুখের ওপর। সলজ্জ হাসিতে মুখ তার ভরে গেল। যদিও সে-মুখে একটি অনাস্বাদিত গার্হস্থ্য ফুটে ছিল।]

নিতান্ত স্থবির
পৃথিবীর এক কোণে আমি বসে আছি ;
যুদ্ধ মারী ভালোবাসা সব একে একে
ফেলেছে দুঃশীল ছায়া। বাঁচবার স্বাদ
তখন গিয়েছে চলে। অপমৃত ঘরে
এসেছে সে, নতমুখে বলেছে : এবার
মুখ তোলো অন্ধকার, দেখো দূরে চেয়ে
দুরান্তের অতিথিকে, নীলমণিলতা
তোমাকে ডাকছে যেন। সুখী ভোরবেলা ॥

[সেতারে গৌড় সারং এ ঝালা বাজতে থাকবে, বাজতে থাকবে।]

কবি পরিচিতি : সুভাষ মুখোপাধ্যায় (২)

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

রাজনীতির দ্বারা কবিতা বারেবারে যুগে যুগে আক্রান্ত হয়েছে। সমসাময়িক সমস্যাই রাজনীতির প্রধান অবলম্বন, অতএব স্বভাবতই ওই সব কবিতার আবেদন বিশেষ স্থান ও কালে সীমাবদ্ধ হওয়া সম্ভব এবং সাধারণত তা-ই হয়ে থাকে। কিন্তু এমন উদাহরণও বিরল নয়, যেখানে সমসাময়িক সমস্যা নিয়ে রচিত কবিতা বিষয়ের বোঝা নামিয়ে রেখে বিপুলা পৃথ্বী ও নিরবধি কালের আকাশে পাড়ি জমিয়েছে। পক্ষান্তরে রাজনীতির প্রভাব হতে সম্পূর্ণ স্বাধীন কবিতাও কয়েকবার ডানা ঝাপটিয়ে কোথায় হারিয়ে গেছে এমন ঘটনাও প্রচুর। সুতরাং যে-রচনার উপলক্ষ্য তৎকালিনতা তা যে কবিতা হিসেবে ব্যর্থ হতে বাধ্য একথা বলা চলে না। কিন্তু এমন ভাবনাও ভ্রমাত্মক যে রচনার প্রসঙ্গ অবান্তর অথবা প্রকাশভঙ্গির যাথার্থ্যই তার একমাত্র মূল্য। প্রকৃতপক্ষে প্রসঙ্গই পাঠকের চিত্তে প্রত্যক্ষ তথা প্রথম প্রতিক্রিয়া জাগায়।

অন্তত সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে 'পদাতিক'রূপে বাংলা কবিতার পথে এসেও অতি অল্প সময়ের মধ্যে সবার আগে গিয়ে দাঁড়ালেন তার মূলে ছিল তাঁর প্রসঙ্গের অনন্যতা। অবশ্যি আপাতচোখে নজরুল-প্রেমেন্দ্র-সুভাষের বক্তব্যকে পরস্পরের আত্মীয় বলে মনে হলেও একটু তলিয়ে দেখলেই মানতে হবে যে শেষোক্তজনের কবিচেতনা গোড়া থেকেই ইতিহাসকে অনুধাবন করতে চেয়েছে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে, যদিও তিনি তখন পর্যন্ত সাম্যবাদে দীক্ষিত হননি। সত্যি কথা বলতে কি, সাম্যবাদের প্রভাব সুভাষের কবিচেতনার উপরে সামান্যই পড়েছে, বরং তাঁর কবিচেতনাই তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে সাম্যবাদের প্রাঙ্গণে।

দুই ধনতান্ত্রিক দেশ বাজার দখল করার পাল্লা দিতে দিতে যে-দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে ডেকে আনল তার উত্তেজনা ও ত্রাস তখন বাঙালী বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তদের জীবনেও ছড়িয়ে পড়েছে, মাত্র কুড়ি বছরের ব্যবধানে উপর্যুপরি দু'দুবার গণতন্ত্রের ব্যর্থতা তাদেরকে স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় জর্জরিত করেছে :

কবি পরিচিতি

একদা ছিলাম উচ্চ আশার কৈলাসে
ধূলিসাৎ বটে সে-বালখিল্য স্বপ্নরা। (কানামাছির গান)

বা

বুঝেছি, ব্যর্থ পৃথিবীর পাড়বোনা ;
স্বপ্নের ভাঁড় সামনেই ওলটানো। (পদাতিক : ২)

অন্যান্য স্থানেও নিজেকে বর্ণনা করেছেন "ত্রিশঙ্কু" কিংবা "কানামাছি" অথবা "দোলাচল" বলে এবং এই সব শব্দ দিয়ে তিনি সে সময় মধ্যবিত্ত মানসে যে-অস্থিরতা, যে-বিভ্রান্তি, যে-অনিশ্চয়তা ও যে-হতাশা জেগেছিল তাকেই বোঝাতে চেয়েছেন।

খোলা বাজারের নীতিতে ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সুখী, শান্তিপূর্ণ ও নিষ্কণ্ঠক জীবনায়নের যে-স্বপ্ন উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ দেখেছিল তা প্রথম মহাযুদ্ধের প্রথম হুঙ্কারেই ভেঙে গেল। পটান্তরে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী বুদ্ধিজীবি-গণ নতুন বাংলা গড়ে তুলবার যে-স্বপ্ন দেখতে সুরু করেছিলেন তার শেষ বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত কাটেনি, উপরন্তু জাতীয় আন্দোলনের হাওয়ায় তা ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র ভারতে, নতুন নতুন দিগন্তের ডাক এসে পৌঁছেছিল দেশবাসীর অন্তরে এবং স্বাধীন ভারতের নীতি ও ভিত্তির পরিকল্পনা তখন তাদের স্বপ্নে। কিন্তু এই নীতি ও ভিত্তির সীমা ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে, প্রথম মহাযুদ্ধের মর্মান্তিক ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, এদেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যথেষ্ট অবহিত হননি, অবহিত হলেন তখন যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল। পশ্চিমী গণতন্ত্রের মহত্ত্বের মুখোশ খুলে পড়লে দেখা গেল তার আসল রূপ এবং অতঃপর ইউরোপীয় গণতন্ত্রের আদর্শে স্থিত থাকা কঠিন হলো। কিন্তু পায়ের তলা থেকে ওই ভিত্তি সরে গেলে আবার খুঁজে নিতে হয় নতুন ভিত্তি ; সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের-এর কবিতাতে পাই পায়ের তলা থেকে মাটি হারিয়ে ফেলার দরুন নিরালম্বতার, ইউরোপীয় গণতন্ত্রের আশ্রয়চ্যুত হবার দরুন অসহায়তার কাহিনী। এইভাবে শূন্যে ঝুলে থাকার অস্বস্তিতে তিনি বলেছেন :

নিরপেক্ষ থেকে আর চিত্তে নেই সুখ। (দলভুক্ত)

এবং পশ্চিমী গণতন্ত্রের ঘাট বাতিল করেছেন বলেই তাঁকে নোঙর করতে হয়েছে সাম্যবাদের ঘাটে।

কিন্তু পশ্চিমী গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস দেউলে হয়ে গেছল যাদের তারা হলো মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী এবং এটা নিছক তাদেরই একটা রাজনৈতিক সমস্যা। কিন্তু এই শ্রেণীর বাইরেও যে-বিরাট মধ্যবিত্ত সমাজ আছে তাদের কাছে সংকটের স্বরূপ ছিল অন্যরকম, সেটা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল তাদের অর্থনীতির দ্বারা। বুদ্ধিজীবীর সমস্যাকে তখনকার কোন কোন কবি ব্যক্ত করেছিলেন আবার কোন কোন কবি নিজেকে সর্বহারা শ্রেণীর সদস্য কল্পনা করে ওজস্বিনী ভাষাতে পদ্য রচনাতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সুভাষ ভুলতে পারেননি যে তিনি কোন্ শ্রেণীর মানুষ এবং আপন শ্রেণীর প্রতি দায়িত্বও অস্বীকার করতে পারেননি যখনই তিনি সে-দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়েছেন তখনই তাঁর রচনাও ওজস্বল পদ্যের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে: সৌভাগ্যবশত তাঁর এমন কবিতার সংখ্যা বেশি নয়। তাই তিনি যখন বলেন, "কৃষক, মজুর! তোমরা শরণ", তখন বুঝতে পারি যে এই কবি সর্বহারাদের প্রতি আস্থাবান একজন মধ্যবিত্ত আর যেহেতু তিনি মধ্যবিত্ত তাই তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থানও ত্রিশঙ্কুর শামিল। কেননা, মধ্যবিত্তর হাতে নেই উৎপাদন ব্যবস্থার কর্তৃত্ব অথচ মেহনতী শ্রেণীতে গিয়ে যোগ দিতেও তার অভিমানে বাধে। কিন্তু মধ্যবিত্তর এই না-ঘর না-ঘাট অবস্থান যে তার নিজের পক্ষেই বিপজ্জনক এবং তাকে যে কৃষক মজুরের পংক্তিতে গিয়ে একদা দাঁড়াতেই হবে, একথাটা সুভাষ বুঝতে পেরেছেন বলেই তিনি চেয়েছেন এই অনর্থক মধ্যবিত্ত অভিমানকে অতিক্রম করতে।

অর্থাৎ সুভাষের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি নিজের শ্রেণীর প্রতি সৎ: নিজের শ্রেণীর দুর্বলতা ও তার বিবর্তনের প্রবণতা বা অব্যবহিত পরবর্তী ধাপগুলি সম্বন্ধে সম্যক সচেতন এবং এই সব দুর্বলতাগুলি নিয়ে ঠাট্টা করেও তিনি মুক্তি খোঁজেন দোলাচলতার আর্তি থেকে, স্বশ্রেণীর সীমাকে পেরিয়ে যেতে চান,

তাই এই কৃষ্ণপক্ষে উপবাসী প্রার্থনা জানাই,
আমাকে সৈনিক করো তোমাদের কুরুক্ষেত্রে, ভাই॥ (আর্ষ)

এখানে সুভাষ কেবল নিজের কথা বলছেন না, তিনি বলছেন তাঁর গোটা শ্রেণীর কথা, যে-শ্রেণীর ঝোঁক সর্বহারা শ্রেণীর দিকে। এখানে "কুরুক্ষেত্র" শব্দটি যেমন সুপ্রযুক্ত তেমনই ব্যঞ্জনাময়; সেটা ছিল শুভাশুভের দ্বন্দ্ব—

একালের শ্রেণী সংঘর্ষকেও তিনি ওই দুই শক্তির দ্বন্দ্ব হিসেবেই চিহ্নিত করতে চান, আর এখানে শুভশক্তির আধার হলো এই সর্বহারা শ্রেণী। তাই তিনি স্বদেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আবেগে বলেন,

বিড়ম্বিত জীবনে আবার
কুরুক্ষেত্র করাঘাত করে। (ঘোষণা)

অথবা নাৎসিদের বিরুদ্ধে রুশ সৈন্যদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের প্রসঙ্গেও শুভাশুভের দ্বন্দ্বের প্রতীকে ফিরে এসেছেন, "এমন কুরুক্ষেত্র ইতিহাস দেখেনি কখনো।" (স্টালিনগ্রাড) এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এ-বিষয়ে সংশয় নেই যে, শুভশক্তির জয় সর্বদা সর্বত্র অবশ্যম্ভাবী সেজন্যে আপন শ্রেণীর দুর্বলতা বা অক্ষমতায় তিনি মোহ্যমান হননি হতাশাতে, বরং তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছেন ভবিষ্যতের পথে এবং ভবিষ্যতের দিশা তিনি জেনে নিতে চান ইতিহাসের কাছ থেকে। তাঁর চেতনাতে ইতিহাসের ধারা ও তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস এক হয়ে রয়েছে।

ইতিহাসের কাছ থেকেই সুভাষ জেনেছেন যে বাকী সভ্যতার প্রাণ-শক্তি ফুরিয়ে এসেছে: "ধনতন্ত্রে নাভিশ্বাস" (দলভুক্ত): এবং তার পচনের বিষ থেকেই সম্ভব হয়েছে মহাযুদ্ধের বিপর্যয়, অথচ কংগ্রেসী নেতাদের কাছে সত্যটা ধরা পড়ছে না, তাই তাঁদের উদ্দেশে মাঝে-মাঝেই নিক্ষিপ্ত হয়েছে তাঁর বিদ্রূপ। কংগ্রেসী নেতাগণ যে এই সত্যের থেকে চোখ ফিরিয়ে রয়েছেন বা জেগে জেগে ঘুমোচ্ছেন এবং এখনও বণিকেরাই যে তাঁদের ভরসাস্থল, এতে সুভাষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে কংগ্রেসী গণতন্ত্র হবে পশ্চিমের বিনষ্ট বণিক সভ্যতার দেশী সংস্করণ।

তাই বলি, প্রিয়, হাত বদলে
আমাদের নেই সুখ অধিক। (বানপ্রস্থ)

এবং অন্যত্র তিনি খোলাখুলি সমাজের উচ্চতলে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মনের কথা ব্যক্ত করেছেন,

ইংরেজ প্রভুর নেত্রে সর্ষেফুল ? আমাদের হাতে আসবে রাজ্যভার ?
চমৎকার কিবা !
ধনীদের তো পোয়াবারো।

বিশেষত ভারতবর্ষে একচেটিয়া নেতা গান্ধী। গৌরীসেনী টাকা

ভবিষ্যৎ ভাবে ধ্রুব। মহাশয়—জমিদারী যায় যাক্! বণিকের মৌলিক প্রতিভা

দেশী শিল্পে মুক্তি পাবে।

এখানে স্মরণ রাখা যেতে পারে আজ থেকে কুড়ি বছর আগে এক জন কিশোরের লেখনী হতে এসব বাক্য নিঃসৃত হয়েছিল। ভবিষ্যৎ দৃষ্টি নিয়ে সুভাষ কাব্যচর্চা সুরু করেছেন; তদুপরি রয়েছে কাব্যের কলা-কৌশলে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব; অবশ্যি কৃতিত্ব বললে খুব কম করে বলা হয়, একে বলা উচিৎ তাঁর কীর্তি।

সুভাষের সমস্ত রচনাই যে সমান উচ্চাঙ্গের এমন কথা বলব না: আগেই বলেছি মামুলী রচনাও তিনি কিছু কিছু লিখেছেন এবং সেগুলির সম্বন্ধে কবির নিজের কোনও মোহ না থাকাই ভালো। কিন্তু যখন তিনি প্রেরণাহত হয়ে লেখেন তখনই বোঝা যায় যে আধুনিক বাংলা কবিতা উৎকর্ষের কোন্ স্তরে উঠতে সক্ষম। প্রকৃতপক্ষে সুভাষের কবিতার তাৎপর্য্য অনেকান্ত, তাতে ফুটে উঠেছে বুদ্ধিজীবীর দ্বিধা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক সংকট ও তদ্দরুন আর্তি, আবার সেই আর্তি হতে মুক্তি পাবার আকুতি, ইতিহাসের প্রবহমান ধারাকে অনুধাবন করার জন্যে কবির আন্তরিক প্রয়াস। আর এই প্রয়াসের প্রবল টানে ঘটে চলেছে তাঁর কাব্যের মৌল বিবর্তন, ফলে তাঁর কাব্য ধাপে ধাপে অধিকতর মানবিক হয়ে উঠেছে; কেননা ঠাট্টায় বিদ্রূপের এক ধরণের চাতুর্য প্রকাশ পায়, তাতে চমক লাগে বটে, কিন্তু তা দিয়ে মানুষ আর একজন মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতে পারে না। চাতুর্যটা ব্যক্তিগত জিনিষ, মানুষের থেকে তা মানুষকে পরিচ্ছন্ন করে রাখে এবং ব্যক্তিত্বের এই পরিখা পেরিয়ে যেতে পারে কেবল সেই গভীর বেদনা যা সকল মানুষের অনুভূতিতে নিহিত। "পদাতিক"-এর কোন কোন কবিতাতে এই বেদনা ধরা পড়েছে, যেমন "বধূ"তে। গোটা কবিতাটিতে ছড়িয়ে আছে আধুনিক নগর জীবনের যন্ত্রণা ও দীর্ঘশ্বাস, আবার কোন কোন পংক্তিতে—না, উপহাস নয়—প্রতিকূল ভাগ্যকে নিয়ে পরিহাস,

হঠাৎ গ্রাম হৃদয়ে দিল হানা
পড়লো মনে, খাসা জীবন সেথা। (বধূ)

এতে এই যন্ত্রণার অভিব্যক্তি হয়েছে আরও তীব্র, আরও করুণ, আরও মর্মান্তিক।

কিন্তু মনে হয় সুভাষ মুখোপাধ্যায় রাজনৈতিক আন্দোলনের সুবাদে দেশের মানুষের সঙ্গে, ব্যবধান যত কম করে এনেছেন ততই তাঁর কাব্যে কম হয়ে এসেছে ব্যঙ্গ করার অবকাশ ও দেশের মানুষের জীবনে যত বেশি পাকে পাকে জড়িয়ে পড়েছেন ততই আকুল হয়ে উঠেছেন তাদের দুর্দশায়। অবশ্যি এখানটাতেই তাঁর কাব্যের বিপদ-সীমানা। কেননা রাজনীতির জন্যেই তিনি মানুষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন কিন্তু যখনই তিনি রাজনীতিকেই রচনার অবলম্বন করে তুলেছেন তখন তা আর কাব্য থাকেনি, প্রথম পর্যায়ে নিজেকে সর্বহারাদের একজন কল্পনা করে তিনি যে পদ্যাবলী রচনা করেছেন সেগুলির মতোই পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর রাজনৈতিক রচনাও আসলে বাক্যের ছন্দোবদ্ধ বিন্যাস মাত্র। কারও কারও ক্ষেত্রে রাজনীতিও কাব্যের বিষয় হয়েছে বটে, সুভাষের প্রথম বয়সের রচনাতেও তা-ই হয়েছে, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর জন্যে রাজনীতির মূল্য কেবল সালিসের, তাঁর কবিতার উপকরণ যে-জনসাধারণ তার সঙ্গে কবির মধ্যস্থতা করাই তার কাজ, সেটুকু করার পরে রাজনীতির আর কোনও প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশাজনিত উপর্যোক্ত আকুলতাই তাঁর কাব্যে এনেছে শক্তি, এনেছে ঐশ্বর্য ; এবং সৌন্দর্য।

কম্যুনিস্ট পার্টির দৈনিকা 'স্বাধীনতা'-র সংবাদদাতা হিসেবে গত মহা-যুদ্ধের সময়ে সুভাষকে বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। পঞ্চাশের মন্বন্তরের যে-অভিজ্ঞতা তিনি এ সময়ে অর্জন করেছিলেন তাকে ধরে দিয়েছেন কবিতায়। সমসাময়িকতা, সরলতা, কবিত্ব প্রভৃতি অসবর্ণ ভাবগুলির একাংঙ্গে সন্নিবেশন যেমন বিরল তেমনই প্রীতিকর। আর এই সন্নিবেশনই দুর্ভিক্ষকালে রচিত সুভাষের কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য।

কবিতাগুলি সংখ্যায় স্বল্প, কিন্তু অতি সংকীর্ণ পরিসরে আশ্চর্য সংযমের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে এক বিপুল ট্র্যাজেডি। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কাতে কৃষকদের ঘোষণাতে রাজনীতিক প্ররোচনা থাকা অস্বাভাবিক নয় :

পেট জ্বলছে, ক্ষেত জ্বলছে
হুজুর, জেনে রাখুন

খাজনা এবার মাপ না হলে
জ্বলে উঠবে আগুন। (চিত্রকুট)

তথাপি এটা সম্পূর্ণও রাজনৈতিক উক্তি নয়, কেননা এটা এমন সর্ব-জনীনরূপে বাঁচা-মরার প্রশ্ন যে তা রাজনীতির চেয়ে অনেক বড়ো। দুর্ভিক্ষের মাত্রা যতই ক্রমে ক্রমে উচ্চে উঠেছে, বাঁচা-মরার সমস্যা হয়েছে প্রচণ্ডতর ততই রাজনীতির সমস্যা তুচ্ছ হয়ে গেছে। কোনও দল, কোনও মতবাদ আর তখন কবি ও কাব্যের উপকরণের মধ্যে নেই : অর্থাৎ কবির অভিজ্ঞা তখন জন্ম নিচ্ছে প্রত্যক্ষ তথা বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে।

পথের দুদিকে বাসা
বেঁধেছে কঙ্কাল ;
গ্রাম করে খাঁ খাঁ—
উঠোনের এক কোণে
শোকাচ্ছন্ন পড়ে থাকে
ভগ্নদূত শাঁখা। (এই আশ্বিনে)

বর্ণনার কোনও বাহুল্য নেই ; শুধু পাঠকের সামনে এগিয়ে দিয়েছেন কতকগুলি সংকেত, কতকগুলি আভাস, তারপরে পাঠকের কাছে দাবী করেছেন সেই সংকেত আভাস অবলম্বনে ওই সমূহ সর্বনাশের স্বরূপ কল্পনা করে নেওয়ার। পাঠকের কাছে দাবী করেন তাদের কল্পনাকে। সুভাষের উদ্দেশ্য একটি বিশেষ ভাবনা সম্পর্কিত কয়েকটি চিত্রকে উপ-স্থাপন করা ও কুমোরের চাকার উপরে রক্ষিত কাদার ডেলা যেমন শিল্পীর অঙ্গুলিস্পর্শে নানা রূপ পায় অবিকল তেমনইভাবে ওই বিশেষ ভাবনার তাপে তাঁর কবিতার শরীরে ফুটে ওঠে ওইসব চিত্র। ভাবনাটি এমন এক আবহাওয়া সৃষ্টি করে যেখানে ওই সব চিত্র নিজের থেকে জন্মলাভ করে এবং ভাবনার সেই জগতে প্রবেশ করলে পাঠকের কল্পনাও সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাই "ভগ্নদূত শাখা-"র অনুষঙ্গে আরও চিত্র আসে,

শোকাকুল সন্ধ্যাকাশে মোছা
এয়োতির আরাধ্য সিঁদুর।
ক্ষমা নেই—
এ আশ্বিন স্মৃতিভারাতুর। (এই আশ্বিনে)

একদা আমাদের গ্রামীণ জীবনে যে অন্তরঙ্গ নিবিড় মাধুরী ছিল তারই স্মৃতিতে "স্বাগত" কবিতাটি ভরপুর। কিংবা পথের ধারে মৃতদেহ দেখে তাঁর মনে পড়ে যায়,

উৎকর্ণ ফসল বারবার
শুনেছিল ওর পদধ্বনি ;
চোখে ছিল আগন্তুক দিনের উচ্ছ্বাস,
হাতের মুঠোয় ছিল ঐশ্বর্যের খনি
বুক জোড়া বিপুল বিশ্বাস—
ওর কাছে ঋণগ্রস্ত আমার ধমনী, (স্বাক্ষর)

একটি শব্দ, "উৎকর্ণ", অথবা "আগন্তুক", অনেক প্রতীক্ষা, অনেক প্রত্যাশাকে প্রকাশ করছে, অথচ একদা "চোখে ছিল আগন্তুক দিনের উচ্ছ্বাস", আজ সে পথের ধারে মরে পড়ে আছে, তার "চোখে তীব্র অভিযোগ," আজ "ভিক্ষাপাত্রে দুটি হাত স্থির", কিন্তু একদা তার "হাতের মুঠোয় ছিল ঐশ্বর্য্যের খনি।" এই মৃতের চিত্র ফুটে উঠেছে কেবল একটি বর্ণনায়, "ঠোঁটে তার বিস্ফারিত ক্ষুধিত আত্মার কঠিন দন্তুর অভিশাপ।" কী জীবন্ত একখানি ছবি। তারপরেই কবির নিদারুণ মন্তব্য,

বাৎসল্য নিহত, প্রেম পরাভূত—
দন্ত কুটি কুটি।
ছিন্ন ভিন্ন উদ্বাস্তু সংসার ;
মর্মন্তুদ দগ্ধ এ মেদিনী। (স্বাক্ষর)

আবেগে প্রচণ্ড, চিত্রকল্পে সমৃদ্ধ, স্মৃতি জলন্ত এই কবিতাগুলি রচনা করতে করতেই সুভাষের কবিদৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে অন্য এক ছবি :

পথে পথে পদশব্দ ওঠে,
আকাশে নক্ষত্র ফোটে ;
নদী করে সম্ভাষণ, পাখী করে গান,
মাঠের সম্রাট দেখে মুগ্ধ নেত্রে
ধান আর ধান। (স্বাগত)

এই "সম্রাট" আর কেউ নয়, আজকের নিঃস্ব বঞ্চিত দুর্ভিক্ষের শীকার কৃষক। এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিসত্তার এটা একটা

অপূর্বতা যে সমস্ত ধ্বংস ও বিশ্বাস, সমস্ত ক্ষয় ও ক্ষতির উর্ধ্বে রয়েছে আকাশ প্রদীপের মতো অম্লান অকম্প বিশ্বাস। সেটা কোনও রাজনৈতিক বিশ্বাস নয়, বলা যেতে পারে মানুষের মহত্ত্বের প্রতি বিশ্বাস; ওই বিশ্বাস তাঁকে দিয়েছে সেই দৃষ্টি যাতে কৃষকও হয়ে ওঠে "সম্রাট", মানুষের উপর আধিপত্য সম্পন্ন সম্রাট নয়, সে যেন রূপকথার এক চরিত্র, কল্পনায় ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, অভিভূত। মানুষের মহত্ত্বের প্রতি এই বিশ্বাস বশেই তিনি বলতে পারেন, "যে দেহে প্রাণ, জীবন দেবে বরমাল্য তাকে" (ঝড় আসছে)। একই বিশ্বাসে তিনি ডাক দেন,

যাতে উদ্বেলিত মিছিলে একটি মুখ দেহ পায়
আর সমস্ত পৃথিবীর শৃঙ্খলমুক্ত ভালবাসা
দুটি হৃদয়ের সেতুপথে
পারাপার করতে পারে। (মিছিলের মুখ)

পরের কারণে আত্মত্যাগ, মানুষের প্রতি মানুষের সহৃদয়তা ও অনুভব, পারস্পারিক হার্দ্য যোগাযোগ প্রভৃতি সম্পর্কও সুভাষ বিশেষ মূল্যবান মনে করেন এবং তিনি এগুলিকে গৌরবান্বিত করেছেন। অর্থাৎ তাঁর লক্ষ্য মানুষের হৃদয় ও হৃদয়গত সম্পর্কাবলী।

যেহেতু ছন্দ উপমা অলঙ্কার প্রভৃতি বাক্যের বহিরঙ্গ তাই সুভাষের কবিতা হৃদয়স্পর্শী হতে গিয়ে এসব লক্ষণকে বর্জন করেছে। তাঁর সাম্প্রতিক কাব্য সম্পূর্ণ সরল, আরও অন্তরঙ্গ এবং প্রেমিক-প্রেমিকার আলাপের মতই এসব কবিতায় তাঁর স্বর নত ও নম্র। একদিন কবিকে দেখে মনে হতে পারত,

পুড়ে পুড়ে ছাই হবে সেই আত্মক্ষয়ী আগুন
হয়ত
দাউ দাউ দাবাগ্নিশিখায়
অনারণ্যকে পুড়িয়ে মারবে। (অয়মণি, স্থির হও)

কিন্তু যেমন নরকের ভিতর দিয়ে ফাউস্‌ট বেরিয়ে এসেছিল প্রেমের বেদনায় পরিশুদ্ধ হয়ে তেমনই সুভাষের সাম্প্রতিক কবিতাতেও রয়েছে সেই পরিশুদ্ধতা,

এই পৃথিবীতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে,

দেখ,
আমি জটায় বাঁধছি
বেদনার আকাশগঙ্গা। (জয়মণি, স্থির হও)

"আত্মক্ষরী আগুনের" ধ্বংশ-শক্তি ছিল যার মধ্যে শেষ পর্যন্ত সে সেই শক্তিকে পরিবর্তিত করে "বেদনার আকাশগঙ্গাকে" জটায় বাঁধে। আবার ফাউস্‌ট যেরকম মানুষের প্রতি প্রেমে সমুদ্রে বাঁধ দেয়, আপন কল্যাণকর্ম সম্পাদনের অন্তে মৃত্যুকে বরণ করে, উত্তরসূরীদের হস্তে আপন আদর্শকে অর্পণ করে অনুরূপভাবেই সুভাসও শুনতে পান "হিরণ্যগর্ভ দিনের" আহ্বান, বলেন

আমি শেষবারের মতো
মাটিতে পড়ে যাবার আগে
আমার ভালোবাসাগুলোকে
নিরাপদে তার হাতে
পৌঁছে দিতে চাই। (এখন ভাবনা)

এইটুকু কবির শেষ আশা।

তিনটি কবিতা

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কামরাঙা ডালে

কামরাঙা ডালে দুপুর বেলায়
বোনের শরীরে আবির মাখছে
ভাই টিয়া পাখী।···'কামরাঙা ফল
কেমন মিষ্টি খেয়ে দেখ সোনা'!

'ছায়া নেবে, ছায়া নেবে গো'!—হাঁকছে
পসারী বিকেল। সারা দেহে তার
শীতল ক্লান্তি।···'ও বিকেল, তুমি
লক্ষী ছেলেটি, এখানে এসো না'॥

জাতক

হয়তো তুমি ভোর রাতের মুখ দেখেছো
হয়তো সেই নারী
দিঘির মতো তনুতে তার মৃণাল নিয়ে
রক্তে শুয়েছিলো
যেমন দিঘি সূর্যোদয়ে নিবিড় শুয়ে থাকে।

হয়তো তার স্তনের বোঁটা পদ্মফুল
নিয়েছো মুখে তুলে
চোখের জল ভুলে থাকার কঠিন পিপাসায়।

কিন্তু কুয়াসায়
তোমার মন কাছে থেকেও অনেক দূর, আমি

তিনটি কবিতা

জ্যোতিষী নই, অবাক হ'য়ে স্মৃতির মুখ ভাবি
নবজাতক অবোধ শুকতারা ॥

কালের তমাল

(বরিস পাস্তেরনাক-কে নিবেদিত)

মুখ তার কুয়াশার কান্না, মৃত আলোর প্রার্থনা
বিষণ্ণ শিশিরে ভেজা শূন্য মাঠে একাকী তমাল
জানায় পিতাকে, মৃত ঈশ্বরের নাম ধরে ডাকে
উন্মাদ শীতের রাত্রে।—কোথা পুনর্জন্মের অচেনা

শিশুর প্রতীক্ষা কাঁপছে ইতিহাসে, ভোরের প্রজ্ঞায়
জন্ম নিচ্ছে বোধিবৃক্ষ ? কিন্তু মন জানে অতীতের
প্রতিটি মুহূর্ত শবযাত্রা আর সে মন্ত্র অঙ্গার
যার স্পর্শে ল্যাজারাস সোনা মাটি ধান ফিরে পায়

গর্ভের তিমিরে চলে যেতে যেতে ; আবার আকাশে
মুখ তোলে অমর বৃক্ষ যার গুণে। আসন্ন প্রলয়ে
মন জানে সকলি অলবে, ফল ফুল পাখীর বাসার
অস্পষ্ট জীবন-বেদ। তবু গান, ভোরের চেতনা

শীতের হাওয়ায় সন্তর্পণে তার কান্নাভেজা মুখ
বুকে নেয় ; আসঙ্গের স্পর্শে সারে কঠিন অসুখ ॥

সহবাস

নদীকে আমি দেখেছিলাম, সে তখন সমুদ্রের সঙ্গে এক হচ্ছিলো। সমস্ত মুখ তার ভরে গেছে লবণের ঝাপ্‌টায়, দু-চোখ অন্ধ, আর স্তনচূড়ার মাঝখানের সমতলটুকু মনে হচ্ছিলো সমুদ্রের আলিঙ্গনে ভেঙে যাবে। কিন্তু নদীর তখন কোনো বোধ ছিলো না, সে তার পলিমাটির প্রশান্ত স্বপ্নকে ছাড়িয়ে এসে

তবু কেমন যেন শান্ত, যেন জানু পেতে মন্ত্রপাঠ করছে। সঙ্গমের যন্ত্রণাও যে মন্ত্র হয়, নদীকে দেখে এক মুহূর্ত আমার সে অনুভব হয়েছিলো॥

পাহাড়কে আমি দেখেছিলাম, সে তখন রাত্রির সঙ্গে এক হচ্ছিলো। তার সর্বাঙ্গ এক স্থির অন্ধকারের মতো মনে হয়েছিলো, যেন কোনোদিন ঘুমের বিছানা থেকে সে আর উঠে আসবে না। সে চুপচাপ শুয়েছিলো, রাত্রির অস্থির আলিঙ্গনে তার দিক থেকে কোনো সাড়াশব্দই আসছিলো না। আমার মনে হচ্ছিলো, সে মরে যাচ্ছে···আর, সমুদ্রের চেয়ে কতো পৃথক এই পাহাড়, অথচ পুরুষ! রাত্রি তার কানেকানে অনেক কথাই বলছিলো, কিন্তু সে ধ্যানস্থ, যেন অন্য এক চেতনায়। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না সঙ্গমের যন্ত্রণা এমন ভাবে অস্বীকৃত হতে পারে॥

আর, আয়নায় দেখি আমি, অনেক রাত্রির তৃষ্ণায় জ্বলে যাওয়া দুটি নিষ্ফল দেহ, আমি আর আমার ভাবনা যখন পরস্পরকে কাছে টানি, পরস্পরের নাম ধরে ডাকি। আমি সুচেতনায় কোথাও নির্মল জল পাই নি। কোথাও নদীকে পলিমাটির মতো মনে হয়নি আমার কিম্বা রাত্রিকে সহজ অধিকারের মতো, যখন মুহূর্তগুলিতে পারিজাত ফুলের উপমা খুঁজে তাদের ছড়িয়ে দিতাম আমার বিছানায়, যখন তার জন্য আমি প্রতীক্ষা করতাম।···আমার ভাবনা এক বিচিত্র নারীর হৃদয়! লগ্নের শেষে অভিসারিকার অপূর্ব শরীর নিয়ে সে আসে, বুকে মাথা রাখে।···আর ক্লান্তির স্পর্শে আমার সর্বাঙ্গ অঙ্গার হয়ে যায়! আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরি, শীতের রাত কাটাই, এক তিমির থেকে অন্য এক তিমিরের মৃত গহ্বরের মধ্যে॥

সংলাপ

মানস রায়চৌধুরী

আজকাল সুন্দরীরা সারাক্ষণ যেসব ভাষায় কথা বলে,
এবং যে অর্থ ফোটে অহরহ ভ্রূ-বিলাসে দৃষ্টির তরলে
হায়রে জড়ধী আমি তার এক বিন্দুও বুঝিনা,
হয়তো জটিল ভাব, ভিন্ন ভাষা, জানা নেই গ্রীক হিব্রু কিনা।

বিষয় দুরূহ, তাই নির্বোধের মত নিশিদিন
শুধু এক পাংশু হাসি আননে রেখেছি আমি ধরে
পাছে কেউ মনে করে এ লোকটা মূঢ় অর্বাচীন
সেজন্য কদাচ শব্দ ফোটাইনা পৃথুল অধরে।

অথচ বয়সধর্ম মাঝে মাঝে হৃৎপিণ্ডে হাহাকার আনে
দীর্ঘশ্বাস গুপ্ত রেখে হেরি মধু উৎসবের ছবি
আমন্ত্রিত শুধু শিল্পী, রূপবান সুরকার কৃতকর্মা কবি
নির্গুণ কেমনে যাই লীলাবতীদের ফুল্ল গোলাপ বাগানে।

বিধাতাকে ধন্য মানি, ভাগ্যে তুমি হওনি সুন্দরী
অধরা অপ্সরাদের সমগোত্র, কিম্বা চিরপ্রসাধিত পরী
প্রাকৃত ভাষায় বলো অর্থ তাই বুঝি সহজেই
ভুল সুরে গান গাও শান্তি আসে নির্বোধের প্রাণে
যুবতীরা বক্র হাসে, যেই শোনে আলিঙ্গনে তোমার সদৃশ কেউ নেই
বিদ্রুপের সব তীর রুধি আমি, তোমার অর্পিত বর্মে, দৃঢ় শিরস্ত্রাণে।

নস্‌ট্যাল্‌জিয়া

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

স্পন্দিত জানলার পাশে স্নিগ্ধ গাছ তুমি
ছোটোবেলাকার নাম জানো ? ছোটোবেলার খেলার মাঠ
হলুদ জামার ধুলো, খুচ্‌রো নীল কাঁচ, তারা গোনা ;
এলোমেলো অকারণ বৃষ্টির মৌসুমী,
ওপারে ছাদের আলো, পায়রা-ওড়া সুনীল, স্বরাট ।
কিংবা কোনো আষাঢ়ায় প্রবাহিত কূল, খড়—জলে সাঁকো বোনা ।

নিজস্ব বাঁচার রেখা, উপকথা, জ্যোৎস্নার মতোন পাহাড়ে ।
দূরে দূরে রোদ্দুরের আনন্দিত বাড়ি,
বারান্দার নন্দিত বিতান, লাল টালি
শীতের সকালে মাকে দেখতাম বাগানের ধারে
কমলা শালের রঙে প্লাবিত উজ্জ্বল
একা একা বেড়াতেন ;
ধু-ধু করা দর্পনের আশ্চর্য দু-কালি
ঝলকাতো আকাশে মাটিতে সেই মন্ত্রের প্রবল
পড়ার টেবিলে আমি নিষ্পলক, যেতাম সোনার বালিয়াড়ি ।
কিন্তু দেখ কিছু নেই, কেউ নেই । দম-চাপা নষ্টজল, খাড়ি ।

অনিকেত সঞ্চয়ের হাওয়া,
তোরঙ্গের পুরোনো সে পশমের জামা
এতোটুকু হয়ে গেছে । এবং নিয়মী আসা-যাওয়া
শিকড়ে বেড়েছে মাত্র । শরীরের আলোগুলো দিন গুনে গুনে
আমাকে আমার মধ্যে
নিয়ে যাবে কবে এক অভিজ্ঞ আগুনে ।

নস্‌ট্যাল্‌জিয়া

সকল জনম ভ'রে কোনোখানে নদী ছিলো মগ্ন দরদিয়া।
স্পন্দিত জানলার পাশে এখনো কে অনির্দেশ হাঁটে ;
শার্সি বেয়ে ঋতু চলে ; বৃষ্টি, রোদ। অবিকল আঙুল কপাটে
নিষ্পলক চোখ রাখি।
ছোটোবেলাকার নাম বলো, সহজিয়া !

আমরা

সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়

দূরত্ব যখন দূর নয়—হৃদয় আমাদের বিচিত্র নদীর সেতু।
স্বপ্নে আমরা অনেক সুন্দর মুখের উজ্জ্বলতা ছুঁয়ে এলাম।
যত দূরে যাই শীতের মেঘলা রোদ—অঘ্রাণের ধান কাটা মাঠ
আর সেসব দ্বীপের অসহ্য হাওয়া—বার বার আমরা ফিরে
তাকালাম।

যাইনা যতদূরে—থাকবে বুড়ি পিসিমার নক্সি কাঁথা
নীল নীল ফোর তোলা আমাদের কিশোর বেলার আলো—
হারাব না তো কিছু···একটু রাঙতা ভেঙে যাওয়া কান
মাটির গাধার,—সব রইবে। খুঁজলে মিলবে বলে যুদ্ধে
ফেরত দূরদেশী বন্ধুর সেই নীল চিঠিটুকু—আর
সাইপ্রাসের হাওয়ার রোদন।—যাকনা মেলা শেষ হয়ে—
পৌষ তো ফিরবে আবার—সোনার গা বেয়ে খেজুর চুইবে
রঙ ঝলমল রোদ্দুরে। সেই সব গাছ ঝাকরা মাথা দোলাবে
দূরে দূরে—দেখা যাবে চেনা ফিঙে তেমনি দুলছে তারে
একটা মহৎ শূন্যতা যেসব বিন্দুতে পূর্ণ হবে—তারই
কটা মুহূর্ত—বড় মৃদু আলো।

গাগরী ভরণে

প্রকৃতি ভট্টাচার্য

(আরতি দাস শ্রদ্ধাস্পদেষু)

নীলের কাঁথালে মেঘ তুলে দূর পাড়ি দিতে বড়
ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে। পড়নে মেঘের শাড়ি বেশ।
নানা রঙে মন রাঙে ; আকাশে আকাশে জল ছেনে
জলরঙ ঘাঘরায় শরীরে মানান যদি হয়
তাহলে আমার ছবি আভরণে সার্থক সুন্দর ;
চল সই, চল যাই মেঘে মেঘে গাগরী ভরণে।

নীচের জলের মধ্যে রঙ্গিলা আকাশ দুপুরের—
তাতে কি যেন কি সব কালো কালো অক্ষিবিন্দু,
সেই মত দৃষ্টি তার উচ্ছিন্ন আমাকে ছেঁকে ফেলে।
তারপর নীল ক্ষেত, প্রেমিক বিছানা পাতে মাঠে।
এই সব দেখে শুনে বিরাট সংসারটাকে ফেলে
কোথায় যাব না আমি ; সাধ শুধু গাগরী ভরণে॥

শিল্প

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

বিবাহ গন্ধর্ব মতে। চিত্তে শুধু নির্জনতা ছিল
আর তুমি,—আলো বিশ্ববতী।
হরিদ্রা সিন্দুর চূর্ণ জলে ভাসছে, বধূ নতমুখী
গোধূলি নয়ন তুলেছিল।
প্রণয় বিস্মিত কবে, কখন নয়ন তোলে নয়ন জানেনা।

গোধূলি, তোমার মতো রাত্রি বুঝি ঘরের বাহির

শিল্প

কন্যার সন্ধানে আসে—
দপ করে দুটি চোখ জ্বলে উঠল উত্তর আকাশে।
দিন একটি শাদা গাভী ঘরে ফেরে একা অন্ধকারে।

বক্ষের নিরালা নিম্নে নিদ্রা যাও ; কঠোর জননী
ঘুরে যাবে সাতবার আমার সম্মুখে ; বলে দেব
"হরিদ্রা সিন্দুরচূর্ণ জলে একটি হলুদ রূপসী
স্নান করে ফিরে গেছে। তোমার কন্যা কি ?"
চতুর্দিকে ক্রুদ্ধ চোখ জ্বলে উঠবে বিপুল আকাশে।

পরে ফিরে যাবো গৃহে, সঙ্গে তুমি গৈরিক বধূটি
কোলে দুলবে ছোট্ট উষা ; পৃথিবীতে জানি
সকলে সন্তান ভালবাসে।

ঘর

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

বড়ো সুখের ঘর গড়েছি ; সুখ
এখন একা খেলা করবে চতুর্দিক
এমন দিন আকাশে ঘোরে এমন দিন
একটি দুটি পাখীর ঠোঁটে আয়ুর ক্ষণ।

আহা কেমন ঘর গড়েছি ; রাত
সাপের মতো খেলা করবে, খেলা করবে ;
কোথায় গুহা ? ডাকছে দূরে অচিন বাঁক !

এ সব সুখে তল মেলেনা জল ভাঙ্গলে।

উত্তরস্থরী

দেখ, আড়ালে ঘর দাঁড়ালো—ঘর,
বাগান এক তুলতে দেবে ফুল
অনেক ফুলে খেলবে সাপ—এমন পাপ পারো ?
(জটিল হ্রদে ডুক্কা দিয়ে দুঃখ যেন পাখী)

চিরদিনের দক্ষিণের আকাশ মনে রাখি ॥

পাতাল থেকে ডাকছি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

স্পর্দ্ধার মৃত্যুই শ্রেয়। তুমি ভ্রান্ত পুণ্যের কৌতুকে
আমারে নিতেছো টানি, আলিঙ্গনবিহীন দুর্গম।
বামে বা দক্ষিণে, আহা প্রেম দুঃস্থ পাংশু রসাতল···
উপস্থিত ব্যাধি, পোকা, কৃমি, পূঁজ, রক্তপাত বুকে
আমারে ভালই বাসে !
নরক, নরক ওরা বলে তারে চীৎকৃত সমীহে,
বরং দূরেই রয়। রম্য, লীঢ় সম্পত্তি সম্ভৃত,
শুকনো, সুখী, সামাজিক ; অতিকায় দুঃস্বপ্নে বিলীন
হে ম্লান আপ্লুত ওষ্ঠ, ব্যথাতুর, ক্রমশঃ সংহত···
নির্মম স্মারকে, শৈলে, হরিদ্রাভ দুর্গন্ধে বিরল
উজ্জ্বল সুস্থের স্পর্দ্ধা।
এই স্পর্দ্ধা শূন্যে মেবে ছেনে
এত বড় কারিকর ? ডৌল ভেঙ্গে রহস্যে নবীন
নিয়ে যাবে যেন নিশা প্রলোভে পাখীরে
কুলায় উষ্ণতা থেকে দেশান্তরে, বিরহে, বিনাশে···
অক্ষয় নিদ্রায়।
প্রিয়তম, রাখো আস্থ এনে
আমার পাতালে, বুকে, উপভোগ আরণ্যক মূলে।

পাতাল থেকে ডাকছি

ভীষণ সৌন্দর্য···দেখ পাপ, আহা অত্যুজ্জ্বল পাপ,
স্ফটিক হে আদিনাগ, পলাশ মণ্ডিত কেশমালা,
শ্বেততম উষ্ণচর, হে স্ফীতি, হে মহান প্রলয়
আসন্ন কোরক বিশ্বে এই-ই মাত্র ভাস্কর্য পাতাল।

মোড় ঘুরলে আবার মোড়

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

মোড় ঘুরবে ভেবেছিলে এতদিন এতরাত্রি ধরে—
অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে নক্ষত্রবধের সাধনায়
হাত পাকিয়েছে কোনো পাড়ার দুরন্ত ছেলে, ওরে,
ইচ্ছা তার পূর্ণ হল কানায় কানায় ?

মোড় ঘুরতে দেখতে পেলে আবার ভিড়ের মাথাগুলি,
তালগাছে কণ্ঠলগ্ন বিষময় মণ্ডপ তৃষ্ণার,
পায়ে পায়ে জড়িয়েছে বকুল, কেমন করে ভুলি
দেয়ালের আরণ্যকে ডুবে গেল নদীর সংসার ;

তুমি শুধু আশা নিয়ে বসেছিলে দেখা হবে বলে,
তোমার সোষিত স্বপ্ন গাছের হাওয়ার মত উড়ে
ফোটাবে ফুলের গন্ধ, দেখাবে ফলের অন্তঃপুরে
রঙের নিপুণ কাজ সুন্দর বৃন্তের পায়ে দোলে ;

মোড় ঘুরে ঘুরে যায় ছয় ঋতু বিপুল দুপুর
তুমিও ত এইভাবে শুনতে পাবে জীবনের সুর ॥

ইতিহাস

আলোক সরকার

ভোরবেলা প্রার্থনার মতো ক'রে চেয়েছিলে অমল আকাশ
শান্ত সমারোহ। আর সাহজিক যেন বাড়ি ফেরা।
সারাদিন তন্ময়তা অরব প্রার্থনা নীল নদীর বিশ্বাস
এবং বিকেলবেলা আকাঙ্ক্ষিত যেন উন্মোচিত
বুঝিবা প্রস্তুতি এক, আলো স্বতঃস্ফূর্ত অন্ধকার ;
দীপ্ত যন্ত্রণার সে-ও প্রার্থনায় বিনিময় শব্দহীন প্রীত।
হাওয়ার গতির মধ্যে অন্তমন আপন সংসার
সহজ বিস্তৃত আর পীত ছায়া স্পষ্ট আত্মীয়তা।

হাওয়ায় গাছের পাতা ওঠে বকুলগাছের নিচে
খুব ছায়া দিলো এক স্বাভাবিক যেন ভোরবেলা।
যেন সেই ছাদের উপরে ফুলদানি, দু-টি ফুল, সম্পন্ন স্বদেশ,
যেন সেই আলো-জ্বলা ঘর আর অভিমানী প্রীত অবহেলা।
সমস্ত সময় ফুল হেমন্তের প্রান্তরের ধু-ধু নির্নিমেষ।

এবং স্পষ্টত যাও বিকেলবেলার আবশ্যিক ভিড়ে :
নীতির বিকৃত ব্যবহার, পরিত্যক্ত বয়সের উজ্জ্বলতা
মৃত্যু, চৈত্র, যুদ্ধের প্রস্তুতি। ফুটপাথ পার হ'য়ে
ট্রামলাইনের কাছে এলে খুব জ্যোৎস্না, প্রবাহিত কথা
দেখবে প্রসন্ন চোখ মূর্ত প্রতিশ্রুতি আর স্বাভাবিক ভয়ে
একটি মুহূর্তের শুধু এক মুহূর্তের সমাহার।
গভীর গহ্বর আর বিকেলবেলার আর ক্রমশ ম্লানতা
হীরার খনির নাকি পরিবর্তিত ভোর, কৃষ্ণচূড়া আতত সম্ভার।

যে তারাটা জ্বলছে

শান্তি লাহিড়ী

তারাটা ফুটত যদি, একাকিনী হরিণীর মত
সমস্ত পৃথিবী চেয়ে থাকত ওর সূক্ষ্ম কল্পনাতে ;
তারাটা নিভত যদি—আকাশটা আরো কালো হ'ত,
দিগন্ত পড়ত ধরা দুচোখের মণিতে মণিতে।
তবু বলব অন্ধকার ভাল ছিল। পাতারা নীরবে
আপন মহুয়া-গন্ধে অনায়াসে থাকত মুড়ি দিয়ে,
কখন যে ভোর হত, লাল হয়ে সূর্য উঠত কবে !
কখন পৌষের সন্ধ্যা চলে যেত ! অনুভূতি দিয়ে
বুঝেও তাকিয়ে দেখত, তবে বুঝি এখনো রাতের
অনেক প্রহর বাকি। ময়ূরেরা এখনো দেহের
ভারী লোমে মুখ গুজে উষ্ণ হয়। দূরে পলাশের
ডালে ডালে ঝিকিমিকি কুয়াশার ঢাকা। দিগন্তের
দৃশ্যপটে নিভত যদি—যে তারাটা জ্বলছে এখনো।

সবটুকু অনুভূতি সারা দেহে এখনো প্রখর,
আলোতে বাড়াই হাত নিজেকেই ধরে ফেলি যেন—
ভয়, দ্বিধা, প্রয়োজন, কোনটা মানব ? চাপা কণ্ঠস্বর,
কেউ যদি শুনে ফেলে, দেখে ফেলে মণিকোঠা থেকে
নিজের সঞ্চিত ধন তুলে নিতে সঙ্কোচে জড়িত,
সমস্ত পৃথিবী থাকত, আকাশটা থাকত অন্তলোকে,
আমিও থাকতাম, শুধু তারাটাই যদি নিভে যেত।

শিল্প

শংকর চট্টোপাধ্যায়

ধরতে কি পারবে কখনো
দুঃখ তার প্রেমিক পটুয়া
প্রসন্ন প্রত্যুষে জেগে প্রাঙ্গনের কোলে
তন্ময় আঙুলে নেড়েচেরে
বিকল্প প্রতীকে।
ছন্দ ভাঙ্গে, ছাঁচ গড়ে, পরতে পরতে
মমতার প্রাণ তপ্ত হয়ে গলে
রূপে তৃপ্ত অরূপ কল্পনা।

সুন্দরের স্পর্শ পেয়ে সেতো
ভুলে যায় যে আছে গোপনে
যে আছে প্রতীক্ষাম্লান হয়ে
অলক্ষ্যে, বধির নির্জনে—মগ্ন ধ্যানে
কখনো বা অশ্রুসিক্ত শোকে।
সে তো বঙ্কিম ভঙ্গীতে ধরে
চঞ্চল চপল দেহরেখা
পায় নক্সা রঙ
দৃষ্টির নিবিড় উতলতা
পূর্ণ করে দোষত্রুটি, যত্নে যৌতুকে।

তারপর মাটির পুতুল
মেলায় বিকিয়ে গেল স্বল্প দামে
কিন্তু দেখে প্রেমিক পটুয়া
মূর্তি তার চিত্তে চিহ্নিত।

বিষণ্ণতা, প্রথম প্রণয়

কমলেশ চক্রবর্তী

বিষণ্ণতার সাথে যেদিন প্রথম প্রণয় হবে
আগন্তুক পরম চাওয়া, দহন জ্বালা, মরমী,
অভ্র রেণু বর্ণকেশ নহে, মাছের হৃদয়ে
তথা শিবার উচ্চকিত পরম তোজ্য ভ্রমি।

সেকাল ছিল। দশক কয়, বিগত কাল সে বটে
সরল চোখে কুপিত দিঠি, পাতকী নরক জুড়ে
কোটাতে নারি মন্ত্রপুত কদম্ব মাটির ঘটে
নিরয়ে ছিল যা প্রচলিত, অধুনা ভাষার সুরে।

বিমুখ গগন পূর্ণ হবে এমন আশাও নহে,
আশা কী সখি, চাহিনা ফিরে সে সব দিন: স্মৃতি!
প্রণয়ে ছিল প্রতিমা কত ডুবেছে তারাও, ওহে
গগন দেখে মুকুরে মুখ, প্রবাহ খোঁজে নিভৃতি।

বিষণ্ণতা, আমি কী তোমার? (প্রণয়ে পরম সুখ)
হৃদয়ে যাহা পেয়েছি আজ: মুকুরে আমার মুখ॥

বলার টানে

রণজিৎ সিংহ

বলার টানে এসে কতোবার ঘুরে ঘুরে ফিরে যাই। রুদ্ধ দোরগোড়ায়
মাথা কুটে মরছে অতিষ্ঠ সময়। দোর খোলো:
বলবো অসহ দুঃখের কথা। অনাহার উপবাসের কথা। বারবার
মরে যাওয়ার কথা।

উত্তরশ্বরী

ওই দশ আঙুলের বরাভয়ে এই রক্তাক্ত হৃদয়কে তুলে
দিলেই আমার শান্তি। আর কেন। তুমিই দাও তাকে
আকাশ মাটির অবয়ব।
আমি যে দাউদাউ মাঠের বিস্তার পার হয়ে এলাম।
পাহাড়ের পোড়া নিঃশ্বাস শূন্যের নীল গায়ের আঁজলায়
নিয়ে নিলাম। আমার ধমনীতে লাগলো সমুদ্র দেখার
বিস্ময়।
এবার তুমি তাকে বুকে টানো।

সংলাপ

দিলীপ রায়

আমার নিঃশেষ হ'য়ে যাবার
ক্লান্ত অস্থিরতাকে ক্ষমা করো
যখন অতিক্রম করেছি
অনলবর্ষি আরণ্যক ভয়
যখন আকাশের ভ্রূকুটির সঙ্গে
এবং দারিদ্রে দানবের হাত
মিলিত হয়েছিল।
যখন
সকলে শুধু অস্পষ্ট কথার প্রতিধ্বনিতে
সাগর পাহাড় মুখরিত ক'রে
বলেছিলো 'সুন্দরকে তুমি সঙ্গে এনেছো'

তখন পুষ্পিত স্তবকে প্রফুল্ল নারীর
অধরের স্পর্শ শিহরিত করেছিল তাকে,
তখন বজ্রের দীপ্ত মশাল
সমস্তকে গম্ভীর আওয়াজে বিদীর্ণ করেনি।
তখন সে
বসন্তের গান করে বিকশিত হল হাসিতে॥

অপরোক্ষ

দীপক মজুমদার

দেখলাম অসংখ্য কীটে সর্বাঙ্গ ছড়িয়ে গেছে তার
বৃন্তাগ্রে হরিৎ ফুল হৃদয়ে গন্ধের মৃদু ভার
দৃশ্য করা পিরীচের স্মৃতিময় অন্তিম আভাস
চতুর্দিক ঘিরে রচে অনিশ্চয় আত্মার বিলাস।

এক একটা অদ্ভুত পাতা চোখে পড়ে মূক গোধূলিতে
যাদের অস্তিত্বমূল্য ক্রমলুপ্ত স্বপ্নের নিশীথে
তারা যাবে ইতস্তত অবিশ্বাস নিয়ে দূরে আছে
আমি ধীরে ধীরে যাই কীটদুষ্ট মাতালির কাছে।

শহরের নির্বিকার ধর্মময় ছায়াচ্ছন্ন পথে
নিঃস্ব পরাজিত প্রেম যাত্রা করে অশ্বহীন রথে
চেনা বা অচেনা সব জীবিত সুধীরা থাকে ঘরে
তাদের প্রচ্ছন্ন শান্তি মাতালের মৃত্যু দেখবে পরে।

নির্মম মুহূর্ত সেই, আজও সে জন্মের মত ভয়
যখন দুহাতে ধরি কমলের সামাগ্রিক ক্ষয়
দুই ওষ্ঠে রাখি তার পাপ, শোক, মুকুলিত স্রাব
প্লুত চেতনার স্রোতে মাতে চন্দ্র কলঙ্ক-স্বভাব।

কোথায় হরেক কীট, জীবন, হরিৎবর্ণ ফুল
পাতাগুলি উড়ে গেছে নির্বিকার ঈশ্বরের ভুল
বাঁচি শুধু আমি আর স্মৃতি কিম্বা বাসনার ফল
কোষে সংবিদের রস অপরোক্ষ সম্ভোগ সম্বল।

চিত্ররেখা

অনিরুদ্ধ কর

তুমি কথা দিয়ে যাও আমি তীরে এসে বসে থাকি,
জলের তরঙ্গ মনে নিত্য হ'ক উথাল-পাথাল,
ফিসে এস, ততক্ষণ আলো দেবে আশার জোনাকি
অনন্ত প্রেমিক আমি বসে থাকব দেখো কল্পকাল।

সময়ের শান্ত নদী স্মৃতির সমুদ্রে সমর্পনে
স্থির হবে ; স্তব্ধ হবে বসুধার যত কলরোল
তবু এক পর্বতের মত স্থির হয়ে অকম্পনে
নিরবধি বসে থাকব শুনে যাব তোমার কল্লোল।

আকাশের দেশ নেই, কালে নেই প্রেমিকের পাখি—
এ-কথা আমার এই মধ্যাহ্ন রৌদ্রের কাছে লেখা
তুমি কথা দিয়ে যাও আমি তীরে এসে বসে থাকি
ততক্ষণ আলো দেবে দর্পণের ভীরু চিত্ররেখা।

একটি বকুল গাছ এবং রাত্রি

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সারাটা দিন আলোছায়ার ডাকাডাকি। এখন তুমি বুঝি
মায়া মুকুর সামনে রেখে আপন গন্ধে আপনি দিশেহারা।
সে কী তোমার দয়িত ? তোমার মদির নয়নরুচি।
সামনে রেখে আবেশভরে তারায় তারায় কুহক নাচায় কারা ?

কতো পাখির জটলা তোমায় নিয়ে, তাদের কথায়
এখন তুমি বধির সাজো। এমন অন্ধকারে

একটি বকুল গাছ এবং রাত্রি

জোনাক জ্বলে প্রতীক্ষা আর অনুরাগের উষ্ণ আকুলতায়।
শাখায় শাখায় শিহর। তুমি কতো নীরব স্তব্ধ ঢেউয়ের ভারে,
কতো আকুল মৌনের সঙ্কেতে।

তোমায় ঘিরে লক্ষ শিখায় রোমাঞ্চিত তমিস্রা অস্থির।
সে কী তোমার দয়িত? সে কী আপন প্রেম সে আপনি ফিরে পেতে
কম্প্র হাতের বহ্নিজ্বালায় জ্বালিয়ে দিল তোমায় আশরীর?

হেমন্তের জ্বর্ণাল

(অরুণ ভট্টাচার্যকে)

বটকৃষ্ণ দাস

কোথাও আকাশ নেই নারীর নিবিষ্ট করতলে।

গভীর হাওয়ার রাতে নিরিবিলি ঘাসের জাজিমে
শুয়ে-শুয়ে, ত্রয়োদশী যুবা প্রৌঢ় হেমন্তের হিমে
যৌবনবেদনা তার নক্ষত্রের নিঃশব্দ অনলে
জ্বেলে নিলো। সন্দরের কলাবতী সঙ্গিনীরা সব
কে কোথায় জানা নেই। হয়তো বা এখন অনেকে
বায়ুবদলের মোহে শীতের আনম্র হাত থেকে
দেহলাবণ্যের নদী নিয়ে কোনো সিন্ধুর নীরব
দ্বীপে প্রবাহিত। সেই অপরূপ কিন্নরকণ্ঠীরা
উচ্ছল যৌবন রসে আকাঙ্ক্ষিত সমুদ্রসঙ্গমে
শরীর ভাসিয়ে জলে হয়তো-বা অবলীলাক্রমে
হাসে, খেলে, গান গায়। ঢেউয়ের চূড়ায় জ্বালে হীরা।
জীবনের লীলাপদ্ম কামে, প্রেমে এখনো অম্লান
হয়তো রেখেছে তারা। কলকাতার বিলুপ্ত, ধূসর
মানচিত্র ভৌগোলিক বিবর্ণতা, অন্ধকার জ্বর,
নিরাশ্বাস হাহাকার, সামুদ্রিক বাতাসের গান

তাদের কি মনে পড়ে ? হয়তো পড়ে না। এই হিমে
কাঠের কফিন থেকে সেই সব কাহিনীর ভূত
জাগিয়ে কী লাভ তবে ? কার লাভ ? এইতো প্রস্তুত
দুয়ারে শীতের গাড়ি। চাঁদ ঢলে পড়েছে পশ্চিমে।

বিবর্ণ যুবক তার মুখ গুঁজে ঘাসের ভিতরে
ঠাণ্ডা, ভিজে মৃত্তিকার এক বুক আদিম আঘ্রাণ
টেনে নিলো। চারিদিকে অন্ধকার গান গায়, গান—
দামাল শিশুকে নিয়ে যেমন রজনী গান করে
ঘুম পাড়ানোর ছলে। 'সেই ভালো,'—ভাবলো যুবক,—
'আমিও ঘুমাই তবে মৃত্তিকার স্তনে মুখ দিয়ে
যেমন ঘুমায় ঘাস শব্দহীন শরীর ছড়িয়ে
মাঠে মাঠে।' ভেবে সেই যুবা তাঁর স্থির, অপলক
চোখ তুলে তাকাতেই,—অন্ধকার থেকে এক নারী
উঠে এসে, বললো : 'ঘুমাতে চাও ? তবে যাই চলো
যেখানে নদীর কান্না স্নিগ্ধ পলিমাটিতে ঘুরোলো
শিল্পের অদ্বৈত ভাবে, অনুভবে। শীতল অঙ্গারই
আগুনের প্রাপ্য। তবু নক্ষত্র নিঃশব্দে আজো জ্বলে
কী বিরল প্রেরণায় ! ভাবানুষঙ্গের অন্ধকারে
আকাশ নিমীল, নীল, অনুধ্যানে। এপারে, ওপারে
শান্ত, শাদা বলিয়াড়ি। মাঝখানে কড়ি ও কোমলে
রূপালি জলের গান। চ'লে এসো।—ব'লে, সাঙ্কেতিক
অন্ধকারে সেই নারী নদীর মতোন ঢেউ তুলে
ডাকতেই, দেখলো সে : মহিলার চিকণ আঙুলে
অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়,—তারই দেওয়া চুক্তির প্রতীক ॥

বরিস পাস্তেরনাক

শিবনারায়ণ রায়

নীরবতা, নির্বাসন নয়তো মৃত্যু—সার্বিক রাষ্ট্রের কোন সত্যসন্ধ সৃজনী প্রতিভার সামনে এই তিনটি পথ উন্মুক্ত। প্রায় ২৩০০ বৎসর পূর্বে প্লেটো তাঁর বিখ্যাত রিপব্লিক-এ উক্ত ধারণার একটা আভাস রেখে গেছেন। যৌবনে কবি হলেও প্লেটো নিজে তখনও আধুনিক কালের সার্বিক রাষ্ট্র-নায়কদের মত কবিতার প্রতি অজ্ঞতাজনিত অনাস্থা প্রকাশ করতে পারেননি। অপরপক্ষে, কবিতা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানের ভিত্তিবলে তিনি কবিদের অঙ্গীকারে আস্থা রাখতে অপারগ হন। প্রথমে যদিও তাঁর আশা ছিল যে কবিদের পাঠককুলের কথা চিন্তা না করে তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের দার্শনিক পরিচালকদের নির্দেশ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, কিন্তু তাঁর যুক্তিশীলতার খাতিরে বাধ্য হয়ে প্রত্যক্ষ করলেন যে প্রেরণাকে নির্দেশের বলে নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব, তাই তাঁর রায় হোল আদর্শ রাষ্ট্রের চৌহদ্দী হতে কবিকুলের সম্পূর্ণ নির্বাসন।

এবং লক্ষ্যণীয় যে, প্লেটোর আদর্শে রাষ্ট্রের দার্শনিক পরিচালকদের মত আধুনিক সার্বিক রাষ্ট্রের শাসকবর্গ অথবা আদর্শবাদী রাষ্ট্র পরিচালকরাও কবি কিংবা সৃষ্টিশীল লেখকের ভীতি হতে মুক্ত নয়। কারণ এইসব রাষ্ট্রচালকদের নির্দেশিত পথচলায় মানব জীবন যন্ত্রমাত্রে পরিণত হয়, অন্তধারে সত্যসন্ধ শিল্পী স্বাতন্ত্র্যবোধের বিশিষ্টতায়, বিচিত্র ও বহুমুখী প্রকারের মাধ্যমে, অস্তিত্বের অসামান্য সম্ভাব্যতায়, বহুতায় ও বহুমান্যতায় ব্যক্তির মুক্তিপ্রয়াসী। সুতরাং সৃজনী শিল্পীর স্বতন্ত্র চিন্তাবৃত্তির প্রকাশ সার্বিকতা-বাদের অভ্রান্ত, অপাপবিদ্ধ ও সর্বব্যাপী চেতনার পরিপন্থী। অপরপক্ষে, সার্বিক রাষ্ট্রের শাসকরা যখন শিল্পীকে পূর্বকল্পিত ধারণার ছাঁচে ঢালাই করে তার প্রসারণ ক্ষমতার বিনষ্টি ঘটান তখন বাস্তবতাশূন্য শিল্পীর সৃজন ক্ষমতার ক্রমশঃ অপসারণ ঘটে। শিল্পীর অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানই প্রত্যক্ষ বোধের জন্মদাতা। সৃষ্টির সাফল্য ঘটে তার সহজ ও স্বাভাবিক

বিকাশ ক্ষমতায় অর্থাৎ শিল্পী তার প্রয়োজনানুসারে কোন একটি বিশেষের সামান্যীকরণ, পরিবর্তন অথবা পরিমার্জন করে নূতনের সম্ভাবনা যোগান। অতএব শিল্পী তাঁর অবিনষ্ট কল্পনায় যে গূঢ় বেদনাবোধ অথবা দুর্লভ আনন্দের আস্বাদ লাভ করেন তার সার্বজনীন সংক্রমণের আশঙ্কা যে কোন কূপমণ্ডূক শাসকতন্ত্রের কাছে ভীতির বস্তু।

প্লেটো কল্পিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার বাস্তবতা আমাদের কল্পনার সামগ্রী হলেও আধুনিক সার্বিক রাষ্ট্রনিয়ন্তাদের প্রযুক্ত কলাকৌশল পূর্বকালের স্বৈরশাসক-বর্গের রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থার আভাস পাই। বিগত চার দশক পর্যন্ত প্রায় উক্ত শাসন ব্যবস্থার রূপ কয়েকটি আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যকলাপের দ্বারা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়েছে, এবং এইরূপ শাসনের প্রয়োগ এক সোভিয়েট ইউনিয়ন ছাড়া অন্য কোথাও সুষ্ঠভাবে কার্যকরী হয়নি। রুশ বিপ্লবের পরবর্তী দশটি বৎসর নানা গোলযোগের মধ্যে কাটে এই সময়ে অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার মধ্যেও ইতঃস্তত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও মানবিক ভ্রাতৃত্ববোধের স্পন্দন তখনও জাগ্রত ছিল। তখনও পর্যন্ত সমাজদেহে এই নূতন স্বৈরশাসন ব্যবস্থার দৃঢ় সংস্থাপন সম্ভব হয়নি। বৈপ্লবিক যুগের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তখনও উদারনৈতিক চিন্তার রেশ মন থেকে সরিয়ে ফেলতে পারেননি। কেবল এই সময়েই সোভিয়েট ইউ-নিয়নে শিল্পীদের সত্যিকার স্বাধীনতা ছিল, তাদের মস্তিষ্কপ্রসূত সৃষ্টি-কল্পনা তখনও অপরাধ বলে বিবেচিত হয়নি।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হতে ষ্ট্যালিন ও তার অন্যান্য সহযোগীরা সুপরিকল্পিত উপায়ে সমগ্র সমাজজীবনে এক ব্যাপক পরিবর্তনের সূত্রপাত করলেন। এবং এই পরিকল্পনার যূপকাষ্ঠে প্রথম শহীদ হ'ল সৃষ্টিকামী কল্পনা বিলাসী ভাবধারা। পার্টির পক্ষ হতে সমস্ত শিল্পী ও লেখককে নির্দেশ দেওয়া হল যে, পার্টির স্বার্থে সকলপ্রকার প্রচারকার্য্যে তাদের কার্যক্রম নির্ধারিত হবে। পার্টি-মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তিরাই সকলরকম যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে পরিগণিত হল। ১৯০৫ সালের গোড়ার দিকে লেনিন লেখকদের নির্দ্দেশ দিলেন "সাহিত্যসৃষ্টি সমাজবাদী গণতান্ত্রিক শক্তির অনুপূরক অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হবে।" ষ্টালিনের আমলে সোভিয়েট ইউনিয়নে এই আদেশ আইনে পরিণত হল। এর ফলে রাষ্ট্রের হাতে

শুধুমাত্র সেন্সর বা বহিষ্করণ ক্ষমতাই রইলনা, উপরন্তু তার সাহিত্য প্রকাশ, প্রচার ও পোষণের ব্যবস্থাও সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের করায়ত্ত হল। শিল্পীর পক্ষে রাষ্ট্রের নির্দেশ মেনে চলা ছাড়া কোন পথ রইল না। সুযোগমাত্র অনেক লেখক স্বদেশ পরিত্যাগ করলেন, নয়তো আত্মহত্যা করলেন এবং বহু লেখক মূকর হতে মূকে পরিণত হলেন। তার পরিবর্তে নিম্নস্তরের লেখকরা এলেন পার্টি-নির্দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কার্যকরী করে রাষ্ট্রের যোগ্য নাগরিক মর্য্যাদা লাভ করতে। ১৯৩৪ সালের সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘের প্রথম ও ১৯৫৪-র দ্বিতীয় সম্মেলনের অন্তবর্তীকালে সোভিয়েট মতবাদী সাহিত্যের আমদানী ঘটল অর্থাৎ জর্মণ ভাষার মতবাদী কবিতা, মতবাদী নাটক ও মতবাদী উপন্যাসের জন্ম হল।

সংবাদিক পর্যায়ের লেখক ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গের তথাকথিত 'থ' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ষ্টালিনের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই। বইটিতে পার্টি-নীতির সুনিপুন প্রয়োগ কৌশলে এহ্‌রেনবুর্গ নিজের ভূমিকাটি রাষ্ট্র-নির্দ্দেশিত পন্থার স্বপক্ষে অটুটভাবে বজায় রাখলেন। পার্টির রাজনৈতিক নেতাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে এই সময়ে কোন কোন লেখক তাঁদের স্বাধীনতা পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করেন। ১৯৫৩-৫৪ সালে 'নভি মির' পত্রিকার 'সাহিত্যমান-এর ক্রমাবনতি ও অবিরাম সেন্সরভীতি'-র বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯৫৩-এর ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত ভি, পোমেরান্ট-সেভ-এর On Frankness in Literature প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত নিখিল সোভিয়েট তরুণ সমালোচকদের সম্মেলনে কয়েকজন বক্তা পুনরুচ্চারণ করলেন এক বিস্মৃতপ্রায় ধ্বনি—"সাহিত্যিকের আত্মা"। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত কয়েকখানি বইতে সোভিয়েট ব্যবস্থার সমালোচনার পরিবর্তে মানবজীবনে স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনীয়তার ওপরে জোর দেওয়া হল (এহ্‌রেনবুর্গের উপন্যাস The Thaw, ভেরা পানোভার The Seasons এবং লিয়োনিড জোরিন-এর নাটক Guests ইত্যাদি) অথচ লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, 'বাস্তববাদী সমাজতন্ত্রে' এই স্বাতন্ত্র্যের মূল্য কখনও স্বীকৃত হয়নি। ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘের দ্বিতীয় অধিবেশনে ঝ্‌দানভ্‌ পরিচালিত শিল্প ও সাহিত্যনীতি বিষয়ে সমালোচনা করা হয়। উদ্ধৃতি হিসাবে দু'একটি

সমালোচনার উল্লেখ করা যেতে পারে যেমন, ওলগা বারগওলজ-এর ভাষায় আদর্শবাদিতার চাপে আমাদের "Theatre has lost all theatricalness.....love has completely disappeared from lyrical poetry just nude bodie. have disappeared from our paintings and movement has gone out of our movies." "We must give back to lyrical poetry, to painting, and to the theatre all that they have lost." ভেনিয়ামিন ক্যভেরিন ঘোষণা করেন যে, সত্যকার সাহিত্যের উৎস হবে নূতনের আবিষ্কার···সাহিত্যের সমস্যা আদর্শবাদী মন্ত্রের দ্বারা সমাধান হবেনা।' মিখাইল শলোকভ সাহিত্যে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের সমস্যা সম্পর্কে বলেন, মতবাদী সাহিত্যের দাবীর ফলে নিরস নিম্নস্তরের শব্দাড়ম্বর ব্যতীত উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টি হয়নি। এই সভাতেই দাবী করা হয় যে, সোভিয়েট সাহিত্য সমগ্রভাবে পুনর্বিচার হোক, রুশ সাহিত্যের সঙ্গে পশ্চিমী যোগাযোগ প্রসারিত করা হোক। এবং শিল্পের মুক্তি ও শিল্পীর মত প্রকাশের ও নানা পরীক্ষানিরীক্ষার সম্পূর্ণ স্বাধীনতাও দাবী করা হয়।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও তথাকথিত 'থ' বসন্তের আবির্ভাব সূচিত করায় ব্যর্থ হোল। বিংশতি কংগ্রেসের অধিবেশনে সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি কর্তৃক ষ্টালিন-নিধন পর্ব শেষ হওয়ার পর ক্রুশ্চেভ স্বয়ং রঙ্গমঞ্চে এসে আলগা রাশ শক্ত হাতে টেনে ধরলেন। ১৯৫৭-র মে মাসের সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘের তৃতীয় সমাপ্তি অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতায় ও জুন এবং জুলাই মাসে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে বিক্ষুব্ধ সোভিয়েট বুদ্ধিজীবি আন্দোলন ও সাহিত্য শিক্ষা বিষয়ে ক্রুশ্চেভের পরিষ্কার মতামত জানা গেল। লেখক সঙ্ঘের সভাপতি সুরকভ পার্টি আনুগত্য ও আদর্শবাদীতার স্বপক্ষে যথেষ্ট ওকালতী করলেন। সোভিয়েটের সমস্ত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সম্পাদকমণ্ডলীতে আগাগোড়া পরিবর্তন ঘটল। দুদিন্তসেভ ইভতুশেঙ্কো গ্রানিন প্রমুখ লেখকরা নানাভাবে তিরস্কৃত হলেন, মার্ঘারিটা এলিজারকে স্ব-উক্তি প্রত্যাহারে বাধ্য করান হল। এবং ডক্টর জিভাগো উপন্যাসটির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ ও বৃদ্ধ কবি বরিস পাস্তেরনাককে লেখক সঙ্ঘ থেকে বহিষ্কার করার ফলে এই অস্বাভাবিক অবস্থা চরমে উঠল! পাস্তেরনাকের পরিণতি এখনও অজ্ঞাত। আশা করি পৃথিবীর সুস্থ শক্তিশালী জনমত সোভিয়েট শাসনবর্গ-এর অনমনীয় অসহিষ্ণুতার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবে।

সাম্প্রতিককালের রুশ-বিজ্ঞানের চমকপ্রদ আবিষ্কার অথবা মিকোয়ানের আমেরিকা ভ্রমণের সংবাদে মুগ্ধ হয়ে আমরা আধুনিক কালের এক সত্যসন্ধ শিল্পপ্রতিভাকে বিস্মৃত হবোনা। এই ঘটনাবলীর গুরুত্ব যেন হ্রাস না পায়।

বরিস পাস্তেরনাকের জন্ম ১৮৯০ সালে। পিতা চিত্রকর, মাতা সঙ্গীতজ্ঞা। প্রখ্যাত ব্লক, এশেনিন, মায়াকোভ্স্কি, জামায়াটিন, টিপিল্নিয়াক এবং ব্যাবেল প্রমুখ লেখকগনের সুমহান ঐতিহ্যের উত্তরসাধক হিসেবে পাস্তেরনাক বিশিষ্ট। রীতিপদ্ধতি ও মেজাজের দিক হতে তিনি সিম্বলিষ্ট লেখক, এবং বোদলেয়ার, মালার্মে এবং র‍্যাঁবো প্রমুখ পূর্বসূরীদের একান্ত অনুগামী, অন্যধারে রিল্কে, আপোলিনেয়ার ও ইয়েটস্ প্রমুখ সমকালীন সাহিত্যিকের ঘনিষ্ট সহযোগী। সাম্যবাদে অনাসক্তি সত্ত্বেও শতাব্দীর তৃতীয় দশক হতে পাস্তেরনাকের কবিখ্যাতি বিস্তৃতি লাভ করে। ষ্টালিনী শাসন প্রভাবে অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন সুরু হল। একে একে পাস্তেরনাকের বহু সহকর্মীর ভাগ্যে হয় নির্বাসন নয়তো নির্মম পরিণতি ঘটতে থাকে। ১৯২৫ সালে এশেনিন, ১৯৩০ সালে মায়াকোভ্স্কি আত্মহত্যা করেন। ১৯৩১ সালে জামায়াটীন পারীতে পলায়ন করেন। কয়েক বছর আগে তাঁর উপন্যাস 'We' প্রকাশিত হওয়ায় সোভিয়েটে যথেষ্ট আলোড়ন সুরু হয়। পিলনিয়াক ও ব্যাবেলকে প্রথমে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত এবং পরে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। স্বচক্ষে এতগুলি উদাহরণ উপস্থিত দেখে ও শহীদত্ব লাভের স্পৃহা না থাকায় পাস্তেরনাক সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যকর্ম পরিত্যাগ করে শেক্সপীয়র ইত্যাদি ক্লাসিকের অনুবাদকার্য্যে মনোনিবেশ করেন। গত মহাযুদ্ধের শেষ পর্য্যায়ে যখন সোভিয়েটের সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক অনেকটা স্বাভাবিক, সেই সময়ে ১৯৪৩ ও '৪৫ সালে পাস্তেরনাকের দুটি ছোট কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্র সাহিত্যিকদের ওপর নতুন করে আক্রমন সুরু হয়। পাস্তেরনাক এবার মৌনতা অবলম্বনই বাঞ্ছনীয় মনে করলেন। সরকারী পত্রপত্রিকায় তাঁকে 'বুর্জোয়া রুচিসম্পন্ন, প্রচলিত রীতির অনুগামী, বিকৃত ও গণ্ডীবদ্ধ চিন্তার পরিপোষক' ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত করা হয়। ১৯৫৩ সালে তাঁর বিখ্যাত অনুবাদ গ্যয়েটের ফাউষ্ট প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে এই সময়ে সোভিয়েট সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জগতে 'থ'-এর আগমন সুরু হয়েছে। ১৯৫৪-র এপ্রিলে পাস্তেরনাকের শ্রেষ্ঠ গদ্যরচনা 'ডক্টর জিভাগো'র

অন্তর্ভুক্ত দশটি কবিতা 'জ্‌নামায়া' পত্রিকায় প্রকাশিত হল। স্ট্যালিনের পরবর্তী যুগে 'ডক্টর জিভাগো'-র সূত্রপাত। ১৯৫৪-র শেষের দিকে লেখক পাণ্ডুলিপিটির প্রকাশের জন্য সরকারী প্রকাশভবন 'গজলিটিঝ্‌দাত্‌'-এ প্রেরণ করেন। তথাকথিত সবজ্ঞ কমিশাররা এই পুস্তক প্রকাশ বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন এবং সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘের সভাপতি সুরকভ (তিনি সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সক্রিয় সদস্যও বটে) ও সম্পাদক মণ্ডলী একযোগে রায় দিলেন বইটি সোভিয়েট বিরোধী সুতরাং প্রকাশ অসম্ভব। "নভি মির" পত্রিকার সম্পাদকগোষ্ঠীও সঙ্গে সঙ্গে বইটি নস্যাৎ করলেন। বইটিতে সমাজতন্ত্রী-বৈপ্লবিক চিন্তার অনুপস্থিতিই তাঁদের প্রধান অভিযোগের বিষয়। এই সময়ে ইতালীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির এক প্রভাবশালী সদস্য ফেলত্রিনেলী তাঁর এক সহকর্মীকে মস্কোতে পাঠিয়ে কবির কাছ থেকে "ডক্টর জিভাগো"র একখণ্ড পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। সংবাদটি সুরকভের কর্ণগোচর হওয়ামাত্র তিনি স্বয়ং ইতালীতে এসে ফেলত্রিনেলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে বইটি প্রকাশ করতে নিষেধ ও পরে ভীতি প্রদর্শন করেন। সাংস্কৃতিক জগতের পরম সৌভাগ্যে যে, ফেলত্রিনেলী আত্মসমর্পন না করে সুরকভের প্রস্তাবটি সরাসরি অগ্রাহ্য করেন। তাঁর প্রধান যুক্তি ছিল সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘের নিকট বর্তমানে যা সমালোচনার বস্তু, ভবিষ্যতে তারই প্রকাশন ব্যবস্থা চিরতরে সঙ্ঘের অধিকার হয়ে দাঁড়ায়। অথচ সমালোচনার কারণগুলি সাধারণের কাছে চির অজ্ঞাত থেকে যায়। শেষ পর্যন্ত "ডক্টর জিভাগো" ১৯৫৭-র ২২শে নভেম্বর মিলানে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হল। এবং এর ঠিক একবছর পর ২৪শে অক্টোবর ১৯৫৮ সালে পাস্তেরনাককে এই সাহিত্যকীর্তির স্বীকৃতি হিসেবে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হল।

নোবেল পুরস্কার দানের সংবাদটি প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ২৫শে অক্টোবর "লিতারেতুরনায়া গাজেতা" পত্রিকায় পুরস্কারদান "উদ্দেশ্যমূলক" বলে ঘোষণা করা হয়। উপন্যাসটির ভাগ্যে "ত্রুটিপূর্ণ, অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত, সমাজতন্ত্রী বিরোধী" ইত্যাদি খেতাব জোটে। ২৬শে অক্টোবর 'প্রাভদা'য় কবি বরিস্‌ পাস্তেরনাককে "সাহিত্যিক-পরগাছা" নামে অভিহিত করা হল। উপন্যাসটিকে 'সাহিত্যকীর্তি হিসেবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ'—এ কথাও বলা হয়। ২৯শে অক্টোবর সোভিয়েট রেডিও'র ঘোষক জানালেন "পাস্তেরনাককে সোভিয়েট

লেখক সঙ্ঘের সদস্যপদ থেকে বহিষ্কৃত করা হল।" "পাস্তেরনাককে সোভিয়েট দেশ থেকে বিতাড়িত করা হোক" কমসোমোল কেন্দ্রীয় সমিতির এই প্রস্তাবটিও রেডিও থেকে সাড়ম্বরে ঘোষণা করা হল। এখানেই শেষ নয়। লেখক সঙ্ঘ পাস্তেরনাকের "সোভিয়েট লেখক অধিকার" কেড়ে নেওয়ার প্রস্তাব আনলেন এবং তাঁকে 'দেশ হতে বিতাড়নে'র প্রস্তাবটি অনুমোদন করলেন। পুরস্কারপ্রাপ্তির সংবাদে পাস্তেরনাক স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। কিন্তু অবস্থার দ্রুত অবনতির ফলে তিনি পুরস্কারটি প্রত্যাখ্যান করে ক্রুশ্চেভের কাছে তাঁকে স্বদেশে বসবাসের অনুমতির জন্য প্রার্থনা জানালেন। এক্ষেত্রে আমরা অন্ততঃ আশা করি যে কবিকে তাঁর তরুন বয়সের সহসাহিত্যিক এশেনিন, মায়াকোভ্স্কি, পিলনিয়াক অথবা ব্যাবেল-এর ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে হবেনা।

"ডক্টর জিভাগো" উপন্যাসটি সাহিত্যশিল্প হিসেবেই শুধু মহৎ নয়, বিপ্লবোত্তর সোভিয়েট গদ্যসাহিত্যের মধ্যে একটি সত্যকার মহৎ সৃষ্টি, বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তিতে, অপরোক্ষ অনুভূতির সূক্ষবিশ্লেষনে, গূঢ় দার্শনিক ব্যঞ্জনায়, কবিত্ব-ময়তায় বহুবিচিত্র চরিত্রের উপস্থিতিতে, ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে, বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে, ব্যক্তিগত ভাব ও ভাষার পরিস্ফুটনে, সুবিন্যাস্ত চিন্তায় ও চিত্রন ক্ষমতার এই উপন্যাসটি গত দেড়শ বছরের সাহিত্য-দিকপাল স্তাঁদাল, ডস্টইয়েভ্স্কী, টলস্তয়, ফ্লবেয়ার, টমাস মান্ অথবা জেমস্ জয়েস্-এর শ্রেষ্ঠ রচনার সঙ্গে তুলনীয়। প্রশ্ন হতে পারে যে এই যুগান্তকারী সাহিত্য-কীর্তির প্রতি রুশ শাসকবর্গের খড়্গহস্ত হওয়ার কারণ কি? কারণ হয়তো অসংখ্য। কিন্তু প্রধান আপত্তির কারণ মনে হয় উপন্যাসটির সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীর কেন্দ্রে সোভিয়েট সমাজবাদী চিন্তার বৈপরীত্যের উপস্থিতি। লক্ষ্যণীয় বৈচিত্রময়তা ও অস্তিত্বের সামান্য ও স্বাভাবিক স্বীকৃতি এই বইটিতে স্পষ্টত উজ্জ্বল। সত্য ও স্বাধীনতার স্বাদ হতে বঞ্চিত, প্রতি পদে জীবনের ভীতি, অজ্ঞতা-উৎসারিত বহিঃপ্রেরণা, ভোগবাঞ্ছিত ব্যক্তিজীবন যে সমাজের প্রান-স্পন্দন সেই সমাজাদর্শের অভিনবত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটনে যথেষ্ট আলোকপাত করেছে।

একশ চল্লিশ সহস্র শব্দসম্বলিত এই সুবৃহৎ উপন্যাসটি কোথাও কোথাও সাম্যবাদের সমালোচনা প্রতীয়মান হলেও এর প্রতিটি ছত্রে এক বিদগ্ধ চিন্তাশীল

কবির উপস্থিতিই মুখ্য, সমালোচকের ভূমিকা নিতান্ত গৌন। এবং সম্ভবত এই কারণেই "ডক্টর জিভাগো" উপন্যাসের মূল চরিত্রটি—এক সৃষ্টিকামী, শিল্পদৃষ্টিবোধসম্পন্ন, চিন্তাশীল সদাজাগ্রত সত্যানুসন্ধানী এক ডাক্তার—সহজেই পাঠকমনে সুগভীর ছাপ এঁকে যায়। ডক্টর জিভাগোর নিঃসন্দেহে রেনেশাঁসী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটে যখন সে কোন অন্ধ আদর্শের কিংবা যুথবদ্ধতায় নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একান্ত গররাজী। লেখকের ভাষায় যখন "জীবন খাসকার্য্য-প্রণালীর মতই জটীল ও গুরুত্বপূর্ণ" তখন তা মানবতার চেতনাবোধী কিংবা যখন সে "সূক্ষ বিচার অথবা মূল্যায়নে উত্তরোত্তর পারদর্শী" অথবা "অপূর্বকল্পিত সত্যের সহায়তায় উপর চিন্তাবৃত মননক্রিয়ার মূলে আঘাত হানে" তখন তা সৃজনশীল। 'ডক্টর জিভাগো' উপন্যাসের নায়ক কেবলই "জড় ও গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের" কাছে আত্মোপলব্ধির আহ্বানের বিরুদ্ধে "অদম্য মানসিকতার" "আন্তরিক তুষ্ণীভাব" অবলম্বন করেনা : সে ব্যক্তির বিচিত্র ও বহুমুখীনতার বিকাশ-সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করে সামগ্রিক বৃহতের নিকট আত্মবিলোপ কিংবা স্বাতন্ত্র্যের সামান্যীকরণেও নিশ্চিত্র অপ্রত্যয় ঘোষনা করে। তাই ডক্টর জিভাগোর কাছে কর্ম অপেক্ষা চিন্তা প্রাধান্য পায়, সন্দেহাতীত বিশ্বাস মৃত্যুসম গণ্য হয় এবং অনুভূতিশূন্য কার্য্যকারীতা তার প্রানে বেদনা জাগায়। তাই সার্বিক রাষ্ট্রের অন্ধ শাসকদের নিকট "সাধারন্তে প্রচলিত ভ্রান্তধারণায় সত্যতা স্থাপনে শঙ্কিত, প্রেমে, বৈচিত্রে অনুভূতির উপলব্ধিতে অসমর্থ অথচ আত্মসচেতন কোন চরিত্রের জাগরন" শুধু তার সমাপ্তির সূচনা করে।

"ডক্টর জিভাগো"র প্রতি দণ্ডাদেশ নূতন করে এই কথাই প্রমান করে যে, কোন সত্যসন্ধী সৃজনীশিল্পীর স্থান সার্বিকরাষ্ট্রে একান্তই অনুপস্থিত। "ডক্টর জিভাগো" উপন্যাস স্বয়ং এই সত্যের শ্রেষ্ঠ স্মারক। এক মধুর শিল্পৈশ্বর্য্যে মণ্ডিত, গভীর মানবতাবোধে উদ্দীপিত সমগ্র উপন্যাসটিই এক সত্যার্থা বিদগ্ধ সৃজনী প্রতিভার কথা পুনঃপুন আমাদের স্মরণযোগ্য করে তোলে। মহৎ শিল্পী কবি বরিস পাস্তেরনাক নীরবতা নির্বাসন অথবা মৃত্যু যাই বরণ করুণ না কেন, লোভ, নৈরাশ্য অথবা ভীতির বেদীমূলে উৎসর্গিত হয়ে তাঁর নচিকেত-জীবনবোধ যে কখনও কলুষিত হয়নি তারই পূর্ব স্বাক্ষর এই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্ত্তির প্রতিটি ছত্রে চিহ্নিত।

শিশিরকুমার দে কর্তৃক অনূদিত

হ্যামলেট

কোলাহল স্তব্ধ হ'লো। আমি মঞ্চে এসে
দরজার খুঁটিতে পিঠ রেখে দাঁড়ালাম।
কোলাহল স্তব্ধ, কিন্তু প্রতিধ্বনি যেন
নিয়তি-গর্জন। বুঝতে চেষ্টা করলাম
অদৃষ্টের দেবতাকে, কী আছে ভবিষ্যৎ-অন্ধকার, জীবনে আমার।

হাজার উদগ্র চোখ আর প্রেক্ষাগৃহে
যতদূর দেখা যায় তিমির নিশার
ঝারালো ধাতব লক্ষ্য, অব্যর্থ মৃগয়া!
ঈশ্বর, স্বর্গীয় পিতা! অন্ধ জিঘাংসার
পুরুষের নখে দাঁতে ছিন্নভিন্ন শঙ্খচূড় ক'রো না পুত্রকে তুমি আর।

তোমার অটল পরিকল্পনাকে আজো
ধ্রুব জানি, পিতঃ। আমি তোমার পাওনা
মেটাতে প্রস্তুত; তাই এখন নায়ক—
কিন্তু এ কাহিনী, মঞ্চ, সকলি অচেনা;
আমাকে প্রত্যয় দাও! অনিশ্চিত প্রশ্নে বিঁধে শেষ অঙ্কে উন্মাদ করো না!

তথাপি এ নাটকের যত কথা, যত
শব্দ দৃশ্য অনুভব সমর্পিত সেই
সর্বনাশে! পলায়ন অসম্ভব, একা
আমি, আর এ তুফানে কেউ বেঁচে নেই;
ডাকিনীর যজ্ঞে আজ সর্বত্র শ্মশান!···বেঁচে থাকা, সে যে কঠিন যন্ত্রণা!

অনুবাদ : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শীতের রাত

কুয়াসায় ছেয়ে যাচ্ছে চতুর্দিকে,
একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত।
টেবিলের ওপর মোমবাতিটা জ্বলছে।

উত্তরস্থরী

বসন্তকালের অগ্নি আসক্ত পতঙ্গের মতো
টুকরো টুকরো বরফ কুচি
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসছে
প্রতিবেশী জানালায়।

সেই তাড়িত তুষার, জানলার কাঁচে
নানারকম বৃত্ত এবং তীরফলকের চিত্রকল্প গড়ে তুলেছে।
টেবিলের মোমবাতিটা জ্বলছে
টেবিলের মোমবাতিটা।

ঘরের উজ্জ্বল কড়িকাঠগুলোর ওপর
ছায়া পড়েছে তাড়াতাড়ি রাখা দুটো হাতের,
পায়ের এবং ভাগ্যের।
অকস্মাৎ দুটো পায়ের শব্দ জেগে উঠলো
ঘরের মেঝেতে!
রাত্রির আলো থেকে
মোমবাতিটার অশ্রু ঝরলো ঘাঘরায়।

আর সেই শুভ্রকল্প হিমানী অন্ধকারে
সমস্ত কিছু গেল হারিয়ে।
টেবিলের ওপর মোমবাতিটা জ্বলছে
মোমবাতিটা জ্বলছে।

কোণ থেকে একটা বায়ুপ্রবাহ
আদর বুলিয়ে দিচ্ছে জ্বলন্ত শিখায়,
আর যেন কোন দেবদূতের মতো বাসনার উত্তাপ
পাখা মেলে উঠে দাঁড়িয়েছে একটা ক্রুশের পরিণতি নিয়ে।

সমস্ত ফেব্রুয়ারী ধরে চতুর্দিক তুষার ছড়ানো,
এখন আবার সেই
টেবিলের মোমবাতিটা জ্বলছে
টেবিলের মোমবাতিটা॥

অনুবাদ : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

The following two articles form original papers in the symposium on Belief and Literature and are produced here with the kind permission of the convenor. The first one is an introduction to the Seminar by one of the convenors.
Ed UTTARSURI

i.

A work of art, we rightly maintain, should be judged as an end in itself, not as a means to moral upliftment, political progress or philosophical instruction. On the other hand, it is also true that a work of art is always more than just a work of art. Whether intended by the artist or not, its moral and political effects on the individual and society are unmistakable, sometimes far-reaching. And whether the artist is capable of sustained philosophical thinking or not, his creations often embody a philosophy of life, a weltanschauung.

There is probably not a single critic who does not from time to time commend (or condemn) works of literature because he approves (or disapproves) of the general outlook they express or because their contained philosophy seems to him to be true (or false). Insidiously philosophical considerations, using the term philosophy in a broad sense, have found their way into a great deal of literary and art criticism. The question is whether we should expressly acknowledge their relevance, or purify criticism of these irrelevant matters.

It is often contended and seems difficult to deny that works of great literature have a morally uplifting and purifying influence. Does all great literature have this effect or only some? Is there, could there be, any piece of writing which we could at once acclaim as great literature and denounce as morally pernicious? Is literary excellence itself a moral value with which other moral values either coalesce or clash; or is it an entirely different kind of a value quite incommensurable with the moral values proper? In other words, is all literature as such completely amoral?

Of late, political considerations have begun to play a major if not a dominating role in the evaluation of literature. Politics no doubt are a very important part of man's life, and according to some embrace the whole of his existence. Considering this, is it astonishing that a drama or a novel which makes us more vitally conscious of the highest social objectives, makes us more keenly sensitive to social good and evil, should be rated high as literature? And yet, is it not shocking to treat literature itself as a means to social good and historical progress? An eminent art critic is convinced of the reverse "There are moments in life that are ends to which the whole history of humanity would not be an extravagant means: of such are moments of aesthetic ecstasy" That seems going a big too far, but where is the golden mean to be drawn?

Such are the broad types of problem which we expect to discuss in the proposed seminar on Belief and Literature. These questions are not new, though recent events have brought certain aspects of them into sharper focus. We certainly do not expect to arrive at any final solution or even at any agreed positions in regard to them. It may be hoped, however, that as a result of the deliberations of this seminar we shall understand ourselves, and it is just possible that we shall understand each other too, a little better on at least one or two points or aspects of these profound issues. In that case, the seminar would not have been in vain—or, as the polite cliche expresses it, "would have more than fulfilled its purpose"

The subject of the seminar has been stated with some elaborations as The Relevance or Irrelevance of Philosophical, Moral and Political Considerations in the Evaluation of Creative Literature.

This is a subject which touches deeply the creative writer, the literary critic and the philosopher. All these three categories of writers cannot but orientate themselves in one way or another towards it and are sure to have some thoughts or attitudes to express on this problem. We have tried to get together here some representative writers and thinkers living far from each other separated often by more than a thousand miles of this subcontinent.

More by good luck than by any merit or design of ours, we have amongst us as our principal speaker a very great writer from another continent—I mean Arthur Koestler. He combines in himself all the three categories mentioned above. Of his eminence as novelist I need say nothing; he has also made his mark as a critic; and during the past decade his most important contributions have been in the domain of philosophy. His novels are sometimes described as political novels—rightly or wrongly. But undoubtedly he has spent many decades of his life deep in politics, deep in its illusions and disillusions, in its suffering, horror and heroism. Four years ago in the preface to "The Trail of the Dinosaur" he bade farewell to politics and political writing. Many might regret this decision not I. For I am sure his farewell to politics was indicative of and largely resulted from his entry into profounder pursuits in the fields of pholosophy, ethics and aesthetics. As a stumbling wayfarer on the same path I welcome his firm and bold steps—just, as, as one of the convenors of the seminar I welcome his gracious presence here.

As our President today we have another writer whom I can also describe as at once litterateur, literary critic and philosopher. It is not in any of his minor capacities but in these three major capacities that I welcome Humayun Kabir here, and am happy that he has consented to preside over this function.

ii.

In the understanding of creative literature—I am including creative philosophy in it—I find a plurality of standards of truth. That these standards sometimes seem to merge and sometimes conflict with one another is a source of much confusion and even agony. To discover that the very concept of truth has a number of meanings not necessarily in harmony with one another is for a sincere soul one of the ultimate puzzles of this life. I am not concerned here to answer the question how a solution to this problem is to be worked out in any concrete situation. I will only try to analyse in a summary manner what I conceive to be the

various meanings of truth
creative literature.

The first type of truth is also that which is of least importance in this context. I am referring to truth as defined as empirical fact. When for instance in course of reading a short story I am presented with the fact that summers are very hot in India, what I read is either true or false in an empirically demonstrable way. But many of us will surely feel such a question rather irrelevant in the context of evaluating a story. It may indeed be a matter of regret if the author makes too many or too flagrant factually false statements. But except as such errors constitute evidence for some other kind of untruth, we do not consider them of any significance in judging the artistic value of the story. It is not information what we are to seek in creative literature.

The second type of truth consists in the clear intelligibility of an ideal-typical generalisation. When Lord Acton said that power inevitably corrupted those who held it, one might have tried to prove him wrong by any number of empirical instances to the contrary. But that would not have made his generalisation any less convincing. The statement is true on grounds other than empirical proof and cannot therefore be disproved by any experience. It is true by virtue of its analysis of a clearly intelligible connexion, by its evident understandable necessity. Other statements of this type would be that older people are more circumspect than the younger and that professors make absent-minded husbands. The truth of such statements as these can fitly be compared to truths of geometry. That the sum of two angles in an Euclidean triangle is equal to 180° less the measure of the remaining angle remains everlastingly true, though as a matter of fact actual triangles constructed by our very best draughtsmen will never be able to prove it. In this definition of the term, truth consists in convincingness of a connexion.

The third type of truth introduces the concept of effectiveness or efficiency. If a man who has never learnt to write all of a sudden decides to write literature, even the most genuine passion will not enable him to write effectively. Even the sincerest of men may not know exactly how to

say it, as we are often painfully aware. In this sense of truth we may find parts of the work incongrous with the rest and the whole and therefore false. Falsity will mean here technical falsity, or, in other words, deficiency in communicative skill. Truth means here success in communication.

The fourth type of truth consists in the communication of an emotion or a vision. Falsehood arises if there is inadequacy in the emotion or vision which is purported to be communicated. That an emotion or a vision is lacking is often very skilfully hidden by the art of a professionally equipped writer. A writer may succeed in deceiving even himself. Perhaps the most important part of the training of an interpreter of literature (or philosophy) consists in learning to detect such often almost involuntary deceptions. To recognise charlatans is exceedingly difficult indeed, but if we fail here we also fail to perceive and value those works which are genuine. Truth here means genuineness.

The fifth type of truth is the adequacy of metaphysical awareness in relation to a work of literature. This assumes a reference to the interpreter's personal life, even when the valution is shared by many. If I inquire if Shakespeare or the Mahabharata had a message to tell and thereafter succeed in deciphering such a message, I let it influence my innermost orientation to life. The discovery of the truth of the message is not separable from the discovery of the message itself. Truth is, in this sense of the term, something very personal, something for which I assume personal responsibility.

When we seek to understand and evaluate creative literature or creative philosophy, all these senses of truth play together, sometimes in harmony with one another, sometimes in contradiction. This is what makes criticism such a complex and difficult activity.

PUNYASLOKA ROY

iii

This is an age of political controversies. Every political theory is backed up by a philosophy. The craze for comprehensive systems of philosophy explaining away all aspects of human existence, was never so great as it is today. A

writer is to a certain extent a creature of the age in which he lives. The problems of freedom, of democracy, of morality, of the ultimate destiny of Man are no longer the exclusive property of the academic philosopher.

Some writers of repute have consciously used the literary medium for the propagation of their ideas. There is a notion in literary tradition that propaganda lessens the literary value of creative writing. It is true that much that is writen for propaganda has little artistic quality. Restraint is an obvious merit in literary expression. Even so, there are great works of fiction, like Tolstoy's "War and Peace" in which the author argued out with emotion his own viewpoint. Shaw theorised that all creative writing should be didactic.

Any creative writer worth the name is emotionally concerned with life and his own experience of it. His intellectual theories are there merely on the surface. The truth of his own experience of life is deeper and more compelling than all his conscious theories. It is that experience which he tries to express through his writings. How well he does it is the real measure of his greatness.

There are all sorts of theories about the nature of creative art. "All art is useless", "Art is the highest expression of the fundamental barbarism in Man" "Poets are the unacknowledged legislators of the world", and so on. In the sanskrit literary tradition, the purpose of creative writing is described as follows :

"Kavyam Yashase, Arthakrite, Vyavaharavide, Shivetaraksha taye, Sadyah paranirvritaye, Kantha Samonitatayopadesa yaje" A kavyam is for achieving fame, for making money, for teaching worldly wisdom, for preserving the good, for spontaneous merging of the soul in eternal bliss, for conveying a truth couched in beauty.

This description combines the most pragmatic and the most noble functions of creative literature, though this is by no means an exhaustive list. The first two are the benefits that acrue to the author. I can nme quite a few stories and poems which fall into one or the other categories mentioned above. The storits of Panchatantra are intended to teach us worldly wisdom and they also make excellent reading.

I think Aesops Fables have an abiding place in literature. The great Indian epics were written mainly with the purpose of preaching ethical and moral ideals. The scope of Maha Bharatam is even wider. Every aspect of human life is discussed in it in detail; politics, philosophy, moral values, rules that should govern human relationships and the legal code. Apart from these, Maha Bharatam is a great story, with vividly human characters and their relationships.

There is a theory that a good reader suspends his belief when he approaches a work of art. Somehow, I feel that this theory implies something unnatural. No reader of a book makes his reading a ritual. He does not sit and purge his mind of all notions and beliefs and then start reading the book. It is upto the book to carry him through. I think, the author if he is a powerful writer, communicates his own emotional state to the reader. The reader feels for him as an author, a contemporary and an ally. It does not make any difference if the author is far removed from the reader in time and space. For it is the relevence of the author's work to the reader's circumstances that is of paramount importance.*

PADMARAJU

Literature, like all other arts, is primarily creative, and as creation is an exclusive function of the individual, all such literary activities are intensely personal. Someone has to be cautious about its art form but about the mysteries he is to depend more on his emotive responses. The intricacies of a psychological pattern in an individual are sometimes beyond explanation, but the artist has to move about in a seemingly unknown world experiencing myth and wonder. When Shakespeare conceived of Ariel he had nothing but fantasy and Tagore, while brooding over the ailing boy in Post Office, had in him an abundant imagination bordering on the mysteries of death. Consequently a writer has to be completely

---

* *This is a summary of the paper to be read in the symposium.* Ed. UTTARSURI

independent in so much as his creation is concerned. Otherwise, the pattern he sets forth will all be lost in unsympathetic gestures loosing its norms in the creation itself.

Experience of living is, in itself, a prominent theme for writer. But these scattered and fragmentary experiences are correlated only by a visionary who had such inherent intuitive qualities. The immediate responses are many and varied and when it borders on the actual, the unknown mysteries are coagulated in some sort of a psychological interplay. The individual, in the case of a creative artist, is confronted with a dilemma. The dilemma centres round the social and ethical stand of the individual on the one hand and his philosophical bias on the other. The artist, only here, is divided into his double existence, that of a man in relation to his society he lives and a man within himself. The social, political or even ethical stand may or may not influence his literary doctrines. But the writer has to take, almost in its entirety, both these standpoints in order that he might come out a self-taught and more responsible human being in whom philosophical tenets coincide with humanist practice. Herein lies his power of abstraction, which united with feelings and observations, reproduce again the element of wonder. In this re-creation he is able to give out something of his own intensified existence. The reception of the work, thus produced, depends on the future for which the author is no more responsible.

This background offers one of the leading motives in the evaluation of creative literature. Philosophical, moral or political considerations are, in more than one respect, responsible for a true assessment while, as a social being, a writer can not ignore his environments. He may or may not have any definite attitude to life and its problems. But living in a modern world establishes, in an individual, the varied and complex pattern of cooperative as well as regimented living. Freedom offered by the State is as determinant a condition for a writer as the negation of it. Because, in both the cases, a writer is faced with unique experiences of the kind but where allowance of freedom makes him a conscious individual, the very negation of it takes away from him the essential conditions for creation.

Thinking, on this plane, becomes automatic and his belief suffers,—suffers in the acceptance or rejection of philosophical doctrine or moral codes. It is also no fault of a writer to accept a system of thought and then even to propagate it in terms of literary standards, but he is only to keep a guard over any possible external authority as well as inner dictates. As there is a method in creation, there is also a method in appreciation of values in a work of art. But creation seems to be completely independent of any appreciation, as, the writer wills to live in a personal and imaginary world created by him. Whatever his political or moral considerations are, he always fits it in his own scheme and whenever he visualizes and comprehends an object, he finds in it an ultimate meaning, only when it appears to him an object of wonder too. The consciousness for the object and evocation of this ultimate meaning thereto is the principal criterion for a creative artist, and when such considerations are all embedded in a broader perspective to function in unified homogeneity, it then becomes clear and apparent to the general criticism or evalua tion of any creative literature.

ARUN BHATTACHARYA

Some of the Participants in the Seminar

Arthur Koestler (1905):

Born in Hungary, he was a reputed foreign correspondent by the time he was 26. Arrested in Civil War in Spain and condemned to death. Joined the Communist Party in 1931 but broke away in 1939.

Author of over a dozen books, some of them autobiographical, he now lives in Britain. Since 1956 he has ceased to write or speak on politics. Devotes his attention to studying mysticism and philosophy and history of Science. His latest volumes published in January, 1959 is called "The Sleep-walkers" being a history of the man's changing vision of the universe.

Prof. Humayun Kabir

A well-known critic, philosopher and essayist. He is at present Minister for Scientific Research & Cultural Affairs in the Govt. of India. He has several books both in Eng-

lish and Bengali to his credit.
Bengali literary quarterly.

L. Szymansky (*Poland*):

A noted writer in Poland. He is in India on scholarship. He is chief editor of "The Contemporary" of Warsaw.

Prof. Gibson

Professor of Philosophy in an University

Prof D. McCutchion (*Santiniketan*)

Teaches English in the Santiniketan University.

Kainikara M. Kumara Pillai (*Kerala*)

A distinguished educationist and writer; one-time principal of Mahatma Gandhi College, Trivandrum.

P. V. John (*Delhi*):

Has taught English in several Universities in India is a frequent contributor to several journals in India.

Ka Naa Subramanian (*Madras*)

A well-known writer in Tamil.

S. H. Vatsayan (*Delhi*)

A well-known Hindi poet and novelist. Has travelled widely and now edits the English quarterly Vak devoted to literature and the arts in Asia.

Gulabdas Broker (*Bombay*)

A short-story writer and playwright. Has over a dozen volumes to his credit. He writes in Gujrati. A prominent figure in Gujrati literature today.

P. Padmaraju (*Madras*)

A well-known short-story writer in Telegu having won an international contest. He is also a playwright. He has taught Chemistry for several years before becoming a writer. He is closely associated with films in Telegu.

Ellen Roy (*Dehra-Dun*) :

Secretary of the Indian Renaissance Institute and joint editor of the Radical Humanist. Author of two books and translated Frazer's Golden Bough into German.

Amalendu Bose (*Aligarh*)

Teaches English at Aligarh University
quently in Bengali literary reviews.

Editor : ARUN BHATTACHARYA
Printed and published by the same from
The Temple Press, 2. Navaratna Lane, Calcutta-4

উত্তরসূরী

LIBRARY

বাউল রবীন্দ্রনাথের একটি ছুপদ
ছবি। শৈলজারঞ্জন মজুমদার-কৃত
সংগীতের একটি অপ্রকাশিত স্বরলিপি

পুণ্যশ্লোক রায় : রবীন্দ্রসাহিত্যের পুনর্বিচার। অজিতকুমার
সিকদার : ইয়েটস্ ও জীবনানন্দ প্রসঙ্গে। হিরণ্ময়নাথ
রায় : বিদ্যাসুন্দর কাব্যে নারীগণের পতিনিন্দা

অমিয় চক্রবর্তী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, চিত্ত ঘোষ, পূর্ণেন্দু
বিকাশ ভট্টাচার্য, অনিরুদ্ধ কর, রাম বসু, মানস রায়চৌধুরী
প্রণব মুখোপাধ্যায়, অরুণ ভট্টাচার্য প্রভৃতির কবিতা

সুরজিৎ দাশগুপ্ত ও অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়
কর্তৃক সাহিত্য সমালোচনা। মদন বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্তৃক আধুনিক বাংলা গান সম্পর্কে আলোচনা

ষষ্ঠ বর্ষ নব পর্যায় তৃতীয় সংখ্যা
বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৬

উত্তরসূরী

বর্ষ ৬ ॥ তৃতীয় সংখ্যা ॥ বৈশাখ-আষাঢ় ॥ ১৩৬৬

ছবি

বাউল বেশে রবীন্দ্রনাথের একটি দুষ্প্রাপ্য ছবি

প্রবন্ধাবলী

পুণ্যশ্লোক রায় : রবীন্দ্রসাহিত্যের পুনর্বিচার। ১৮৭। অশ্রুকুমার সিকদার : ইয়েটস্ ও জীবনানন্দ প্রসঙ্গে। ১৯৩। ত্রিদিবনাথ রায় : ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে নারীগণের পতিনিন্দা। ২২৭ ॥

কবিতাবলী

অমিয় চক্রবর্তী। সঞ্জয় ভট্টাচার্য। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। দিব্যেন্দু পালিত। প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়। অনিরুদ্ধ কর। নবেন্দু চক্রবর্তী। অসিত দত্ত। শান্তি লাহিড়ী। পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য। চিত্ত ঘোষ। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। মানস রায়চৌধুরী। রাম বসু। সুরজিৎ দাশগুপ্ত। অরুণ ভট্টাচার্য ॥

সমালোচনা সাহিত্য

একালের চোখে। অচিন্ত্যেশ ঘোষ : সুরজিৎ দাশগুপ্ত। যখন যন্ত্রণা, দৃশ্যের দর্পণে। রাম বসু : অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় (২৫৩-২৬২)

স্বরলিপি

রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপি : শৈলজারঞ্জন মজুমদার

শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গ

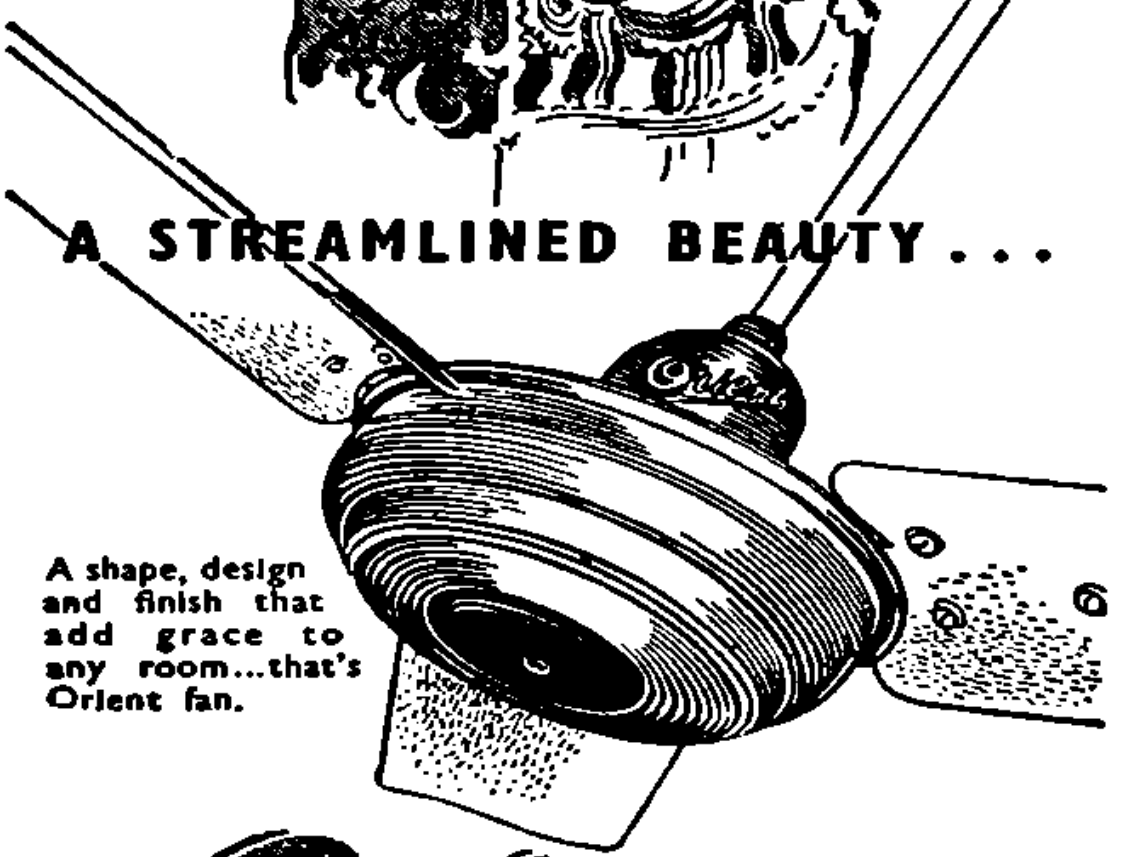
আধুনিক বাংলা গানের রুচিবিকার : মদন বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৯বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড। কলিকাতা-২



A STREAMLINED BEAUTY...



A shape, design and finish that add grace to any room...that's Orient fan.

Orient

THE STRONG, SILENT FAN

A.C. OR D.C. CEILING & A.C. TABLE FANS

ORIENT GENERAL INDUSTRIES LTD.
6, GHORE BIBI LANE, CALCUTTA-11

OF-2/57



'ফাল্গুনী' নাটকের অভিনয়ে
অন্ধ বাউলের বেশে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅলকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে

উত্তরসূরী

বৈশাখ-আষাঢ় ॥ ষষ্ঠ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা ॥ ১৩৬৬

রবীন্দ্রসাহিত্যের পুনর্বিচার

পুণ্যশ্লোক রায়

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটা পুনর্বিচারের সময় এসেছে বলে মনে হচ্ছে। সেই মর্মে কেউ কেউ লিখেছেনও। বাঙলাদেশের ভেতরে ও বাইরে অনেকেই রবীন্দ্রনাথের মহত্ব প্রমাণিত দেখতে চাচ্ছেন। তাঁর কীর্তির কোনো বিশ্বসাহিত্যিক মূল্য আছে কিনা সে নিয়ে সন্দেহ উঠেছে। এসব আঘাতের অবাবে আমরা জেদ করে জোর গলায় রবীন্দ্রনাথকে মানবরূপধারী দেবতা বলে ঘোষণা করতে পারি। কিন্তু দেশবিদেশে অনেক বিদ্বান ধীমান লোকের কাছে রবীন্দ্রনাথের কীর্তির মূল্য কমে গেছে, এর বেদনাকে কতদিনই বা আমরা উদ্ধত রবীন্দ্র-নির্ভরতা দিয়ে প্রশমিত করে রাখব? রবীন্দ্রনাথ মানুষটিকে কিছুটা দেখতে, বুঝতে, ভালোবাসতে পারি। তাই আরো সবাই দেখুক, বুঝুক, ভালোবাসুক এই চাই। ভালোবাসার বস্তু অমর্যাদা পেলে লাগে। অথচ যাঁদের কথা আঘাত দিচ্ছে তাঁদের কথার মূল্য আছে, অবজ্ঞা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ধৈর্য্য ধরে শুনতে হবে সেসব কথা, বিচার করে দেখতে হবে কথাগুলো কতদূর সত্যি। যদি সত্যি না হয়ে থাকে তাহলে ভাবতে হবে কি কারণে এমন কথা তাঁদের মনে স্থান পেল। তাঁদের থামিয়ে দেব, কথা শুনব না, জেদ করে বলব যদিও কারণ দেখাতে পারছি না তবু আমার প্রত্যয়টাই ঠিক, এতো আর চলে না। তাই ভাবছি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটা পুনর্বিচারের সময় এসেছে। অবশ্য একজন যা বলবে একপেশে হতে পারে, অসম্পূর্ণ হতে পারে। অনেকে মিলে বিচার করলে সে দোষগুলো ক্রমশ দূর হবে।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, উনি উপস্থিত মুহূর্তে যা

স্পষ্ট ও প্রবলভাবে সত্যি বলে মনে হচ্ছে তার দ্বারা সম্পূর্ণ আবিষ্ট হয়ে পড়তেন। এই একুণি তাঁর কাছে যা খুব পরিষ্কার রূপ নিয়ে খুব জোরের সঙ্গে মনে লেগেছে, তাই ই সত্য, একান্ত ও পূর্ণভাবে সত্য। তাঁর অনুভূতি ও মননের গড়নটা ওইরকমই। এই বৈশিষ্ট্যটা ছিল বলেই তিনি কবি, বিশেষ করে গীতিকার কবি হতে পেরেছিলেন। কিন্তু ওই একই কারণে কোনো কোনো জায়গায় তাঁকে ভুল বোঝা সহজ হয়েছে। একই উপাদানে গড়া তাঁর ব্যক্তিত্বের ও কীর্তির বিশেষ একটি পূর্ণতা আর বিশেষ একটি অপূর্ণতা।

পূর্ণতার দিকটা আমরা জানি। রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলির উৎকর্ষ আশ্চর্য। জীবনের এক একটি মুহূর্তের ভাব, ভরসা, বেদনা, আনন্দ, তাঁর ছোট গল্প ও প্রবন্ধগুলি। অসাধারণ গভীর ও সূক্ষ্ম তাঁর বোধশক্তি এক একটি কথা কি দরদ ও তেজ দিয়ে, কত সার্থক করে বলতে পেরেছেন। স্থানে স্থানে পরিচয় পাওয়া যায় আশ্চর্য ভবিষ্যৎ দৃষ্টির। এও ঠিক যে কোনো একপেশে একগুঁয়ে ভাব তাঁর রচনায় পাওয়া যাবে না। জীবনের বহু দিকই তিনি দেখেছেন ও বুঝেছেন।

অপূর্ণতার দিকে চোখ খোলে যখন দেখি "শান্তিনিকেতন" গ্রন্থের শেষ বাচনে রবীন্দ্রনাথ প্রথম মহাযুদ্ধকে পূজা বলে বর্ণনা করেছেন, যে পূজায় বীরজাতিরা রক্তপুষ্পের ডালি নিয়ে চলেছে। দর্শনচর্চার উত্তুঙ্গ শিখর থেকে মাটিতে আছাড় খাওয়ার মতো অভিজ্ঞতা। আরো যখন দেখি তিনি নাইটহুড ফিরিয়ে দেবার ঠিক পরেই ইউরোপে গিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পাবার যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এ ধরণের কথা জানলে যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে ভালোভাবে জানেন না তাঁদের পক্ষে তাঁর প্রতি অবিশ্বাস জন্মানো স্বাভাবিক। যাঁরা তাঁকে ভালোভাবে জানেন তাঁরা অবিশ্বাস করবেন না. তবে বুঝবেন কোনখানে অপূর্ণতা। রবীন্দ্রনাথ যখন যেকথার যে দিকটা দেখতেন তখন সেই দিকটাই শুধু দেখতেন। আর অন্য কথা, সেই কথাটারই অন্য, হয়তো অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ, দিকও যে আছে, তা যেন তখনকার মতো ভুলে যেতেন। বহু দিক একসঙ্গে দেখে বিবেচনা করে, বহু কথা একত্র এনে যথাযথ বিন্যাস করে একটা পূর্ণাবয়ব স্থাপত্যকীর্তির মতো অনুভূতি ও চিন্তা গড়ে তোলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি—না কবিতায়, না গল্পে, না মননে, না জীবনে। রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি ও কীর্তি মুহূর্তাভাসনিষ্ঠ।

এর ঐক্য আলগাভাবে পর পর গেঁথে যাওয়া নানা রবীন্দ্রনাথের একটি মালার ঐক্য। এ মালার প্রতিটি ফুল আলাদা করে এককভাবে গড়া, তাদের মধ্যে রূপে এবং গুণে তারতম্য আছে। ঐ মালাটিতেই তাঁকে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলে চেনা যায়।

এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথের খ্যাতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এমন একটি রচনা নেই। দান্তের যেমন "দিব্য মিলন", টলস্টয়ের যেমন "সমর ও শান্তি", তেমন কোনো এক মহাকাব্য বা মহাকথা রবীন্দ্রনাথ লিখে যান নি। লিখেছেন ছোট ছোট, খণ্ড খণ্ড, অজস্র কবিতা, বহু গল্প। তাঁর জীবনের কোনো একটি অনন্য মহাকীর্তি নেই। যদিও বহুতরো মহৎ সংকল্প তাঁর জীবনে অন্তত কিছু পরিমানে রূপ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের কোনো একটি রচনা বা কর্মকে আলাদা করে এককভাবে দেখলে মহৎ বলেই মনে হবে, সব না হলেও বহু ক্ষেত্রে, কিন্তু সে মহত্ত্ব অনন্য নয়; তার জুড়ি আছে, তুলনা মেলে অনেক।

রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব, অনন্য মহত্ত্ব তাঁর রচনার ও কর্মের ঐশ্বর্যে, তাঁর মনের বহুমুখী ও নিরন্তর গতিতে। কোনো একটি বিশেষ রচনা বা কোনো এক বিশেষ ধরণের রচনাতে তিনি আটকে থাকেন নি। রূপ থেকে রূপে, কর্ম থেকে কর্মে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে গেছেন। তাঁর কোনো একটি রচনা অতুলনীয়ভাবে মহৎ না হলেও তুলনীয়ভাবে মহৎ রচনার সংখ্যা অনেক। অসংখ্য রচনার মধ্যে তুচ্ছ নয় এমন রচনার সংখ্যাই হয়তো বেশী। এই সব রচনা একত্র করে দেখলে আর এক ধরণের অতুলনীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু গুণ নয়, পরিসর ও পরিমাণও কোনো কোনো ক্ষেত্রে মহত্ত্বের মাপকাঠি হতে পারে। মহত্ত্বের যে বিস্ময় দান্তে বা টলস্টয়ের বেলায় একটি অনন্য কীর্তিতেই জানা যায়, সেটা রবীন্দ্রনাথের বেলায় আসে তাঁর বহু রচনার সমাবেশে গড়া অনন্য মালাখানি দেখে।

অবাঙ্গালীর পক্ষে তাই রবীন্দ্রনাথের রচনার সমাদর করা সহজ নয়। অনুবাদের সংখ্যা খুবই অল্প। যা পাওয়া যায় তার ভাষা ভালো নয়। ইংরেজি অনুবাদ যা আছে তার ভাষাকে ইংরেজী বলে চেনা রীতিমতো শক্ত, বিশেষত বাংলা যে জানে না তার পক্ষে। ওভাবে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের ও রচনার একটা নেহাৎ আংশিক রূপ দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে তাঁর মতো কবির পক্ষেই এমন খণ্ডপরিচয় সর্বনেশে। প্রধানত

এই কারণেই বিশ্বসাহিত্যের সদর দরবারে রবীন্দ্রনাথের স্থান এখনও সুস্পষ্ট নয়।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে ষাটবছর নাগাত বয়সে একটা গুরুতর রকম অন্তর্বিপ্লব ঘটে গিয়ে থাকবে। অত্যন্ত চাপা লোক ছিলেন। কাজেই আমরা তাঁর রচনার মধ্যে যে পরিবর্তনটা দেখতে পেলাম তারই ভিত্তিতে এটা অনুবাদ করছি। তাঁর গদ্যভঙ্গী বদলে গেল। চলতি ভাষায় লিখতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু তাঁর যে চলতি সেটা একেবারেই লোকমুখের চলতি বাঙলা নয়। এ ভাষায় দেখা গেল অতিচেতন মনের রূপৈশ্বর্য, যেমন উজ্জ্বল তেমনি কৃত্রিম। বরং তাঁর আগেকার সাধুভাষা ঢের বেশী সরল ও স্বাভাবিক। তুলনা দিচ্ছি। "ক্ষিতি বিশাল চক্ষু প্রসারিত করিয়া কহিল,—সে যে আরো ভয়ানক। আমি বেশ দেখিতেছি তোমার হাতে লেখনী পড়লে যতসব কুযুক্তি আমার মুখে দিবে আর তাহার অকাট্য উত্তর নিজের মুখ দিয়া বাহির করিবে।" (পঞ্চভূত) "সে কি ভালোলাগা। মরণের বাড়া। সংকোচ ছিল না, কেননা একে সে ভক্তি বলেই জানত। পুরন্দর দূরে যেত আপন কাজে, সুষমা তখন যেত শুকিয়ে, মুখ হয়ে যেত ফ্যাকাশে।" (বাঁশরী)। দুটোই সংলাপের নমুনা। প্রথমটি দার্শনিক আলোচনার মেজাজে, দ্বিতীয়টি একটি মেয়ের খেদোক্তি! অথচ প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টির ভাষণ কত কৃত্রিম, সাধারণ বাঙালীর মুখের ভাষার কত অনাত্মীয়!

অন্যদিকে তিনি এইরকম সময়েই আঁকতে সুরু করলেন। তাঁর আঁকা ছবিতে দেখা যায় প্রাক্‌চেতন প্রাগৈতিহাসিক মনের অন্ধশক্তির বিচিত্র রূপাবলী। এসব ছবির ইতিহাস নেই, ঐতিহ্য বা সমাজের সঙ্গে কোনো যোগ নেই। এগুলি যেন মানুষের জগতের বাইরে থেকে হঠাৎ এসে পড়েছে। এদের যে প্রচণ্ড শক্তি, যে নিপুণভাবে বর্ণিত প্রাণভঙ্গী, তা আমাদের অভিভূত করে, স্মরণাতীত যুগের কথা মনে করিয়ে দেয়। শিল্প হিসেবে সার্থক বৈকি। কিন্তু তার কীর্তির এই এক দিকের সঙ্গে অন্য দিকগুলির যে নিগূঢ় যোগ রয়েছে সেইটেই এখানে আলোচ্য। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি একদিকে হয়ে পড়ল অতিসচেতনার, অতিসভ্যতার সুকুমার কৃত্রিমতার প্রকাশ, অন্যদিকে প্রাক্‌চেতনার, সভ্যতার পূর্ববর্তী আদিমতার পরিস্ফুটন। উভয়দিকেই তিনি ইতিহাস, সমাজ এবং আশেপাশের সাধারণ ও স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে যোগটা হারিয়ে ফেললেন।

কেন এমন ট্র্যাজিক সাযুজ্যচ্যুতি ঘটল? কারণ বোঝা সহজ নয়। তাঁর অন্তর্জীবন সম্বন্ধে তাঁর সাহিত্যকীর্তি থেকে পরোক্ষ যা জানা যায় তাই একমাত্র অবলম্বন। তিনি নিজে চাপা ছিলেন, তাঁর জীবনীকারেরা ততোধিক। অবশ্য এধরণের একটা পরিবর্তন কেবল একটা ব্যক্তিগত ঘটনার আলোতে বোঝা যাবে এটা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। রবীন্দ্রনাথ কবি কেন হলেন এ প্রশ্নের যেমন জবাব নেই, বিশেষ করে এধরণের কবি কেন হলেন তারও শেষ পর্যন্ত কোনো জবাব নেই। কেমন হলেন সেইটেই শুধু বিচার করে ক্রমশ আরো ভালো করে বোঝা যায়।

আরো একটা কথা না বললে চলে না যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আজকের বাঙালীর পক্ষে সবদিক দিয়ে শুভ হয় নি। আজকের বাঙালী বিদগ্ধ ও রসিক, রুচি ও অনুভূতির চর্চায় বিশ্বাসী। কিন্তু একই সঙ্গে অতীতপূজারী, উদ্যোগ-হীন, নিষ্ঠাহীন, প্রতিযোগিতায় পরাঙ্মুখ। বাঙালীর সর্বনাশ করছে "বাবু" আদর্শ। হবার উপায় আর না থাকলেও বাঙালীমাত্রেই হতে চায় "বাবু", অর্থাৎ ক্ষুরসতী শ্রেণীর সংস্কৃতিবান্ ভদ্রলোক। এমন এক সময়ে যখন সবদেশেই ক্ষুরসতী শ্রেণী লোপ পেয়ে যাবার দিকে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের এই নৈর্ব্যক্তিক শ্রমের ওপর দাঁড়ানো প্রতিযোগপটু খেয়ে খাওয়া সমাজের লোক নন। তিনি ক্লাসিকাল ভারতের শেষ, এবং বোধহয় শ্রেষ্ঠ, প্রতিনিধি। তাঁর কাছ থেকে আমরা যে রুচি ও অনুভূতির শিক্ষা পেয়েছি তা যেন আমাদের "বাবু" হবার চেষ্টা করতে অনুপ্রেরণা না দেয়। এ নতুন যুগে যাঁরা বিদগ্ধ ও রসিক হবেন তাঁদের সামাজিক অস্তিত্ব অন্যরকম হবে, তাই তাঁদের সংস্কৃতিও কিছুটা অন্যরকম হবে। রবীন্দ্রনাথ "বাবু" ছিলেন এর মানে এ নয় যে একমাত্র "বাবু" হয়েই আমরা ওঁর যথার্থ উত্তরাধিকারী হতে পারি। যুগধর্মকে অবজ্ঞা করে চিৎপ্রকর্ষ আমরা বেশীদিন রাখতে পারব না।

প্রথম যৌবনে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রমুখী রচনা, বিশেষ করে কবিতা ও গানগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, তাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথ কবি, ঋষি, গুরু একসঙ্গে সবই। তাঁর দীপ্তিমান্ ব্যক্তিত্বের কাছে তখনকার মতো আত্ম-সমর্পণ করে অনেকেই যে অতুলনীয় সম্পদ পেয়েছেন, সারা জীবনে তা মূলধনের মতো কাজ করে যেতে থাকবে। প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথকে জানা জীবনের মধুরতম স্মৃতির একটি। এইজন্যই বোধহয় কেউ কেউ তাঁর ব্যক্তিত্বের বা

কীর্তির বিচারবিশ্লেষণ ঠিক সইতে পারেন না, আলোচনাকে নিন্দা বলে ভুল করেন।

কিন্তু তাঁকে বিচারবিশ্লেষণ করে বুঝে একটা নতুন ধরণের আনন্দও পাওয়া যায়। তাতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি কিছুমাত্র কমে না। নানা অপূর্ণতা, নানা অসার্থকতা নিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাই-ই, লোকে তাঁকে যা বলে, মহাকবি ও মহাপুরুষ। তবে যার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়া গিয়েছিল, সে বোধহয় কেবল আদর্শসন্ধানী উত্তপ্ত যৌবনমানসের কল্পপ্রতিমা। বাস্তব যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চেহারা অন্যরকম। গুরু নন, দেবতাও নন, শুধু মানুষ। সেই বাস্তব মানুষটিকে জানতে হলে অনেক স্বপ্নভঙ্গ, অনেক ধৈর্য স্বীকার করতে হবে। রূঢ় বাস্তবকে মেনে নিয়ে সমগ্র বাস্তবটাকে দেখতে হবে। মনে তো হয় স্বপ্নভঙ্গের পরে যে রবীন্দ্রনাথকে দেখা যায় তিনি কিছু কম আশ্চর্য নয়।

ইয়েটস্ ও জীবনানন্দ প্রসঙ্গে

অশ্রুকুমার সিকদার

পৃথিবীতে এমন কোন মহৎ কবি জন্মাননি, যাঁর স্বদেশে বা বিদেশের পূর্বগামী বা সমসাময়িককালের কবিদের কাছে ঋণভার বিপুল নয়। এই ঋণে তাঁদের কাব্য সাধনার মৌলিকতার কোন ক্ষতি করে না, বরং নিজের কাব্যের নিগূঢ় প্রয়োজনে অন্য কবির কাব্যের প্রভাবকে সার্থকভাবে ব্যবহার করে একদিকে যেমন কাব্যসাহিত্যের জগতজোড়া ঐতিহ্যের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তেমনি তাতে তাঁদের মৌলিকতারও চরম পরীক্ষা হয়ে যায়।

আমাদের দেশের কবিরা ঐতিহাসিক কারণেই ঐ প্রয়োজনে পশ্চিম-মুখী হয়েছেন। বরং আমাদের কাছে পশ্চিম আজো মুখ্যত ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আসে। কিন্তু নির্বিচারে যে কোন দেশি প্রভাব অন্য-দেশের কাব্যে কার্যকর হতে পারে না—কেননা বিভিন্ন ভাষার শব্দ, শব্দের ধ্বনি, প্রকরণ প্রভৃতি চরিত্র পার্থক্যের ফলে একই বক্তব্য অন্য-ভাষায় সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে অনন্যতা লাভ করে। ভাষার এই বৈশিষ্ট্য সত্য বলে, প্রত্যেক কবিই যখন বিদেশি কবির কাব্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করেন, তখন সাধারণত তিনি দেখেন সেই বিদেশি কবির মনোভাবের সঙ্গে তাঁর কোন মিল আছে কিনা; দ্বিতীয়ত তিনি দেখেন বিদেশি সেই কবির মনোভাব তাঁর নিজের ভাষার চরিত্র প্রতিভা অক্ষুণ্ণ রেখে তার মাধ্যমে প্রকাশিত হাওয়া সম্ভবপর কিনা। সচেতন যে প্রভাবই হোক না কেন, এই দুই পরীক্ষার আশ্রয় পার না হয়ে তা কোনক্রমেই কাজ করতে পারে না।

ইংরেজি ভাষার বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ইয়েটস্ এবং এলিয়ট; এবং এমন প্রত্যাশা করা স্বাভাবিক যে এই দুই কবির প্রভাব আমাদের দেশের কাব্যে সবিশেষ কর্যকরী হবে। এলিয়টের কাব্য প্রকৃত প্রস্তাবে আধুনিক যুগে প্রধান প্রভাব হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও

প্রথম মহাযুদ্ধের পর 'Rocks, moss, stonecrop, iron, merds' থেকে যে কাব্যের অবয়ব ও আত্মার জন্ম—তদনুরূপ পরিবেশ-প্রকৃতি আমাদের দেশে আজো সৃষ্ট না হওয়ার ফলে এলিয়টের প্রভাব যতোটা সুদূরপ্রসারী হতে পারতো, ততোটা সুদূরপ্রসারী হয়নি।

কিন্তু ইয়েটস্-এর প্রসঙ্গে এই অসুবিধাও ছিলো না। অন্তত একেবারে শেষযুগ ছাড়া, ইয়েটস্-এর কবিতার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের পোষকতায় পরিপুষ্ট বাংলাভাষার উপর পড়া সহজ ছিলো—কেননা সেক্ষেত্রে ভাষার রীতি পদ্ধতির বিরোধ ছিলো সামান্য। দ্বিতীয়ত আধুনিককালের বাংলা কবিতা এই দেশের স্বাধিকার লাভের আন্দোলনের সঙ্গে সমান্তরালভাবে গড়ে উঠেছে। ইয়েটস্-এর কাব্যের জন্ম ও পরিপুষ্টিকালও তেমনিভাবে আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধিকার আন্দোলনের সঙ্গে রচিত। তৃতীয়ত, যে শিল্প-বিস্তার আমাদের দেশে সর্বব্যাপী হয়ে দাঁড়ায়নি বলে এলিয়টের কাব্যের অবয়ব ও আত্মা আমাদের ভাষায় ধারণ করা সম্ভব নয়, সেই সর্বব্যাপী শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ইয়েটস্-এর আয়ারল্যাণ্ডেও ঘটেনি। বহুল পরিমানে কলকারখানার প্রতিষ্ঠা মানুষের মনের শাশ্বত উপাদানের কোন পরিবর্তন সাধন করে কিনা জানিনা, কিন্তু বহুলাংশে তার যে অন্য উপাদানের পরিবর্তন ঘটায় তাতে সন্দেহ নাই, এবং এই পরিবর্তিত মনোভাবের মানুষ কবিতার কাছে তার অন্য দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়—'the experience of each new age requires a new confession and the world seems always waiting for its poet.'[১] এই দাবী বাংলা আধুনিক কবিতার শ্রেষ্ঠকালে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো, ইয়েটস্-এর আয়ারল্যাণ্ডেও এই দাবীর ধ্বনি প্রকটভাবে শোনা যায়নি এবং, ইয়েটস্-এর কবিতায় প্রাচীন গেলিক রূপকথা, লোক-কাহিনী নরনারী তাদের প্রসিদ্ধ উপস্থিতি নিয়ে বর্তমান। বাংলা দেশের কবিদের কবিতাতেও এই দেশের রূপকথা, লোক-প্রচলিত কাহিনীর আত্ম-প্রকাশের যথেষ্ট অবকাশ ছিলো, কেননা কৃষিনির্ভর দেশের সেই বিস্ময়-রসে পরিপূর্ণ সম্পদ সেদিকও আমরা হারিয়ে ফেলিনি। অথচ বাংলা

---

১ The Poet—Emerson

আধুনিক কবিতায় তার যে যথাযোগ্য ব্যবহার হলো না, তার কারণ সেই রূপময় ভাণ্ডার সম্বন্ধে কবিকুলের হয় অবজ্ঞা, নয় অজ্ঞতা। জীবনানন্দই সম্ভবত একমাত্র ব্যতিক্রম। সর্বশেষ সাদৃশ্য এই যে, শিল্পময় ইংল্যাণ্ড এলিয়টের কাব্যে গীতধর্মের অব্যবহিত রূপ হারিয়ে ফেলেছে বটে কিন্তু গানের সঙ্গে কবিতার নিকট আত্মীয়তা বাংলা কাব্যে বা ইয়েটস্-এর কাব্যে সহজেই চেনা যায়। অদ্যাবধি পর্য্যন্ত বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে গীতিময়তা একটি বিশিষ্ট লক্ষণ; ইয়েটস্-এর অনেক কবিতা সুরকারের মুখ চেয়ে রচিত।

অবস্থার এমন সাদৃশ্যে এইটাই প্রত্যাশিত ছিল যে, ইয়েটস্-এর কাব্যধারা তার সমস্ত বিশিষ্টতা নিয়ে আধুনিক বাঙালী কবির মনকে আকর্ষণ করবে। এবং এই প্রভাবকে কার্য্যকর করার পক্ষে সাহায্য করার জন্যই যেন কতকগুলি আকস্মিক ঘটনার যোগাযোগ ঘটেছিলো। ইংরেজি গীতাঞ্জলির ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ-ইয়েটস্-এর যোগাযোগ, ইয়েটস্-কর্তৃক উপনিষদের অনুবাদের সম্পাদনা, ভারতীয় জীবন ও ধর্মবিশ্বাসের প্রতি তাঁর কবিতার প্রথম যুগে ঐকান্তিক আগ্রহ—এমন সব ঘটনার আশ্চর্য্য যোগাযোগ ঘটেছিল। কিন্তু এই সমস্ত নিগূঢ় এবং আকস্মিক কারণ সমূহের যোগাযোগ সত্ত্বেও আমাদের কাব্যের স্থান কালের পরিপ্রেক্ষিতে ইয়েটস্-এর প্রভাবের ফলপ্রসূতার সম্ভাবনা কত ব্যাপক এবং তাৎপর্য্য কত গভীর হতে পারে আমাদের কবিরা তা সম্ভবত সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারেন নি। অনুকূল পরিবেশের সমস্ত সহযোগিতা সত্ত্বেও কোন এক অজ্ঞাত কারণে, সন্দেহ হয়, ইয়েটস্-এর প্রভাব যতোটা দূরপ্রসারী হতে পারতো, সেই পরিমাণে হলো না।

ইয়েটস্-এর **Adam's Curse** এবং বুদ্ধদেব বসুর কবিজীবনী—এই দুটি কবিতার পরিকল্পনা এবং বক্তব্যে অসাধারণ সাদৃশ্য আছে। সেই প্রণয়িণী এবং কবির উত্তর প্রত্যুত্তর, সেই কবিতা কলার আলোচনা এবং পিছনে সেই ঘনায়মান সন্ধ্যা—"We saw the last embers of daylight die', 'যেখানে সন্ধ্যার সোনা দিগন্তের নীলাভ পাহাড়ে অলে গলে গেলো'। নারী জানে—'We must labour to be beautiful' এবং কবিও জানেন যে তিনি 'অরাজয়ী কারুকর্মে, ঘর্মক্ষর কিন্তু ক্লান্তি-

হর পরিশ্রমে' আজীবন নিযুক্ত—এতে ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রশ্ন নেই, আছে শুধু আবশ্যিক অঙ্গীকার। এবং

(ক) Better go down upon your marrow bones
কাটাও আষাঢ় পাটখেতে হাঁটুজলে

(খ) break stones
Like an old pauper, in all kinds of weather
করাল রৌদ্রের দিনে
রাজপথে উত্তপ্ত পাথর ভাঙো

(গ) For to articulate sweet sounds together
Is to work harder than all these
মাঠে যারা ধান কাটে, পাটখেতে কাটায় আষাঢ়,
রাজপথে উত্তপ্ত পাথর ভাঙে, তারাও জানে না
এই ধৈর্য্য, এ-নির্মম শ্রম, আমি যাতে ছন্দ বুনি।

কিন্তু এইমাত্র মিলের উপর নির্ভর করে কোন সিদ্ধান্তেই পৌঁছনো যায় না। কেননা, "আঙ্গিক—এমন কি আক্ষরিক সাদৃশ্যেও—প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রমাণ হয় না; প্রত্যক্ষ প্রভাব ভাগবত, মনের গভীরতম স্তরে যার ক্রিয়াকলাপ। সেই কবিরই প্রত্যক্ষ প্রভাবে পড়ি আমরা, যাঁকে আমরা অনুভব করি একাত্ম বলে, চিনতে পারি পরিচালক এবং প্রতিযোগী বলে।"১ এই সূত্র যদি আমারা স্বীকার করে নিই তাহলে নিচের কবিতা দুটি পর পর উদ্ধৃত করলেও বলা যায় না যে ইয়েটস্ এবং জীবনানন্দের মধ্যে কোথায়ও সেই গাঢ় গূঢ় এবং ব্যাখাতীত মনোভাবের আত্মীয়তা ছিলো যা এই দুটি কবিতার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য সংঘটিত করতে সাহায্য করেছে। এই মুহূর্তে সম্ভবত, অনুকরণ ছাড়া এই সাদৃশ্যের অন্য কোন ব্যাখ্যাই আমরা খুঁজে পাবো না।

'The scholars

Bald heads forgetful of their sins,
Old, learned, respectful bald heads
Edit and annotate the lines

১ রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসমালোচনা (সাহিত্যচর্চা)—বুদ্ধদেব বসু

That youngmen, tossing in their beds,
Rhymed out in love's despair
To flatter beauty's ignorant ear.

•

All shuffle there; all cough in ink;
All wear the carpet with their shoes;
All think what other people think;
All know the man their neighbour knows.
Lord, what would they say
Did their Catullus walk the way?

সমাকৃঢ়

'বরং নিজেই তুমি লেখোনাক একটি কবিতা—'
বলিলাম ম্লান হেসে; ছায়াপিও দিলো না উত্তর;
বুঝিলাম সে তো কবি নয়—সে যে আরূঢ় ভণিতা;
পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের পর
বসে আছে সিংহাসনে—কবি নয়—অজর অক্ষর
অধ্যাপক, দাঁত নেই—চোখে তার অক্ষম পিচুটি;
বেতন হাজার টাকা মাসে—আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি;
যদিও সে সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক
চেয়েছিলো—হাঙরের ঢেউএ খেয়েছিলো লুটোপুটি।

কিন্তু এইখানে ক্ষান্ত না হয়ে আমরা যদি "লুটোপুটি" এবং 'tossing' শব্দ দুটির সাদৃশ্যের অন্দোলনে আন্দোলিত হতে হতে উদ্যমের সঙ্গে অগ্রসর হই তাহলে এক সময় আমরা The White Bird এবং আমি যদি হতাম—এই কবিতাদ্বয়কে আবিষ্কার করবো এবং যখন নিচের লাইনগুলি পাবো—

(ক) I would we were, my beloved, white birds
On the foam of the sea!
আমি যদি হতাম বনহংস

বনহংসী হতে যদি তুমি ;
কোন এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর কিনারে
(খ) Where time would surely forget us, and sorrow
come near us no more;

আজকের জীবনের এই টুকরো টুকরো মৃত্যু আর থাকতো না

থাকতো না আজকের জীবনের টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার তখন আমরা সন্দেহ করতে আরম্ভ করবো, এ সাদৃশ্য শুধু প্রকরণগত বা আঙ্গিকের নয়—এই সাদৃশ্যের মূল চলে গেছে কাব্যের জন্মের সেই অন্ধকার অনাবিষ্কৃত যোনিতে—যেখান থেকে অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞার সমন্বয়ে জাত প্রতিভা তার ছটায় ইমেজ নিয়ে আসে, শব্দ নিয়ে আসে, সুর নিয়ে আসে—আমরা তখন ভাববো এ সাদৃশ্য শুধু ইমেজের বা শব্দের বা সুরের নয়—তারা যে প্রতিভার মিশ্রণক্ষমতায় পরিপূর্ণ অবয়ব কবিতা হয়ে ওঠে সেই কৃপণ অদক্ষিণা প্রতিভার সাদৃশ্য। এই সাদৃশ্য সত্য কিন্তু এই সাদৃশ্যের অর্থ জীবনানন্দের মৌলিকত্বের অভাব নয়, এই সাদৃশ্যের অর্থ সমগ্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে কবিদ্বয়ের উপলব্ধির আত্মীয়তা।

I sing of the ancient ways—Yeats

সেই নগরীর এক ধূসর প্রাসাদের রূপ জাগে হৃদয়ে—জীবনানন্দ

জীবনানন্দ এবং ইয়েটস্-এর সঙ্গে কীটস্-এর অতীতে উৎসুক দৃষ্টির সাদৃশ্য প্রথম নেত্রপাতেই চোখে পড়ে। কিন্তু এই সাদৃশ্যের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার যোগ্য। যে অতীতের অর্চনায় এই তিন কবির কাব্য সততই ক্লান্তিহীন—সেই অতীত গতিমুখর নয়, প্রাণচঞ্চল নয়, সেই অতীতের অতিক্রান্ত প্রাঙ্গনে জীবন স্পন্দনহীন হয়ে স্থিরচিত্রের বিশুদ্ধতা অর্জন করেছে। কীটস্ যে গ্রীসের দৃশ্য রচনা করেছেন সে জীবন্ত গ্রীস নয়, খোদিত গাত্রের উপর যে জীবনধারা চিরকালের জন্য মুদ্রিত রয়েছে তাতে প্রাণ নেই রক্তের উন্মত্ত প্রবাহ নেই, তার রক্তের ঔজ্জ্বল্য এবং রেখার রমণীয়তা সত্ত্বেও জীবনের আসল উদ্দামতার থেকে তা স্বতন্ত্র। জীবনানন্দের ধূসর প্রাসাদে যখন আমরা প্রবেশ করি তখনও

সেই একই অনুভূতি ; আসবাবপত্রে ধুলো জমেছে, ঋতুপরিবর্তন ও সূর্য-তাপের তারতাম্যে রঙীন যা কিছু বিবর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু জীবনের পদ-শব্দ নেই। সেই প্রাসাদে মূল্যবান আসবাব আছে, পারস্য গালিচা কাশ্মিরী শাল, বেরিনিতরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল আছে, অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা, লুপ্ত নাসপাতির গন্ধ আছে, শুধু মানুষ নেই, মানুষের পদশব্দ নেই, কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়। জরাগ্রস্তদের জন্য যে দেশ নয়, যে দেশের বাতাস ভারা-ক্রান্ত পরাগে মন্থর, সেই বাইজানটিয়ামের পথে নৌকা জমিয়ে ইয়েটস্-ও প্রার্থনা করেছেন যাতে তিনি কামনার জর থেকে মুক্তি পান, যাতে তাঁকে রূপান্তরিত করা যায় 'Into the artifice of eternity' ; এবং গ্রীসের স্বর্ণকারেরা হাতুড়ি দিয়ে পিটে তাল তাল সোনাকে যে অক্ষয় অব্যয় আকৃতি দিতো, তিনিও তেমনি শাশ্বত অবয়ব পেতে চান। তাই বলেছি, অতীতের দিকে তাকিয়ে এই তিন কবির প্রার্থিত ছিলো স্থিরচিত্রের স্তব্ধতা, ভাস্কর্যের অবিকার।

এই অতীত, সে আমাদের বর্তমানকে তাৎপর্য্য দেয়, বিম্বিসার অশোকের জগতের ধূসরতা, দূর বিদর্ভ নগরের অন্ধকার নাটোরের বনলতা সেনের পশ্চাতে অনিত্যতার পর্দার মতো কাঁপতে থাকে এবং তার স্বল্পস্থায়ী অস্তিত্বকে মহামূল্যে মূল্যবান করে তোলে। শ্যামলীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে দুপুরের শূন্য সব বন্দরের ব্যথা। অস্তিত্ব যে অতিশয় চপল, জীবনের প্রগাঢ়তম সেই সত্যকে জানা যায়— 'Out of dark night where lay the crowns of Nineveh'.

এবং এই স্থিরচিত্রের অচঞ্চল স্তব্ধতার আকাঙ্ক্ষা আমরা সম্ভবত ইয়েটস্ এবং জীবনানন্দের প্রকৃতিকাব্যের মধ্যেও পাবো। কোন কোন ঋতু তাদের বিশিষ্ট শোভা বা শোভাহীনতা নিয়ে, সম্পদ বা সম্পদশূন্যতা নিয়ে বারংবার এই দুই কবির কাব্যে আবির্ভূত হয়েছে?—জীবনা-নন্দের কবিতায় শীত এবং হেমন্ত, ইয়েটস্-এর কবিতায় winter এবং autumn—সেই সব ঋতু, গাছের ডালে যখন পাতা থাকে না, ধান যখন কাটা হয়ে যায়, মুমূর্ষু শূন্য ডাল ঊর্ধ্ব আকাশে মেলে গাছগুলো বসন্তের বর্ণময় দিনের অপেক্ষা করে। সেই অতীতকে এঁরা পছন্দ

করেছেন যাতে গতি নেই, যা অচঞ্চল, যেখানে স্পন্দন সংঘর্ষ, যেখানে উদ্যম নেই; সেই সব ঋতু এঁদের আকর্ষণ করেছে যখন বিশ্বচরাচর মৃতকল্প দিনগুলো একে একে যাপন করে।

এই পীতবর্ণ প্রকৃতি এবং নিরুক্ত অতীতের মধ্যে সম্পর্কের নিবিড়তার প্রমাণ জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলনে সংকলিত 'আছে' নামক কবিতা। কবিতাটির নাম 'আছে'—যদিও ব্যাকরণে এ পদটিকে ক্রিয়াই বলে, কিন্তু ওর মধ্যে ক্রিয়ার ক্রিয়াশীলতা নেই, গতি নেই, অচঞ্চল অস্তিত্বকে ঘোষণা করেই ওর কাজ সম্পূর্ণ হয়। চৈত্রের নিভন্ত দিনে মাঠের মধ্যে শয়ান কবি তাঁর চারিদিকে অব্যবহিত প্রকৃতি এবং পৃথিবীর রূঢ় নষ্ট সভ্যতার কথা পর্যালোচনা করে বলেছেন—

উর ময় চীন ভারতের গল্প বহিঃপৃথিবীর মর্তে হয়ে গেছে শেষ;
জীবনের রূপ আর রক্তের নির্দেশ
পৃথিবীর নাম আর বিচ্ছেদের ভূমা—মনে হয়—এক তিলের সমান;
কিন্তু এই চেয়ে থাকা, স্থিতি, রাত্রি, শান্তি—অফুরান।

এই আছে, থাকা, স্থিতি, রাত্রি, শান্তি—এ সব কি জীবনের ভূগোল থেকে নির্বাসিত অন্য কোন দেশের কথা—তাদের অঙ্গে অঙ্গে তবে কি মৃত্যুর প্রত্যাদেশ? মৃত্যু আছে বলেই অতীতের প্রাসাদ ধূসর হয়ে যায়, চুনবালিখসা দন্তুর হাসিতে মহাকাল বিদ্রূপ করে, তার মেহগনির আসবাবে ধুলো জমতে থাকে রক্তিম গোলাপে তরঙ্গিত মদ তার বর্ণ এবং আস্বাদ হারিয়ে ফেলে। বসন্তের অজস্রতার অন্তরালেও মৃত্যুর পরিহাস নিপুণ কীটাণু বাস করে বলেই একদিন পাতা ঝরে, উলঙ্গ ডাল গাছের হাহাকার ধ্বনির মত শূন্যে হাত মেলে থাকে। তবে কি এই মহাবিস্ময়ের সজীব সংঘর্ষ থেকে মুক্তির প্রার্থনা সেই সর্বব্যাপী মৃত্যুর স্বীকৃতি? শীতের দিনে বসন্তকে ডাকি, বসন্তের দিনে গ্রীষ্মকে, গ্রীষ্মের দিনে মনে হয় শীতই ভালো, কিন্তু আসলে আমরা বুঝিনা কোথায় আমাদের যন্ত্রণা—

Nor know that what disturbs our blood
Is but its longing for the tomb.

একদিন কবরের ঠাণ্ডায় খড়ির মতো শাদা হাড়গুলিমাত্র সম্বল করে

দীর্ঘ দিনরাত্রিগুলি যাপন করবো বলেই হয়তো হেমন্তের নিরলঙ্কার, শীতের ঠাণ্ডা দিনগুলোর প্রতি মৃত্যুর ভারাক্রান্ত এই কবিদ্বয়ের অনিবার্য আকর্ষণ :

(ক) Autumn is over the long leaves that love us
চারিদিকে ঝাউ আম নিম নাগেশ্বরে
হেমন্ত আসিয়া গেছে

(খ) Like pale waters in their wintry race
আকাঙ্ক্ষার আলোড়নে চলিতেছে বয়ে
হেমন্তের নদী।

Doric discipline এর ব্যর্থতার মত, এশিরিয়া মিশরে বিদিশায় মরে যাওয়া রূপসীদের মত, হেমন্তের কুয়াশায় অল্পপ্রাণ দিন এবং অন্ধকার দীর্ঘ শীতরাত্রিটির মত, আরো এক ঝাঁক স্বতন্ত্র বিশিষ্ট ইমেজ এই দুই কবির কাব্যে বারংবার উপস্থিত হয়েছে। বারবার তাঁদের জীবনের এক দ্বিধা, এক যন্ত্রণা, এক বিচলিত চিন্তার মুখোমুখি হতে হয়েছে এবং ফলে সেই দ্বিধা, যন্ত্রণা ও বিচলিত চিন্তাকে প্রকাশ করতে যেয়ে একই ধরণের ইমেজ বারংবার বিভিন্ন কবিতায় কখনো সামান্য রূপান্তরিত বা কখনো সম্পূর্ণ রূপান্তরহীন হয়ে উপস্থিত হয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই ইমেজের মুষ্টিমেয়তা, একি তবে কবিত্বশক্তির দাক্ষিণ্যহীনতাই প্রমাণ করে। আমার সে কথা মনে হয় না। বরং কোন কথা যখন কবিকে কিছুতেই অব্যাহতি দেয় না, যে-কথার তাৎপর্য্য কবির কাছে এতো বড় মূল্য নিয়ে উপস্থিত হয় যে তাঁর কাছে অন্য সব কথা অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ হয়ে যায়, যে-কথার দাবী উপেক্ষা করা কবির সাধ্যাতীত—তার কাছে স্বপ্নগ্রস্তের মত বার বার কবিকে ফিরে আসতেই হবে, এবং ফলে, একই ইমেজকে তাৎপর্যের নূতন স্তরে মণ্ডিত করে কবিকে উপস্থিত করতে হবে, কেননা কবি কখনো কখনো বাধ্যবাধকতার বন্ধনে বন্দী।

পবিত্র করুণ হরিণহরিণী, বনহংসহংসিনীর দল, পঙ্কিল রাত্রির মত ঝুলন্ত অথবা উড়ন্ত বাদুর, বিজ্ঞসমালোচকের মত জ্ঞানপাপী পেঁচা, হিংস্র শকুন এবং সর্বোপরি বীভৎস শূকর—এইসব জন্তু আর পাখীর দল ইয়েটস্ এবং জীবনানন্দের কবিতার একটা বিরাট অংশ জুড়ে বর্তমান।

সামান্য কিছু পংক্তি উদ্ধার করলে সন্দেহ হতে পারে হয়তো এগুলি সহস্র পংক্তির মধ্যে নিতান্তই আকস্মিক, নিতান্তই নির্বাচিত। কিন্তু যদি পূর্বাপর পড়বার মত কাব্যপ্রেম আমাদের থাকে তাহলে দেখবো কত অজস্রবার চিল শামুকের ছায়া, শিকারীর অস্ত্রে আহত হরিণহরিণীর দীর্ঘশ্বাস এই কবিষয়ে কবিতার ছায়াপাত করেছে।

(ক) The delicate-stepping stag and his lady sigh.

এই নীল আকাশের নীচে স্বর্ণের সোনার বর্ষার মত জেগে উঠে
সাহসে সাধে সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্যে।

(খ) The mice in the barley sheaves

ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মত রোমে মাখিয়াছে খুদ।

Where mouse-grey waters are flowing

নেউল ধূসর নদী আপনার কাজ বুঝে প্রবাহিত হয়

(গ) But under heavy loads of trampled day
Lie bodies of vampires full of blood;

আমারই মতন ক্ষিপ্র ক্লান্ত এক শকুনের পাল
দেখিলাম আসিতেছে চোখ বুঁজে উড়ে অন্ধকারে।

(ঘ) And talked of the dark folk who live in souls
Of passionate men, like bats in dead trees.

বাদুড় আঁধার ডানা মেলে হিম জ্যোৎস্নায় কাটিয়াছে রেখা
আকাঙ্ক্ষার ;

A bat rose from the hayels
And circled round him with its squeaky cry,

একটি বাদুড় দূর স্বোপার্জিত জ্যোৎস্নার মনীষায় ডেকে নিয়ে যায়
যাহাদের যতদূর চক্রবাল আছে লভিবার

(ঙ) He bade his heart go out to her
When the owls called out no more.

তখন হয়তো মাঠে হামাগুড়ি দিয়ে পেঁচা নামে।

সমস্ত বিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করে ইয়েটস্ মন্তব্য করেছেন—'Preposterous pig of a world', আর জীবনানন্দ বলেছেন—

শত শত শূকরের চিৎকার সেখানে

ইয়েটস্ ও জীবনানন্দ প্রসঙ্গে

শত শত শূকরীর প্রসব বেদনার আড়ম্বর ;
এই সব ভয়াবহ আরতি··· ।

জীবনানন্দের কবিতার কুঞ্জবন ঝিঁ ঝিঁ-র ডাকে মুখর, ইয়েটস্-এর কবিতায় যে cricket ডাকে তার chattering, wise and sweet। এক-জনের কবিতার প্রতিটি পংক্তির উপর 'dew' ঝরে পড়ে, অন্যজনের নায়ক-নায়িকা বিগত প্রেমের ইতিহাস রোমন্থন করতে করতে যে মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে যায় সে মাঠের প্রতিটি ঘাস শিশিরে ভেজা।

আমি জানিনা কী কারণে স্বপ্নগ্রস্তের মত এই দুই কবিকে বারংবার এই সব পশুপাখির ইমেজ নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে হয়েছে—এবং লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে এদের মধ্যে অনেকগুলিই কবিপ্রসিদ্ধিলোকে উত্তীর্ণ সুন্দর শোভন প্রাণী নয়, অনেকগুলি বীভৎস কুৎসিত, অনেকগুলি যাদের স্পর্শ সভ্য মানুষ সযত্নে এড়িয়ে চলে। এই সমস্যার জটিলতার অন্ধকার দূর করতে গেলে আমার মনে হয় অন্য কোন বিজ্ঞানের আলো আমাদের ব্যবহার করা প্রয়োজন।

প্রথমত, সভ্যমানুষ যা সচেতন জীবনে এড়িয়ে চলে তা তার অচেতন স্বপ্নের জগতে পাহারাদারের বেড়া ডিঙিয়ে আবির্ভূত হয়, এবং দ্বিতীয়ত, স্বপ্নের মত কবিতাও irrational। শুধু তাই নয়, মনোবিজ্ঞানী এবং নৃতত্ত্ববিদদের বিবরণ স্বীকার করে নিলে, স্বপ্ন-বিশ্লেষণলব্ধ জ্ঞান, কৌম-সমাজের মানসক্রিয়া-জাত উপকাহিনী, myth সম্বন্ধে প্রয়োগ করলে দেখা যায় উভয়ের মধ্যে এমন অসংখ্য মিল আছে যে তাদের মধ্যে যোগ-সূত্রের সম্ভাবনাকে প্রায় সত্যের পর্যায়ে নিয়ে যায়। এই সবের উপর ভিত্তি করে এই দুই কবি কবিতায় প্রাণীর ইমেজের প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে আমরা কিছুটা আলো হয়তো লাভ করতে পারি। ইতিহাসের প্রত্যূষে কৌমসমাজের অন্তর্গত হয়ে মানুষ যখন জীবন যাপন করতো তখন তাদের মধ্যে totem-প্রাণীর পূজা প্রচলিত ছিলো সে কথা নৃতত্ত্ববিদদের বিবরণ থেকে আমরা জেনেছি এবং আরো জেনেছি যে এই totem-প্রাণী, যে অধিকাংশ সময়েই হিংস্র বা বীভৎস হতো, তার প্রভাব কৌম-সমাজে কী অসাধারণ, কী সর্বব্যাপ্ত ছিলো। আমাদের সেই মানব-সভ্যতার শৈশবে কৌম সমাজের অতীতস্মৃতির জাগরণ চেষ্টাকে সভ্যতার

ও ঔচিত্য বোধের পাহারাদার বিকল করে দিতে চায় বটে, কিন্তু যেমন স্বপ্নসঙ্কুল অন্ধকারে, তেমনি কবিতার জন্মের অযৌক্তিক মুহূর্তে totem-পূজার অনুষঙ্গ ও স্মৃতি জেগে ওঠা বিচিত্র নয়। অতলে হারিয়ে যাওয়া সেই সব স্মৃতি কবিতার জন্মের রাত্রে, যখন আমরা প্রতিবারে নূতন করে প্রাণীকুল ও প্রকৃতি পর্যায়ের সঙ্গে আত্মীয়তা ফিরে পাই, তখন কবিমানসের উন্মত্ত বিক্ষেপে পুনরায় জাগ্রত হয়ে ওঠে, স্মৃতির উপরতলে ফিরে আসে। এই আলোচনার সত্য সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করবার মত কোন তথ্য আমার হাতে নেই, কিন্তু যখনই জীবনানন্দ-ইয়েটস্-এর কবিতায় এই সব প্রাণীর মুখোমুখি হই তখনই এই সম্ভাবনা আমার কাছে দৃঢ়তর বলে প্রতীয়মান হয়।

স্বপ্নে যখন আমরা মানুষ দেখি তখন আমরা সম্পূর্ণ মানুষ দেখি না, নাক মুখ চোখ যথাযথ থাকে না, মুখশ্রীর রেখা ও বিভঙ্গ শারীরতত্ত্বের সঙ্গে অনেকাংশেই মেলে না—কেননা স্বপ্নের জগতে পুরো মানুষ মর্যাদা পায় না, সেখানে একটা বিশেষ ভাগকে সবিশেষ তাৎপর্য দেবার জন্য মুখোশের মত করে মানুষের মুখকে বস্তু-নিরপেক্ষ করা হয়। স্বপ্নের পিচ্ছিল জগতের মত জীবনানন্দ-ইয়েটস্-এর কাব্যলোকে মুখোশপরা ভাঁড় আর clown-এর মেলা। সং আর আবহমানের ভাঁড়, painted players ও clown-এর দলের মধ্যে বিশ্বের অযৌক্তিকতা যেন একটা ধারালো শ্লেষের মত উদ্যত হয়ে থাকে।

স্বপ্নের কথা, অবচেতনার কথা বারবার আসছে, কেননা এই দুইজন কবির সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে এ প্রসঙ্গ, আর কিছু না হোক, অন্তত নিরুপায় হয়েই আনতে হয়। স্বপ্নের মধ্যে একটি সিঁড়ির দৃশ্য আমরা নিজেরাই ব্যক্তিগত জীবনে কতবার দেখেছি মনোবিকলনকারীদের সংগৃহিত বিবরণে কতবার সেই সিঁড়ির বর্ণনা আমরা পেয়েছি। অপরপক্ষে, স্বরচিত The winding stair ও অন্যান্য কবিতার সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ইয়েটস্ বলেছেন,—

"I have used towers, and one tower in particular, as symbols and compared their winding stairs to the philosophical gyres Shelley uses towers constantly as symbols, and there are gyres in Swedenborg, and in Thomas Aquinas and certain classical authors."

I declare this tower is my symbol; I declare
This winding, gyring, spiring treadmile of a stair
is my ancestral stair.

জীবনানন্দের কাব্যভূমিতেও সেই ঘূর্ণমাণ সিঁড়ির সাক্ষাৎ পাই—

সেই সিঁড়ি ঘুরে ঘুরে নীলিমার গায়ে গিয়ে লাগে,
সিঁড়ি উদ্ভাসিত করে রোদ ;
সিঁড়ি ধরে ওপরে ওঠার পথে আরেক রকম
বাতাস ও আলোকের আসা যাওয়া স্থির করে কি অসাধারণ
প্রেমের প্রয়াণ ?

তাই বলছি যদিও এই দুই কবি স্বতন্ত্র ভাষায় কাব্য রচনা করেছেন কবি হিসেবে তাঁরা যে নিকটতম লোকের প্রতিবেশী ছিলেন তার প্রমাণ তাঁদের ব্যবহৃত ইমেজে। কবিতায় যে শব্দ, যে ইমেজ, যে সুরের স্পন্দন জাগে তার উপর সুনীতি কুনীতির দায়ে বদ্ধ সামাজিক মানুষ হিসেবে কবির কোন হাত নেই। এই অপ্রতিরোধ্য ইমেজ কোথা থেকে কবি পান ; বরং বলি, কোথা থেকে কবির কাছে আসে ? এলিয়ট উত্তরে বলেছেন, 'It comes from the whole of his sensitive life since early childhood',১ এবং এই একই কথার প্রতিধ্বনি রিলকের লেখার মধ্যে আমরা পাই। রিল্‌কে, Verses are not, as people imagine simple feelings, they are experiences,২ এই কথা বলে তার তাৎপর্য বোঝাতে যেয়ে কতকগুলি অবিস্মরণীয় পংক্তি রচনা করেছেন। একটি কবিতা রচনা করতে গেলে কবির পক্ষে নগর নগরীর, মানুষের, পশুপক্ষীর চলা ও ওড়ার, ফুলের কুঁড়ির ক্রমোন্মোচনের অভিজ্ঞতা থাকা চাই জীবনের কোঠায় পূর্বজ্ঞাত-বিদায়, আকস্মিক সাক্ষাৎ, শৈশবের ক্রীড়ার অভিজ্ঞতা থাকা চাই ; এবং ঘরের নির্জন দিনগুলি, প্রভাতে সমুদ্র, রাত্রির ভ্রমণ—

'the memories of many nights of love, each unlike the others, screams of women in labour, women in childbed, beside the dying, beside the dead with open windows and fitful noises'৩

---

১ The use of poetry and the use of criticism—Eliot.

২,৩ The notebook of Malte Laurids Brigge—Rilke.

কিন্তু এও যথেষ্ট নয়, কেননা ভুলতে হবে। ভুলে যাবার পর অটল ধৈর্যে অপেক্ষা করতে হবে যতদিন তারা বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে পুনরায় ফুটে না ওঠে, কেননা কবিতার পক্ষে it is the memories themselves that matter'১ ; তখন তারা কবির রক্তকণিকায় মিশে যাবে, তাঁর চোখের চাওয়ায়, অঙ্গের ভঙ্গিতে একাকার হয়ে যাবে। তারপর সেদিন এক বিরল মুহূর্তে সেই স্মৃতিপুঞ্জের মধ্যে পৃথক শব্দটি জাগ্রত হয়ে উঠে কাব্যগঠন ক্রিয়ার শেষ পর্যায়কে চরিতার্থ করবে।

এবং আমার মনে হয় যে, আর এই মনে হওয়ার পিছনে বহু গবেষকের সন্ধানফলপ্রাপ্ত সঙ্গত কারণ আছে যে, যেখান থেকে ইমেজের জন্ম হয় সে শুধু কবির ব্যক্তিগত চৈতন্যের শৈশব নয়, সমগ্র জাতি-চৈতন্যেরও শৈশব। সেই কারণেই, কাব্যের আলোচনায় কবির ব্যক্তিগত প্রতিভার সঙ্গে ঐতিহ্যের আলোচনাও এতো জরুরি হয়ে পড়ে। কবি ইয়েটস্ 'ancestral night' এর কথা বলেছেন, যে অন্ধকার থেকে আলোর পদ্মের মত ইমেজ জন্ম নেয় ; আর য়ুং এই রকম ইমেজের-ই নাম দিয়েছেন 'primordial image'। যে-কথা সুধীন্দ্রনাথ মানবীয় আবেগ সম্বন্ধে বলেছেন, সেই কথা মানুষের অনাদিকাল-আগত ইমেজসমূহ সম্বন্ধেও খাটে, "মানব সভ্যতা যেহেতু মানবীয় আবেগের প্রাক্তন পট-ভূমিতেই লীলায়িত, এবং সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা-বেদনার পরিপুষ্টি যদিও অবশ্যম্ভাবী, তবু অনুভব-প্রসূ আবেগসমূহ যেহেতু নির্বিকার এবং নিত্য, তাই অনেকের মতে কবিদের উত্তরনির্বিকার মানুষিক চিৎপ্রকর্ষের চেয়েও পুরাতন, এবং এতো পুরাতন যে তাকে প্রায় অনাদ্যন্ত লাগে।"২

স্বপ্নে ইচ্ছাশক্তি এলিয়ে পড়লে, "নির্ণিগড় কল্পনা অথবা নিরতিশয় প্রেরণা দুর্লভের বশীকরণে বেরোয়, তখন চিন্তা চিত্রল হয়ে ওঠে, ভাব বদলায় ভাবচ্ছবিতে।'৩ চিন্তাকে চিত্রল করে তোলা, ভাবনাকে ভাবচ্ছবিতে রূপান্তরিত করা এ শুধুমাত্র ব্যক্তিচৈতন্যের পক্ষে সম্ভব নয়, এ শক্তি জাতীয়চৈতন্যের আয়ত্তাধীন। কোন ইমেজ যখন কবির ব্যক্তিগত চেতনায় জন্ম নেয় তখন তার সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের স্বপ্নদর্শন ব্যাপারের এবং কোন

১ The Notebook of Malte Laurids Brigge—Rilke.

২,৩ ঐতিহ্য ও টি, এস, এলিয়ট (স্বগত) : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

ইমেজ যখন জাতীয় উত্তরাধিকার থেকে জন্ম নেয় তার সঙ্গে myth এর সম্পর্ক যে প্রগাঢ় এ সম্বন্ধে সংশয়মুক্তির কারণ আছে। রীড্ এই কথাই সপ্রমাণ করতে চেয়েছেন যে প্রত্যেকটি 'anthentic image is conceived in the unconscious'১—বা ব্যক্তিচৈতন্যের নিম্নতলেই হোক বা য়ুং-কথিত 'racial psychi'-অন্ধকার থেকেই হোক য়ুং-এর কথা যদি আমরা স্বীকার করে নিই তবে 'image is a concentrated expression of the total psychic situation'২—আর এ কথা তো স্বীকৃত সত্য যে মানস-সত্তার যতটুকু অর্জনের ফল, তার চেয়ে অনেক বেশি উত্তরাধিকার থেকে প্রাপ্ত সংস্কারের দায়ভাগ।

নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মত।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

লজ্জার দায়ে পরা সামান্য কাপড়ের আবরণটুকু উদ্‌ঘাটিত করলে সত্য মানুষের নিচে যেমন লিবিয়ার জঙ্গলের জন্তুকে আবিষ্কার করা যায় তেমনি মুক্তিপ্রয়াসী আমাদের জীবনের অন্তরালেও বৈষম্যের irrational এর লীলা। এবং সেই কারণে, ইমেজের জন্মের সমস্যা সম্বন্ধে যদি আমরা আলোচনা করতে যাই, তবে সমালোচক হিসেবে আমাদের সম্ভবত মনো-বিজ্ঞানী এবং নৃতত্ত্ববিদের সঙ্গে হাত মেলানো প্রয়োজন। সে প্রয়োজন অস্বীকার করলে ছুৎ-মার্গের পরিচয় দেওয়া হবে, কাব্য বুঝবার চেষ্টায় আন্তরিকতার পরিচয় দেওয়া হবে না।

৩

চতুর্দশ শতাব্দীর একটি গানের প্রতিধ্বনি করে ইয়েটস্ বলেছেন—I am of Ireland and the Holy Land of Ireland'। সম্প্রতি

---

১ Surrealism and the Romantic Principle (Philosophy of Modern Art)—Reed.

২ Psychological Types—Jung.

প্রকাশিত 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থ যদি আমরা না পেতাম তবে ইয়েটস্ ও জীবনানন্দের তুলনাগত আলোচনায় একটা শূন্যের সামনে এসে আমাদের পৌঁছুতে হতো। একজনের কবিতা আয়ারল্যাণ্ডের জল নদী এবং যে মৎস্যজীবি প্রভাতে চলেছে 'to cast his flies', তার লোক-কাহিনী, তার আত্মোৎসর্গকারী বীরবৃন্দের মহিমাকীর্ত্তনে সততই ব্যাপৃত, তেমনি অন্যজন এই বঙ্গভূমির বিচিত্র গাছ ফল, বিচিত্র পাখি, শৈশবের রূপকথা ও লোককাহিনীর মধ্যে দেশের চিন্ময়ী অস্তিত্বের ধ্যান করেছেন। তাছাড়া দুজনেরই কবিতার জন্ম ও পুষ্টিকাল দুই দেশের স্বাধিকারলাভের আন্দোলনের সমসাময়িক। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও, কবি হিসেবে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের এইখানেই প্রমাণ যে তাঁদের দেশমূলক কবিতায় জাতীয়তাবাদের অরোত্তাপ কখনোও প্রকাশ পায়নি।

জীবনানন্দ কোনদিন রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তে প্রবেশ করেননি, বরং ঘোষণা করেছেন, 'নির্মল কোন জননীতি নেই'। ইয়েটস্-ই জানতেন বিপ্লবের ফলে শাসকের পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু অন্যায় শাসন অব্যাহতভাবে চলতে থাকে, জানতেন, পার্ণেলকে যারা জয়ধ্বনিতে সম্বর্ধিত করেছে, পার্ণেল লক্ষ্য জয় করলেও তাদের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হবে না, আজকের মত সেদিনও তাদের পথের ধারে বসে পাথর ভাঙ্গতে হবে। এও তিনি জানতেন যে, কোন বৃদ্ধকে যদি হিমের রাত্রে, অথবা কোন কিশোরীকে যদি নবযৌবনের মুগ্ধ আলস্যে খুশি করা যায় তবে সেই-ই কবির পক্ষে যথেষ্ট, কেন না, 'he has no gift to set a statesman right'। কিন্তু এ সত্ত্বেও শাসক-শক্তির দ্বারা উৎপীড়িত আয়ারল্যাণ্ডের রক্তাক্ত দিনে তিনি দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন নি—তাই তাঁকে বার বার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের পাশে এসে দাঁড়াতে হয়েছে। কিন্তু ইয়েটস্ যে পথে তাঁর এই দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন সেই পথ প্রধানত কবির পথ, কাব্য রচনার পথ; স্বদেশপ্রেমিক হিসেবে তিনি আয়ারল্যাণ্ডের চারণকবি হতে চেয়েছিলেন—

> **Know, that I would accounted be**
> **True brother of a company**
> **That sang, to sweeten Ireland's wrong.**

জীবনানন্দের তুলনায় নানা কারণে সমসাময়িককালের রাজনীতির অনেক নিকটলোকে ইয়েটস্ বিচরণ করেছেন, সেই কারণে সাময়িক ঘটনার উপর লেখা তাঁর বেশ কিছু সংখ্যক কবিতা আছে, যদিও সে সব কবিতায় চিরন্তন সমস্যার আলো তাদের নিতান্ত সাম্প্রতিকতার তুচ্ছতা থেকে মুক্তি দিয়েছে। সমসাময়িক ঘটনাবর্তে-জাত জীবনানন্দের এমন কবিতা নেই বললেই চলে। ইয়েটস্ যখন দেশ নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন তখন সেই দেশ শুধু দেশের প্রকৃতি নয়, দেশের মানুষও এবং দেশের মানুষ নিয়ে তাঁর রচিত কবিতা শুধু বিষয়ের দিক থেকে নয়, কাব্যকলার দিক থেকেও ভূমিস্তরের নিকটবর্তী। তাঁর সমগ্র কাব্যসংকলনে অজস্র ballad পাচ্ছি। জীবনানন্দের কবিতাতে ছড়া নেই, আর প্রকৃত প্রস্তাবে জীবনানন্দের দেশ 'জামের গভীর পাতা-মাখা শান্ত নীল জলে খেলিছে গোপনে'—সে দেশ মানুষহীন। এবং যদিও মানুষ থাকে, সে মানুষ রূপকথার, লোককাহিনীর, বড় জোর ইতিহাসের। তাঁর দেশ গৌড়ের কীর্তি, রাজবল্লভের কীর্তির ধ্বংসস্তূপে, পাটরাণী ও তার সখীদের, মীনকন্যা, মন্ত্রীকুমার-কাঁথা-বোনা শঙ্খ-মালার-বেহুলার স্মৃতিতে পরিপূর্ণ।

এ পৃথিবীতে এক স্থান আছে—সবচেয়ে সুন্দর করুণ :
সেখানে সবুজ ডাঙা ভরে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল
সেখানে গাছের নাম : কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল ;
সেখানে ভোরের দেশে নাটার রঙের মত জাগিছে অরুণ ;
সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে—সেখানে বরুণ
কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্ম জলাঙ্গীরে দেয় অবিরল জল ;
সেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মত হাওয়ায় চঞ্চল,
সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মত অস্ফুট তরুণ ;

জীবনানন্দের কবিতায় পৃথিবীর সেই এক মৃতের কথা, সবচেয়ে সুন্দর করুণ দেশের কথা, রূপশ্রী বাংলার কথা যখন আমি পড়ি, এক আবেগ-নম্র রচনার অন্তরালে এক অন্তঃশীল প্রেমের স্পন্দন যখন অনুভব করি, তখন আর এক বাঙালী সাহিত্যশিল্পীর কথা আমার মনে পড়ে—বিভূতিভূষণের কথা। বরং মনে না পড়াই অস্বাভাবিক। কেননা, জীবনানন্দের সভ্যতার পতনঅভ্যুদয় দেখা চোখকে যে করুণ মধুর দেশ মুগ্ধ করেছিল, যে দেশের

তুচ্ছ পরিচিত আকন্দ বাসকলতা, শ্রাবণের বিস্মিত আকাশ, কিশোরীর চাল-ধোয়া ভিজে হাত তার মন ভুলিয়েছিল, সেই অতিপরিচিত দেশের মধ্যে অপরিচিতের অনবদ্য আবিষ্কারের বিস্ময়-চিহ্ন বিভূতি ভূষণের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থেরও পাতায় পাতায়।

যখনই সব বৈকালের ছায়া মাঠের ধারের খেজুর ঝোপের ডাঁসা খেজুরের গন্ধে ভরপুর হইয়া ওঠে, স্নিগ্ধ বাতাসে চারিধার হইতে বৌ-কথা-কও, পাপিয়ার ডাক ভাসিয়া আসে, ডালে ডালে অভ্র আবীর ছড়াইয়া সূর্যদেব সোনাডাঙ্গার মাঠের ব্যাঙাড়ে বটগাছটার আড়ালে হেলিয়া পড়েন, নদীর জল কালো হইয়া যায়, গাঙশালিকের দল কলরব করিতে করিতে বাসায় ফেরে, তখনই তাহার মন বিভোর হইয়া ওঠে, পুলক চোখে চারিদিকে চাহিয়া দেখে।[১]

সে কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে পারেনা যে, সে কী ভালোবাসে এই মাটির তাজা রোদ-পোড়া গন্ধটা, এই ছায়াভরা দূর্বাঘাস, সূর্যের আলো মাখানো মাঠ, পথ, গাছপালা, পাখি, বনঝোপ, ঐ দোলানো ফুলফলের খোলো, আলকুশী, বনকলমী, নীলে অপরাজিতা। ঘরে থাকিতে তাহার মোটেই ইচ্ছা হয় না, ভারি মজা হয় যদি তারা তাহাকে বলে—খোকা, তুমি শুধু পথে পথে বেড়িয়ে বেড়াও—তাহা হইলে এই রকম বনফুল—ঝুলানো ছায়াচ্ছন্ন ঝোপের তলা দিয়ে দূর বনের দিকে চোখ রাখিয়া এই রকম মাটির পথটি বাহিয়া শুধুই হাঁটে, শুধুই হাঁটে।···মাঝে মাঝে হয়তো বাঁশ-বনে কঞ্চির ডালে শন্ শন্ শব্দ, বিকালের রোদে সোনার সিঁদুর ছড়ানো আর নানা রঙবেরঙের পাখির গান।[১]

'তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও—আমি এই বাংলার পারে রয়ে যাবো'—কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি পূরণের সাধ কোন মানুষের নেই, কেননা 'dust unto dust' তার ধূলার শরীর ধূলাতে মিলায়। অনিচ্ছুক মন যত বিদায়ে বিমুখ হয়, অক্ষম শরীর ততো নিরুপায়ে বিদায়ের যাত্রা শুরু করে। এবং প্রেমিকের কাছ থেকে প্রেমিকার বিদায়ের মতই এ বিদায় দীর্ঘ গম্ভীর-করুণ, বিষণ্ণমধুর।

কোথায় চলিয়া যাব একদিন ; তারপর রাত্রির আকাশ
অসংখ্য নক্ষত্র নিয়ে ঘুরে যাবে কতকাল জানিব না আমি ;

---

১ পথের পাঁচালী—পৃ ২৪১, ২৪৯ এবং ৩১০

জানিব না কতকাল উঠানে ঝরিবে এই হলুদ বাদামী
পাতাগুলো—মাদারের ডুমুরের—সোঁদাগন্ধ—বাংলার শ্বাস
বুকে নিয়ে তাহাদের ;

মমতা-মাখা অন্য গ্রন্থের অন্তিমেও সেই এক বিষণ্ণ মন্থর সুর—

জনহীন ভিটার উঠান-ভরা কালমেঘের জঙ্গলে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকিবে, গভীর রাত্রে পিছনের ঘনবনে জগডুমুরের গাছে লক্ষ্মীপেঁচার রব শোনা যাইবে।···কেহ কোনদিন সেদিক মাড়াইবে না, গভীর জঙ্গলে চাপা-পড়া মায়ের সে লেবু গাছটার সন্ধান কেহ কোনদিন জানিবে না, ওড়-কলমীর ফুল ফুটিয়া আপনা-আপনি ঝরিয়া পড়িবে, কুল নোনা মিথ্যাই পাকিবে, হলদে-ডানা তোড়ো পাখিটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিবে।

বনের ধারে সে অপূর্ব মায়াময় বৈকালগুলি মিছামিছি নামিবে চিরদিন।

আর প্রেমিক-প্রেমিকার বিদায় কালের মতই বৈনাশিক সময় স্রোতের অস্তিত্ব ভুলে যেয়ে প্রেয়সীর কানে উচ্চারণ করতে হয়, নিজের অবিশ্বাসী হৃদয়কে প্রবোধ জানাবার জন্য প্রতিশ্রুতি উচ্চারণ করতে হয়—আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে—এই বাংলায়'। অথচ সংশয়ের ইঁদুর হৃদয়ের বিশ্বাসের ভাণ্ড খুঁটে খুঁটে খায়, মনে হয়, যদিও, 'হেমন্তে পাকিবে ধান, আষাঢ়ের রাতে কালমেঘ নিঙরায়ে সবুজ বাঁশের বন গেয়ে যাবে, উচ্ছ্বাসের গান সারারাত,' কিন্তু তবু, 'কোনদিন দেখিব না তারে আমি'।

৪

আমাদের আলোচনার শেষ পর্বে উপস্থিত হয়ে দেখছি ইয়েটস্ এর কাব্য প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির ঊর্ধ্বে কোন শান্তিময় সুষমালোকে উত্তীর্ণ হয়নি। এতদূর পর্য্যন্ত ইয়েটস্ এবং জীবনানন্দ সহযোগী এবং সহযাত্রীর মত এসে শেষ পর্বে অন্তপথ ভিন্নমতি।

অথচ 'Desolation of reality'র কথা ইয়েটস্-এর মত জীবনানন্দও জানতেন—জানতেন যে তার বহু পরিচয় তাঁর রচিত কাব্যের পংক্তিতে ছড়ানো। কিন্তু জীবনের শেষকালে ভগ্নস্তূপে পর্যবসিত সভ্যতার অন্তরাল থেকে, বড় বড় নগরীর বুকভরা ব্যথার অভ্যন্তর থেকে, পশুকল্প মানুষের বিবিধ পাশবিক প্রকৃতির গূঢ় কোন উৎস পথ থেকে, 'লোভ পচা উদ্ভিদ

কুষ্ঠ, মৃত গলিত আমিষ গন্ধ ঠেলে' তিনি 'অন্তিম মূল্যের' অনুসন্ধানে তৎপর হয়েছিলেন। স্বাদগন্ধরূপময় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চরাচরের শুদ্ধ বহিরঙ্গের অব্যবহিত প্রকাশের প্রচেষ্টায় যে কাব্য নিরলস ছিল তার কিছু কিছু চিহ্ন বেলাবসানের দিনেও রয়ে গেল বটে, কিন্তু তা নিরলঙ্কার হয়ে এলো, যে উত্তেজিত ইমেজের প্লাবন একদিন দুকূল ভাসিয়ে নিয়ে যেতো তাও স্তিমিত হলো ; এখন ধূসর দার্শনিক চিন্তায় কাব্যের কেন্দ্রভূমি ভারাক্রান্ত। রক্তের সমস্ত ঘূর্ণিপাক, চিত্তের সমস্ত সংশয়, বীতরাগ, জুগুপ্সা সব কিছু ত্যাগ করে সেই সত্যের সন্ধান শুরু হলো, যা রূপান্তরহীন, যা অব্যয়।

মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর
যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল
মানুষের লালসার শেষ নেই ;
উত্তেজনা ছাড়া কোন ঋতুক্ষণ
অবৈধ সঙ্গম ছাড়া সুখ
অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ
নেই।

বিশ্ব সংসারের এই আচরণ জীবনানন্দের কাছে বহুদিনেরই পরিচিত। কিন্তু এই যদি শেষ সত্য হয় তবে কোন ভরসা নিয়ে মানুষ বিপরীত শক্তির সম্মুখীন হবে, বাঁচবার ইচ্ছে খুঁজে পাবে? তাই সান্ত্বনা দিয়ে কবিকে বলতে হলো—'দীনতা : অন্তিম গুণ, অন্তহীন নক্ষত্রের আলো'।

ইয়েটস্ একদিন সুরময় বর্ণময় বিশ্বচরাচরের কল্পনা নিয়ে কবিজীবন আরম্ভ করেছিলেন। যতই দিন গেলো অলঙ্কার বাহুল্য বলে মনে হলো। কোন শুদ্ধ উচ্চারণের প্রয়োজন বোধ করতে আরম্ভ করলেন যা জীবনের ভয়াবহ সত্যকে ধারণ করতে পারে, কেননা যতোই তিনি অগ্রসর হলেন ততোই জীবনের সত্য তাঁর কাছে ভয়াবহ বলে প্রতীয়মান হলো। শুধু অলঙ্কার নয়, দেহচর্মের আবরণও তিনি একদিন উন্মোচন করলেন এবং দেহচর্মের আবরণও উন্মোচন করে তিনি প্রখ্যাত আত্মার সাক্ষাৎ পেলেন না, পেলেন বরং চকখড়ির মত কঠিন সাদা হাড়। তাই ইয়েটস্-এর শেষ জীবনের কাব্যকে যদি আত্মার কাব্য বলতেই হয়, তবে সে আত্মার বসতি স্নায়ুর মধ্যে পেশীর মধ্যে এবং সর্বোপরি মাংস ঝরে যাওয়া শ্বেতশুভ্র অস্থির মধ্যে। "তিনি Secret

of its skeleton' জানতে চেয়েছিলেন, তাই তাঁর কাব্যে প্রেতলোকের তাৎপর্যে মণ্ডিত কঙ্কালের ইমেজ১—'A bone wave-whitened and dried in the wind'।

ইয়েটস্-এর এই শেষ পর্যায়ের কাব্য আলোচনা করতে যেয়ে পাউণ্ড বলেছেন, এক ধরণের কাব্য আছে যা মূলত সঙ্গীত কিন্তু ভাষার মধ্যে ভাষ্য খুঁজে ফেরে এবং আর এক ধরণের কাব্য আছে যা মূলত ভাস্কর্য কিন্তু শব্দ ও কাব্যের দ্বারা উচ্চারিত হতে চায়।

ইয়েটস্-এর প্রথম যুগের কাব্য সঙ্গীতধর্মী এবং শেষ যুগের কাব্য ভাস্কর্য-ধর্মী। তাই শেষ যুগে one has felt his work becoming gaunter seeking greater hardness of outline'২। কিন্তু এ শুধু যে নিতান্তই কলাকৌশলের পরীক্ষা নয় এ কথা বলাই বাহুল্য, কেননা কাব্যের বিষয়ের সঙ্গে কাব্যের কলাকৌশলের সম্পর্ক বাধ্যবাধকতার, যথেচ্ছ নির্বাচনের নয়। শেষের দিনগুলিতে যা তাঁকে ভাস্কর্যের মত কঠিন রেখাময়, সুরের রচিত মূর্তির মত কাব্য রচনায় বাধ্য করলো, সে বিষয় এই—"এইবার হঠাৎ তাঁর বীতৎসভীতি ভাঙলো ; তিনি নিজেকে এতখানি বশে আনলেন যে পশুত্বের পুনরাবর্তনেও তাঁর আপত্তি রইলো না। বরং তিনি বুঝলেন যে বৈপরীত্যসিদ্ধি একা ব্যক্তির কর্তব্য নয়, সেইটাই সভ্যতারও ব্রত ; কাজেই যদি খৃষ্টানী আপ্তবাক্যের ফল ফলেই, তবে আর নরদেবতার প্রত্যাগমন ঘটবে না, আমাদের আত্মপ্রদক্ষিণ থামবে প্রাক-পৌরাণিক নরপশুর পুনরুত্থানে।"৩

অপরপক্ষে বৈষম্যের বিক্ষোভ থেকে সুষমার শান্তিতে প্রয়াণের বাসনা একা জীবনানন্দেরই বিশেষত্ব নয়, ঐ বাসনা অন্য অন্য মহাকবির ক্ষেত্রেও প্রকট।

অনন্ত সূর্যের অস্ত শেষ করে দিয়ে
বীতশোক হে অশোক সঙ্গী ইতিহাস,
এ তোর নবীন বলে মেনে নিতে হয় ;
এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব ; আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়।

---

১ Rhapsody on a windy night—Eliot.

২ Later Yeats—Ezra Pound.

৩ ডব্লু. বি, য়েটস্ ও কলাকৈবল্য (স্বগত)—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

একথা শুধু জীবনানন্দের কথা নয়, অন্য বহু মহাকবির কথা। ফাউস্টের প্রথম খণ্ডে জীবনের তীর্থযাত্রায় পাপের অনিবার্যতার কথা ঘোষিত হয়েছে, জীবনের স্তরপরম্পরার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন নেতিশক্তি মেফিস্টোফেলিসের গূঢ় ক্রিয়াশীলতার রহস্যকে আবিষ্কার করা হয়েছে কিন্তু এতৎসত্ত্বেও দ্বন্দ্বাতীত জ্ঞানময় দ্বিতীয়খণ্ড রচনা না করে কবি পারেন নি। যে মহাকবি একদিন আর্তনাদ-মুখর রৌরবের পিঙ্গল আলোয় পিশাচ প্রমথদের সহবাসীদের অবিস্মরণীয় বর্ণনায় বলেছিলেন—

> God they blaspheme, blaspheme their parents' bed,
> The human race, the place, the time, the blood,
> The seed that got them, and the womb that bred ;

তাঁকেও অবশেষে পূর্বসূরী কবির হাত ধরে পারিজাতে পরিপূর্ণ নন্দনের আলোকলোকে উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। জীবনানন্দের শেষ পর্বে অন্তিম শুণ, অন্তিম মূল্য অনুসন্ধানের যে চেষ্টা—অস্তিত্বের সমুদ্রতীরে সেই পরশপাথর খোঁজার পাগলামিতে তিনি একা নন। জীবনের ভয়াবহতা, নেতির প্রলোভন, সভ্যতার মর্মে মর্মে পশুবৃত্তির বিক্ষোভ, নরকের প্রতীকী কটাহে নিরুপায় উৎপীড়ন—এই সবকে সত্য বলে জেনে, অকস্মাৎ যখন কবিকুল দ্বন্দ্বাতীতের আলোকলোকের সন্ধান করেন, এই বলে তৃপ্ত হতে চান, 'জলও কোন অতীতে মরেছে ; তবুও নবীন নুড়ি—নতুন উজ্জ্বল জল নিয়ে আসে নদী'—তখন যদি বলি যে কবিগণের এই আশাময় ভরসাময় সিদ্ধান্ত অনিবার্য ছিল না, তাঁদের বিশ্বলোক দেখা দৃষ্টির অভ্যন্তর থেকে এই সিদ্ধান্ত অবশ্য-ভাবীরূপে আবির্ভূত হয়নি—এই আশাময় ভরসাময় সিদ্ধান্ত মানের ভাষায় 'Contrivance' মাত্র, তাহলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কবির রচনা সম্বন্ধে যে দুঃসাহসী মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করতে হবে, সে প্রশ্ন তোলার ক্ষমতা আজো আমি অর্জন করিনি। অথচ এ কথা তো প্রায় সর্বজনস্বীকৃত যে ফাউস্টের প্রথম খণ্ড এবং কমেডিয়ার নরক অংশ সাহিত্য হিসাবে অন্যান্য অংশের চেয়ে মহত্তর। সে কি শুধু বর্ণনার কৌশলে?—না সেই মহত্ত্বের কারণ, বিশ্বাসের প্রগাঢ়তা, সত্যের ভাবানুভূতাত্মক অনিবার্যতা? কাল্পনিক সুষমার সন্ধান চেষ্টাহীন, বাস্তবের সমস্ত যন্ত্রণা ও বৈষম্যের আত্মের প্রকাশের আন্তরিকতায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মহত্ত্ব ঐ অংশগুলি অর্জন করেছে, এই কথাই

সত্য মনে হয়। আর জীবনানন্দের কবিতার চরম পরিণতি সম্বন্ধে 'Contrivance'-এর প্রশ্ন তোলাই যায় এবং তোলা যায় তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি থেকে—"আমিও সাময়িকভাবে কোন কোন জিনিসকে 'চরম' মনে করে নিয়েছি জীবনের ও সাহিত্যের তাগিদে, মনকে চোখ-ঠার দিয়ে মাঝে মাঝে টেম্পরারি সস্পেনশন অব ডিজবিলিফ হিসেবে।···সময় প্রস্থতির পটভূমিকায় জীবনের সম্ভাবনাকে বিচার করে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা লাভ করতে চেষ্টা করেছি।"১

জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতার (নানান সংস্করণ) শেষে জীবনীপঞ্জীতে বলা হয়েছে, তিনি শৈশবে 'প্রত্যূষে ঘুম থেকে উঠে পিতার উপনিষদ আবৃত্তি' শুনতেন। তবে কি উপনিষদের সেই কালজয়ী মন্ত্রগুলি, যা রবীন্দ্রনাথকে জীবনের প্রস্ফুটিত পদ্মের গভীরে পঙ্কস্তরে অবতরণ করতে দিল না, শৈশবে শোনা সেই মন্ত্রগুলিই কি জীবনানন্দকে ফিরিয়ে আনলো শত শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর, এই সব ভয়াবহ আরতির থেকে দূরে? অথবা যে নেতির, যে শূন্যের সাম্রাজ্য তিনি রচনা করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তিনি কি সেই লুপ্তহরিৎ মরুভূমি, সেই নেতির সম্মুখীন হতে সাহসী হলেন না? শাশ্বত মূল্যের খোঁজে তাঁর যে উদগ্রীব পশ্চাদ্ধাবন, সে কি তবে রঙরেখাহীন পৃথিবীর অন্তিম দৃশ্য দেখে মূর্ছাপন্ন আতঙ্কের ফল? অথবা হয়তো তাঁর কাব্যরচনার এই শেষ ফসলকেও তিনি পূর্বকবিতাবলীর মতোই অনিবার্য মনে করেছিলেন। সে যাই হোক—

আমরা সূর্যের যেই প্রাণ উজ্জ্বলতা
চীনে কুরুবর্ষে গ্রীসে বেৎলেহেমে হারিয়ে ফেলেছি—সেই এতদিনের ফসল-ফলানো মহৎরশ্মিকে তিনি অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করেন, আর পিছনে পড়ে থাকলো বিধ্বস্ত সংসার।

শুধু শব্দহীন মৃত্যুহীন
অন্ধকার ঘিরে রাখে, সব অপরাধ ক্লান্তি ভয় ভুল পাপ
বীতকাম হয় যাতে,—এ জীবন ধীরে ধীরে বীতশোক হয়,
স্নিগ্ধতা হৃদয়ে জাগে।

---

১ কবিতা প্রসঙ্গে—কবিতার কথা : জীবনানন্দ দাশ

যদিও মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে তবুও কবি বজ্রকণ্ঠে, করুণ-মধুর স্নিগ্ধ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন—

তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল, সূর্য মানে আলো ;
এখনো নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ঘুরালো।

এই দীনতা, স্নিগ্ধতা, নম্রতার কথা যখন আমি পড়ি তখন মনে হয় সব শব্দের অন্তরাল থেকে যেন 'আমার মাথা নত করে দাও'—এর সুর শুনতে পাই। জীবনের অন্তিমে এসে একি নিজিতের সন্ধিপ্রস্তাব, বিজয়ী সংসারের কাছে সর্তহীন আত্মসমর্পণ।

কিন্তু ইয়েটস্ প্রত্যাবর্তন করলেন না—কোন ধ্রুবসত্যের ধ্যান হস্তধৃত আমলকের মত তাঁর আয়ত্তে এলো না শেষদিন পর্যন্তও। যে নেতির অস্তিত্ব তিনি Byzantium-এর যুগে অনুভব করেছিলেন সেই শূন্যতা কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত করতে পারে তা দেখবার দুঃসাহসে তিনি শেষপর্যন্ত অগ্রসর হলেন ; ধর্মলোকে, রূপলোকে, কোন ব্যক্তিগত বা বিশ্বগত দর্শনে তিনি সান্ত্বনার আশ্রয় প্রার্থনা করলেন না। স্বনির্বাচিত মরুভূমির পথে এই পথিক সম্পূর্ণ সঙ্গীহীন, সেই শান্তির একাকারে হাহাকারে তিনি একাকী পরিব্রাজক। এই জগতের যোগ্য তুলনা শেলির Ozymandias ছাড়া অন্য কোথায়ও পাইনা—'Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert।' এই Byzantium-এর যুগেই তিনি মানুষের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন—'the fury and mire of human veins' এবং সেই প্রসিদ্ধ প্রাচীন নাবিকের মত তখনই তিনি জীবনের মধ্যে মৃত্যু ও মৃত্যুর মধ্যে জীবনের অস্তিত্বের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন।

দীনতা নামে কোন ধ্রুবনক্ষত্রের আলো আমাদের অন্তহীন রাত্রির অন্ধকার থেকে স্বর্ণময় ভবিতব্যের দিকে পথ দেখাতে পারে না। আমরা সূর্যের যেই প্রাণ উজ্জ্বলতা চীনে কুরুবর্ষে গ্রীসে বেথলেহেমে হারিয়ে ফেলেছি সেই অতীতের প্রাণদায়ী রশ্মির এমন কোন সাধ্য নেই যার বলে আমাদের 'anguish of the marrow'২ অথবা 'fever of the bone'১কে শান্ত করতে পারে—শাশ্বতকাল এমন কোন পবিত্র জল আমাদের অঞ্জলিবদ্ধ হাতে

---

১ Whispers of Immortality—Eliot.

দেয়নি যার শুচিস্পর্শে 'The lion and the virgin, The harlot and the child'-এর মধ্যে যত বিরোধের ব্যবধান, বিরোধের সংঘাত, তার তীব্রতাকে মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত নতশির করে দেওয়া যায়। দেওয়া যায় না, কেননা বিরোধই সত্য, সুষমা নয়। সংসারের প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি অন্য বস্তুর প্রতিস্পর্ধী প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—সর্বত্রই বৈষম্যের ব্যঞ্জনা। আর যারা সুষমার সন্ধানে উন্মার্গগামী চন্দ্রাহতের মত সত্যদৃষ্টি বিসর্জন দেয় তাদেরকে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ করবার জন্য যেন প্রকৃত ব্যঙ্গের আয়োজন করে—

But love has pictured his mansion in
The place of excrement ;

সুষমা নেই, সমাধান নেই ; বিশ্বগত বা ব্যক্তিগত সমস্যার জটিল আবর্তের চক্রগ্রহ থেকে কোন সমাধানের নির্গতি সম্ভব নয়, সুতরাং Let all things pass away'। খরস্রোত জলের মত তীব্র বহমান অস্তিত্বের প্রবাহে ধ্রুবসত্যের খড়কুটো আঁকড়ে ধরবার কোন প্রয়াস ইয়েটস্ শেষ পর্যায়ে এসেও করেননি। এইখানেই তাঁর প্রধান স্বাতন্ত্র্য।

অবরুদ্ধ এবং অবসিতপ্রায় কামের পঙ্কময় জলাভূমিতে দাঁড়িয়ে ইয়েটস্-এর শেষ জীবনের প্রার্থনা—'Grant me an old man's frenzy'। যে উন্মাদ উইলিয়ম ব্লেক আর্তস্বরে বলেছেন, 'Bring me my bow of burning gold, Bring me my arrows of desire', সেই তাঁর মত ; অথবা ঝঞ্ঝাময় রাত্রিতে জলাভূমির মধ্যে দণ্ডায়মান হয়ে অকৃতজ্ঞ সংসারের বিরুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনেও যিনি 'thick rotundity o' th' world' কে আঘাত করতে চেয়েছিলেন সেই একাকী যুদ্ধরত রাজা লিয়ারের মত ইয়েটস্-ও 'old man's frenzy' প্রার্থনা করেছেন। আর সেই frenzy-র আবর্ত থেকে কামাসক্ত বৃদ্ধের অপরিতৃপ্ত কামের অরাতপ্ত দুঃস্বপ্নের মত এই শেষ লগ্নে কব্যে এসেছে এমন সমস্ত স্বভাব-অসঙ্গত ইমেজ যারা ইতিপূর্বে সাহিত্যের রাজত্বে প্রবেশাধিকার পায়নি। জীবনের কোন ব্যর্থতা, কোন অপরিতৃপ্তির বিকারগ্রস্ত শূন্যতার ফলে এই সমস্ত ইমেজের জন্ম হয়েছিল সে সিদ্ধান্ত আজো উপযুক্ত গবেষকের অপেক্ষায়। কিন্তু ততোদিন পর্যন্ত অসাধারণ কল্পনাশক্তি সম্পন্ন এক প্রতিভার গুহামুখ থেকে যে অস্বাভাবিক বর্ণের, অস্বাভাবিক আকারের ইমেজ-তরঙ্গ জলপ্রপাতের মত কাব্যভূমিতে পড়ে

উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে তার দিকে অবরুদ্ধ বিস্ময়ে আমরা তাকিয়ে থাকতে পারি—

Foul goat-head, brutal arm appear,
Belly, shoulder, bum,
Flash fish-like ; nymphs and satyrs
Copulate in the foam.

ইয়েটস্-এর কবিতা সংশয় সমস্যায় বিব্রত মানুষের জন্য কোন সান্ত্বনার প্রলেপ রচনা করেনি। এই মরুভূমিতে মরূদ্যানের আশ্বাস নেই, এমন কি মৃগতৃষ্ণিকার ছলনাময় ভরসাও নেই। সমস্ত ভান মুক্ত হলে, মানুষের অবশ্যম্ভাবী নিয়তি কী সেই কথাই এই মহাকবি তাঁর যন্ত্রণাসিদ্ধ বিষামৃতময় কাব্যের দ্বারা জানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। হয়তো তিনি মনে করেছিলেন, যতোই তথাকথিত ধ্রুবসত্যের মায়াবী কুয়াশা, নিয়তি ও আমাদের মাঝখানে ছলনার জাল রচনা করবে ততোই আমাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হবে, আত্মসমর্পণ সন্নিকট হবে।

তাঁর কাব্যসংকলনের গীতিকবিতা অংশের সর্বশেষ সংকলিত Under Ben Bulben কবিতায় তিনি মৃত্যুর পরে তাঁর স্মরণপ্রস্তরে খোদাই করার জন্য লিখে গিয়েছেন—

Cast a cold eye
On life, on death.
Horseman, pass by.

ইয়েটস্-এর কবিতা জীবনের কবিতা, মৃত্যুর কবিতা এবং জীবনমৃত্যুর দ্বন্দ্বে নৌকার পা দেওয়া আমাদের বিচিত্র মনুষ্যত্বের কবিতা। তিনি চেয়েছেন, জীবনকে এবং মৃত্যুকে আবিলতামুক্ত শীতলচক্ষু দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হোক। তিনি নিজেও বাষ্পহীন ভানমুক্ত 'Cold eye' দিয়ে জীবনকে পর্যালোচনা করেছিলেন, মৃত্যুকেও।

কাশ্মীর ভারতী

অমিয় চক্রবর্তী

উড়ে চলে শুভ্র পারাবত।
শৈল কাশ্মীরের শ্যাম-হিম-কল্পজাগা
অমরনাথের চূড়া ;
অনাদি ভারতী ধ্যানভূমি।
নক্তজাল, দিব্য নীল, মেঘের কান্তার পার হ'য়ে
স্বর্ণাভাস পথগামী
জন্মান্তর সংস্কারের লুপ্ত চিহ্ন বেয়ে
উড়ে চলে শুভ্র পারাবত॥

যোগী ব'সে দেখে ত্রিনয়নে
ইতিহাস গিরিশীর্ষ, নেমে-আসা ধারা
মর্তের সুন্দর শ্রীনগরে।
সীমান্তে তরুর শিল্প, হ্রদের ঝিলিক ধারে ধারে
শিকারার স্রোতযাত্রা, নিশাত বাগান :
প্রাণ হিন্দুস্তানে
লোকায়ত দিব্যতায় বাঁধে
বেদান্ত শাঙ্কর মঠ, বৌদ্ধমূর্তি, ইস্‌লাম মিনার,
রচে এই পার্থিব কাশ্মীর।
ঋষিকাল হতে মন্ত্রবহ
যুক্ত-দৃষ্টি উর্ধ হতে চেনে,
উড়ে চলে শুভ্র পারাবত॥

উত্তরস্থরী

আরো দূরে চলে পক্ষ মেলে।
পঞ্চনদী স্নিগ্ধ তেজ সিঞ্চিত ধূলোয়
লাবণ্য শস্যের কণা শিশু দেহে আনে,
জননী জীবনে ব'য়ে যুগে যুগতলে
ভরে তৃপ্তি উপত্যকা, মাটির তরঙ্গ মহাদেশ।
কত ক্ষুধা, মরুশোক, বুকে ধ'রে
জয়ী তবু তোলে ধ্বজা মানবের ভারতী মহিমা
এই ভূমি ;
বৃহত্তর আর্যাবর্ত মেলে পুণ্য আদি দ্রাবিড়ের
শেষ প্রান্তে, দেখ ওই কন্যা কুমারিকা
বিধৃত সমুদ্র ধ্বনিময় ;
একই মহাজাতি স্থান কাশ্মীরের-দক্ষিণের ধ্যানে।

এই পূর্ণ মুহূর্তের পারে
প্রযান্ত্রিক
শিবাকাশ ধরণীর পটে
উড়ে চলে শুভ্র পারাবত॥

প্রিয়তমাসু

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রিয়া, আমি সব আলো দুহাতে ঠেলেছি, শুধু এক
অপরূপ অন্ধকার তোমার দুচোখে পাবো ব'লে।
উজ্জ্বল আহ্বানও ছিল, সর্বকে অক্লেশে আমি ত্যাগ
ক'রে দেখেছি তখনই সরে গেছে সুদূরে সকলে।
দ্বিতীয় ভুবন আমি র'চে নিতে গিয়েছি বিজনে ;
তোমার স্বর্গীয় স্নেহ বিশ্বস্ত নির্দেশ জেনে, তার
শবলিত শিখীপুচ্ছে বিহ্বল জ্যোৎস্নার শুভ্ররণে,
ভেবেছি, হে লীলাময়ী, যন্ত্রণাও করুণা তোমার।

প্রিয়তমাসু

সম্প্রতি সে করুণায় যদিও র'য়েছি মুগ্ধ, নীচু,—
তবু সংশয়ের কীট কী যেন ব'লেছে। প্রিয়া, আমি
বুঝেছি তোমার ওই বক্ষলগ্ন সারমেয়শিশু—
সে-ই শুধু জানে প্রেম। ব্যর্থতার সামান্য প্রণামী
রেখে দিয়ে আমি তবে স্বকৃত পাপের সব দায়
নিজেকে অর্পণ করে মেগে নেব এবারে বিদায়!

জীবন ভালবেসে

দিব্যেন্দু পালিত

রেণুর বড় ইচ্ছে ছিল আলাদিনের প্রদীপ
যেমন নীল অন্ধকারে প্রচুর আলো দিলো,
অলৌকিকের প্রাপ্ত চোখে অন্ধকারের জ্যোতি,—
এবং কোনো রত্নগুহায় পরশমণি ছিল
রক্তে লোনা স্বাদের প্রেমে হৃদয় বিপ্রতীপ,—
কুড়িয়ে নিয়ে আরেক রূপে হবে সে ভাস্বতী।

কল্পলোকের চিত্রকথা গল্প ক'জন শোনে ;—
সভ্যতাকে হীরের ছুরি দ্বিখণ্ডিত ক'রে
কাচ বানিয়ে কাচের ফ্রেমে আঁটছে পরলোক ;
উৎসর্গের কলম ছাপায় প্রার্থিত ঈশ্বরে—
ভরত আমার রাজা হবেন, রামচন্দ্র বনে
যাত্রা করেন ; ইহধামের চিন্তা এখন শোক!

এবং রেণু, ছোট্ট রেণু, তুষ্ট আলোর হাতে—
দু'হাত দিয়ে আকাশটাকে বুকের কাছে টেনে,
সংঘমিত্রা হয়ে খানিক নাম কুড়িয়ে শেষে
ছড়িয়ে দিলো ; পঙ্ক থেকে কাঁকর শুধু ছেনে
সমস্ত দিন ঘর গড়ছে, ভাঙছে নিজেই রাতে ;—
এইটুকুনই প্রাপ্তি সাধের জীবন ভালোবেসে।

পরিধি

প্রবণকুমার মুখোপাধ্যায়

স্থির জানি বৃত্তের পরিধি
কখনো পারে না কেন্দ্র ছুঁতে ॥
তবু হৃদয়ের প্রতিনিধি
তোমাকেই করেছি। এবং
এঁকে গেছি প্রতিটি ঋতুতে
প্রতীক্ষার বাসনার রং।

তুমি কি কেন্দ্রের মতো, আর
পরিধি হৃদয় আমাদের ?
জানিনা,—জীবন যন্ত্রণার
চিরসঙ্গী কী-না, কিংবা ভুল—
যন্ত্রণাই বুঝি জীবনের
বৃন্তে অন্যনামের মুকুল।

অন্য নাম ? যে-নামে তোমাকে
ডাকি-না, তুমি তো একই। সাড়া
দাওনা, দেবেনা, অপেক্ষাকে
দীর্ঘ রেখে আনন্দ তোমার।
জানি না কখন দুঃখধারা
অমৃতের উৎস পাবে তার।

স্থির জানি বৃত্তের পরিধি
কখনো পারে না কেন্দ্র ছুঁতে।
তবু হৃদয়ের প্রতিনিধি
তোমাকেই করেছি। এবং
এঁকে যাই প্রতিটি ঋতুতে
প্রতীক্ষার বাসনার রং ॥

সমর্পণের আগে

অরবিন্দ কর

আজ অন্য রূপ ধরে আমাকে সাজাও
হে যুবতী কলাময়ী ; উদ্ধত উরসে
তুমি সিন্ধুরংগ বন্দী কর, এ-কথাও
জ্ঞাত দুনয়নে তীক্ষ্ণ শর রাখ বশে।
সুচিক্কন কটি, (শুধু মীনকেতু জানে),
কী করে বিস্তার করে সর্ব্বনাশা মায়া
মৃদংগের অঙ্গ জুড়ে শ্বৈতগান আনে
উষা আনে : যন্ত্রণার শেষ হয় ছায়া।

কিন্তু আজকে ত্যাখো আমি বাউলের মতন অস্থির
পথে বিচ্ছুরিত সমর্পিত মন,
এবং দুঃখের ঋতু ঝরে পড়ছে। আনন্দ স্বস্তির
চিহ্ন নেই ; যা ছিল সমস্ত কিছু করেছি অর্পণ।

অথচ বিশ্বকে ত্যাখো কী সহজে চরাচরে মিতালী পাতায়

গঞ্জেগ্রামে সকলেই খুঁজে পায় গজমতি হার
ফসলের শিল্পরাজা আদিগন্ত কাঞ্চন বিলায়
মেঘ এসে বৃষ্টি দেয় শান্তি পায় ঘরের দুয়ার।

আজ তাই অন্য রূপে আমাকে মজাও
তোমার শরীর পাক শিলা থেকে শিল্পের ভুবন,
যৌবন দিয়েছি আগে ছেড়ে দেব মৃত্যুর আশাও
কেননা জীবন পাব অফুরন্ত শিল্পের জীবন।

রাত্রি, সমুদ্র

নবেন্দু চক্রবর্তী

অন্যমন হয়ো নাকো, নিজের গভীর পরিচয়
চিনে নাও এর-ই মাঝে, প্রথম এ প্রগাঢ় বিস্ময়
হয়তো-বা নিশ্চেতন করে দেবে আমূল তোমার
কিন্তু না ? সমস্ত সংহত করো গড়ো এক মুকুর অপার।

এ মুকুরে এতদিন কি ধরেছো, কি তুলেছো তুমি
যার প্রতিবিম্বে স্থির নিজের বিম্বিত রূপ আকাশ আভূমি
ব্যস্ত ক'রে সুবিশাল সেই গাঢ় ছায়া গড়ে দেবে
নিত্যের সমাধি ক্ষেত্রে যেমন প্রদীপ এক আলো যার কখনো নেভে না।

একথা বলিনা আমি এ মহামুকুরে তুমি তোলো নাই কিছু
চিত্রিত বিবিধ নক্সা, কারুকার্য, বর্ণ আলো কিংবা উঁচু নীচু
জমি, টিলা, বালিয়াড়ি, চন্দ্রিকার রাত এই মত
সুদূর মুখশ্রী কোনো অথবা এ ব্যধিগ্রস্ত সময়ের ক্ষত।

কিন্তু হায় ! সব-ই এ জলের মায়া
ঢেউ এসে বার বার ভেঙে দিয়ে গিয়েছে সে ছায়া,
রচিত হয়নি কোনো অবিকল অখণ্ড মন্দির,
অন্তরাত্মা যেখানেতে স্তব্ধ, মৌন, অবিচল, স্থির।

কিন্তু তুমি এইখানে শান্ত হয়ে কান পেতে শোনো
সিন্ধুর কল্লোলধ্বনি সুদূর আহ্বানে তার কোনো
গূঢ় কিছু বলিছে কি ? বিশাল বিস্তৃতি তার
তোমার অশান্ত প্রাণে তুলিছে কি প্রবল ঝংকার !

রাত্রি, সমুদ্র

সমস্ত সংহত করো, বিফলে দিও না কিছু,
এ আকাশ, নক্ষত্রের রাত্রি, স্নিগ্ধ কিংবা তারো পিছু
অসীম শূন্যতা সব ছেনে নাও, জেনে নাও এ সব-ই তোমার,
বিশাল মুকুরে দেখো প্রতিবিম্ব ধরেছে কি বিপুল বিস্তার।

ভয়

অসিত দত্ত

যৌবন বিগত আজ, প্রায় প্রৌঢ়া, চল্লিশ ছুঁয়েছি।
পিত্ত অম্ল দন্ত চক্ষু—মাঝে মাঝে করে শয্যাশায়ী
জীবন অনিত্য হোক, মাষ্টারিটা আপাতত স্থায়ী
প্রত্যহ গণিত কিম্বা ব্যাকরণ শুধ্‌রে দিয়ে গেছি।

মল্লিকা বলো ত তুমি ত্রিভুজের তিনকোন কত
সমকোন একযোগে? পারবো না? দাঁড়াও। কি বরুণা
শেফালি মালতী ইভা মালবিকা কেউ না, কেউ না?
চাল্লশটি মেয়ে নিয়ে একা আমি, ভয় করে, ভয়।

নির্জন দুপুর ব'লে? জীবনের কুড়িটি শরৎ
নিয়মিত স্কুলে যাই, ইশারা উপেক্ষা করি কত
বৃদ্ধ যুবা শিশুদের—কেউ উগ্র, কেউ অনুগত;
পথ চলি দৃঢ়পায়ে, অন্তহীন—অন্তহীন পথ।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে কয়েকটি যুবক অন্যমনা
একবার দেখল মাত্র, কিন্তু আর ফিরে তাকাল না।

আমি ঈশ্বরকে খুঁজছি

শান্তি লাহিড়ী

আমার চেতনার আলোয় তোমাকে দেখলাম ঈশ্বর,
তুমি খুঁজছ ইতস্তত মাথা গোঁজবার একটু আশ্রয়,
আমার দ্রৌপদী-ইচ্ছা শ্যামকে নিকটে খুঁজে পেয়ে
দেখল সে ঈশ্বর নয়—দয়িতার মত তার মুখ।

অবশেষে ঈশ্বরকে দেখলাম প্রচ্ছন্ন বিবেকে,
অনিচ্ছায় একবার দুটো হাত কপালে ঠেকিয়ে
দূরে এসে ভাবলাম কাকে আমি ঈশ্বর বলেছি এতদিন!
শরীরের সব আলো একে একে নিভে গেল বুঝি।

আমার চেতনার রংএ পান্নাকে সবুজ দেখেছি,
মুমূর্ষুকে তিলে তিলে বাঁচানোর অনিবার্য সুখ।
বলতো ঈশ্বর, তুমি ভাস্করের সৃষ্টিকে কখনো
মরণের মুখ ভেবে আশঙ্কায় কেঁপেও ওঠ নি?
ঈশ্বর, এখানে এসো, আমার আশ্রয়ে সুখে থাকো,
ভাঙা চালে আলো আসবে সমুদ্রের পাখীরা ফিরলে,
সংসারে নানান জ্বালা—জরাজীর্ণ অনিশ্চিত সুখ,
তার চেয়ে আমি দেব মাথা গোঁজবার নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে নারীগণের পতিনিন্দা

ত্রিদিবনাথ রায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিকুলচূড়ামণি ভারতচন্দ্র তাঁহার জনপ্রিয় কাব্য 'বিদ্যাসুন্দর'এ এমন কতকগুলি নূতনত্ব আরোপ করিয়াছিলেন যাহা তাঁহার পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক কোন কবির 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে ছিলনা। তাহার মধ্যে একটি প্রসঙ্গ হইতেছে চোররূপী সুন্দরকে দেখিয়া নগর 'নারীগণের পতিনিন্দা'। আখ্যান কাব্যে নায়ককে দেখিয়া রমণীগণের 'পতিনিন্দা' প্রসঙ্গটি ভারতচন্দ্রের নূতন সৃষ্টি নহে। প্রাচীন মঙ্গলকাব্য সমূহে, বিশেষতঃ শৈব ও শাক্ত মঙ্গল কাব্যে ইহা দেখা যায়। কোন্ সময়ে ইহা প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহা সঠিক বলা যায় না। তবে ইহা যে মধ্যযুগের একটি বিশেষত্ব তাহা কতকটা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। প্রাচীন যুগে যে নারীগণ সকলেই পতিপরায়ণা ছিল তাহা মনে করিবার কোন হেতু নাই, তবে কবিগণ কাব্যে স্ত্রী কর্তৃক পতির নিন্দা বর্ণনা করা সুরুচিসঙ্গত বলিয়া মনে করিতেন না। নায়ককে দেখিয়া নায়িকা ভিন্ন অপর রমনীদিগের কামোদ্ভবের বর্ণনা বহু প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে আছে কিন্তু নারীগণ কর্তৃক পতিনিন্দা নাই।১ প্রাচীন বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যে নায়ক কৃষ্ণকে দেখিয়া গোপীগণের কামোদ্ভবের কথা আছে কিন্তু কোন কবিই তাহাদের মুখ দিয়া পতিদিগের নিন্দা করান নাই।

---

১ "বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস" নামক গ্রন্থে শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় লিখিয়াছেন : "এই রীতিটি মূলতঃ সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়" এবং তৎসম্পর্কে বাণভট্টের "কাদম্বরী"তে গুরুগৃহ প্রত্যাগত চন্দ্রাপীড়কে দেখিয়া বিদিশা নগররমণীগণের আলাপের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সে আলাপে কোথাও পতিনিন্দা বা স্বামীদুর্ভাগ্যের কথা নাই, কেবলমাত্র সমবয়সী যুবতীগণের মধ্যে চন্দ্রাপীড়ের রূপদর্শনে সাত্ত্বিকরসের উদ্রেক লইয়া উপহাস আছে। 'নৈষধচরিত' ও 'বিক্রমাংকদেব-চরিতে' অনুরূপ বর্ণনা আছে কিন্তু পতিনিন্দা নাই।

কিন্তু কুলবধূগণ কর্তৃক পতিগৃহের নানা জ্বালার বহু বর্ণনা আমরা সং সাহিত্যে পাই যেমন,

"নিঃস্নেহ পতিরুদ্ধিতা করুণয়া শ্বশ্রূরজস্রং বৃথা
বাগ্‌বাণৈর্হৃদয়ং ভিনত্তি কলহোত্তালাঃ পুনর্যাতরঃ।
নিত্যংনিন্দতি নৈব নন্দতি কদাপ্যেষা ননন্দাপি
তস্মাতঃ কং শরণং ব্রজামি তরুণী দীনাহমেকাকিনী॥"

অর্থাৎ, "পতি স্নেহহীন, শ্বশ্রূ করুণাহীনা, কলহপরায়ণা জা'য়েরা আবার অজস্র বৃথা বাক্যবাণে হৃদয় বিদীর্ণ করে, ননদিনীগণ নিত্য নিন্দা করে, কখনও তাহারা সন্তুষ্ট হয় না সুতরাং মা, আমি একাকিনী তরুণী কাহার শরণ লইব ?"

"কান্তঃ কৃতান্তচরিতঃ কুটিলা তদম্বা
বজ্রোপমানি বচনানি চ দুর্জনানাম্।
প্রত্যঙ্গমন্তরতনোঃ প্রহরন্তি বাণাঃ
প্রাণাঃ পুনঃ সখি বহির্ন খলু প্রয়ান্তি॥"

অর্থাৎ

"কান্ত যমের মত তাহার মাতা কুটিলা, দুর্জনদিগের বাক্য বজ্রের মত, মনসিজের বাণগুলি প্রতি অঙ্গে আঘাত করিতেছে তবু সখি, প্রাণ তো আমার বাহির হইতেছেনা।"

বিহ্লনের 'বিক্রমাংকদেবচরিত'এ আছে স্বয়ংবর হইতে প্রত্যাগত যুবরাজকে দেখিবার জন্য নগরের গবাক্ষে ও ছাদে যুবতীগণের ভিড় লাগিয়া গিয়াছে; সেখানে

"শ্বশ্রূং মুহুঃ শ্রোত্রকঠোরবাচং
নিরীক্ষ্য পৃষ্ঠে বিনিবারয়ন্তীম্।
অনঙ্কুশত্বাৎ কৃতপুণ্যমেকা
পণ্যাঙ্গনাত্বং গণয়াম্বভূব॥" (১২।৩১)

"কোন এক বধূ বারংবার পিছন হইতে শ্বশ্রূকে শ্রুতিকঠোর বাক্যে নিষেধ করিতে দেখিয়া বেশ্যার জীবন নিরঙ্কুশ এবং তাহা পুণ্য করিলে লাভ করা যায় তাহাই মনে করিতে লাগিল।"

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী মুকুন্দ কবিচন্দ্র কৃত 'মাণ্ডলীমঙ্গল'এ (ষোড়শ শতাব্দী) এবং কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম কৃত 'চণ্ডীমঙ্গল'এ

(সপ্তদশ শতাব্দী) আমরা 'নারীগণের পতিনিন্দা' প্রসঙ্গটি দেখিতে পাই। 'বাশুলীমঙ্গলে' ধূসদত্ত ও রুক্মিনীর বিবাহ প্রসঙ্গে বরের রূপ দেখিয়া নারীগণের পতিনিন্দার যে বর্ণনা আছে তাহা সংক্ষিপ্ত, তবে পরবর্তী কবি মুকুন্দরাম তাঁহার বৃহত্তর কাব্যে ইহাকেই আরো বিশদ করিয়াছেন। কিন্তু মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্যের প্রথমভাগে 'শিববিবাহ'এ নারীগণের পতিনিন্দাটি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করায় পরবর্তী অংশে ধনপতির বিবাহে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। 'বাশুলীমঙ্গলে' শিববিবাহ প্রসঙ্গে এ বর্ণনাটি একেবারেই নাই।

আমরা নিম্নে 'বাশুলীমঙ্গলের' পতিনিন্দা প্রসঙ্গটি উদ্ধৃত করিতেছি—

"দেখিয়া সাধুর রূপ যতেক অবলা।
আঁখি আঁখি ঠারাঠারি হৃদয় চঞ্চলা॥
যেন হাণ্ডি তেন সরা বিধির ঘটন।
হেম মরকত যেন অভেদ মিলন॥
হরগৌরী আরাধন কৈল ভাগ্যবতী।
তে কারণে বিধি হেদে দিলেক সুপতি॥
পুরব জনমে মোরা কত কৈল পাপ।
পাপের ফলেতে মোরা পাইল পতি-তাপ॥
আমার পতির কথা শুন হেদে সই।
তুমি সে দুঃখের দুঃখী তেঞি তোরে কই॥
উঠিয়া না দেয় পাশ বড় গতরশুকা।
কোলের ভিতর থাকে যেন ভেকাচকা॥
আর রামা হাস্যা বলে তুমি তবু ভাল।
ছয় বুড়ির তৈল আনি এক গোদে গেল॥
আর রামা বলে দিদি শুন গো বারতা।
জীয়ন্ত ভাতারে আমি হইলাম বিধবা॥
চারিপণ পোন্ত খায় গায়ে নাহি বল।
মুগল করের খাড়ু বেচিল সকল॥
বসন্তী বলেন সই মোর কথা শুন।
আমার ভাতারের আছে ত্রিকুট লক্ষণ॥

নাসা অস্ত্র নাহি তার দশন বর্জ্জিত।
সর্বাঙ্গ বেষ্টিত দাদ্র দেখিতে কুৎসিত॥"

এই বর্ণনাটি অতি সংক্ষিপ্ত, ইহার মধ্যে গোদা এবং ত্রিকুটলক্ষণ ও দাদযুক্ত স্বামী এই দুইটি রোগগ্রস্ত স্বামী। অপর দুইটির মধ্যে একটি অলস অপরটি দুর্বল। কবিকঙ্কণের কাব্যে যে ছয়জন নারী পতিনিন্দা করিয়াছে তাহার মধ্যে দুজনে স্বামী রোগগ্রস্ত (১) গোদা (২) অন্ধ (৩) কালা (৪) কুব্জ। বাকী দুইজনের মধ্যে একজন 'দশন-বর্জিত' অর্থাৎ বৃদ্ধ ও অপরটি স্ফীতোদর। রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁহার 'শিবায়ন' কাব্যে শিববিবাহ প্রসঙ্গে মুকুন্দরামের ন্যায় 'নারীগণের পতিনিন্দা' বর্ণনা না করিয়া তৎপরিবর্তে শ্বাশুড়ীগণ কর্তৃক 'জামাতৃনিন্দা' বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে 'সাপও মরিল লাঠিও ভাঙ্গিল না, অর্থাৎ স্ত্রী কর্তৃক স্বামীনিন্দা ও বর্ণনা করা হইল না অথচ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। ইহাতে অন্ধ, কুব্জ, কোরণ্ডযুক্ত, বামন, গোদা ও বৃদ্ধ জামাতার নিন্দা আছে। সুতরাং ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী সকল কবিই বিকলাঙ্গ বা রোগগ্রস্ত স্বামীর জন্য স্ত্রীর আক্ষেপ বর্ণনা করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রেই আমরা প্রথম বৃত্তি বা profession এর জন্য স্ত্রীর প্রতি অবহেলা জনিত স্বামীর দাম্পত্য-ধর্মের শৈথিল্যহেতু নারীর মুখ দিয়া অনুযোগের সুর শুনিতে পাই।

ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী দু'একটি 'মনসামঙ্গল' কাব্যে 'নারীগণের পতিনিন্দা' প্রসঙ্গটি আছে। বাঙ্গলাভাষায় রচিত যে কয়টি বিদ্যাসুন্দর' কাব্য বর্তমানে আমাদের হাতে আসিয়াছে তাহার মধ্যে গোবিন্দদাসের কাব্যটিই প্রাচীনতম, ইহাতে এ প্রসঙ্গটি একেবারেই নাই। তাঁহার পরবর্তী কবি কৃষ্ণরাম তাঁহার কাব্যে চোররূপী সুন্দরকে কোটালের হস্তে বন্দী দেখিয়া নারীগণের যে আক্ষেপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে পতিনিন্দা নাই, বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় রমণীগণ বাৎসল্য বশে সুন্দরের মাতার জন্য সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন। ভারত-চন্দ্রের সমসাময়িক কবি রামপ্রসাদ কৃষ্ণরামেরই পদাংক অনুসরণ করিয়াছেন সুতরাং তাঁহার কাব্যেও এ প্রসঙ্গ নাই। এইখানে তাঁহার কাব্যে নগররমনী-গণ সুন্দরের রূপের প্রশংসা করিয়াছেন সত্য কিন্তু বিদ্যার জন্য সমবেদনা প্রকাশ করা ছাড়া তাহাতে আর কিছু নাই। বরং হীরার উক্তিতে সুন্দরের প্রতি হীরার বাৎসল্য ফুটাইয়া হীরার চরিত্রের উত্তম অংশটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু পরবর্তী কবি মধুসূদন চক্রবর্তীর কাব্যে অতি সংক্ষেপে সাধারণ ভাবে

নগরবাসীগণের খেদ বর্ণনা আছে নারীগণের পতিনিন্দা নাই। বলরামের কাব্যেও তাহা নাই, কুলবতীগণের আক্ষেপ সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিজ রাধাকান্ত ভারতচন্দ্রের বহু পরবর্তী কবি; তিনি এইভাবে এই প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন—

"পুত্রভাবে ক্রন্দন করয়ে বৃদ্ধগণ।
মজিল পরের বাছা বিদ্যার কারণ॥
কামাকুল হয়া বলে যতেক যুবতী।
এরূপ দেখিয়া যদি কাটে নরপতি॥১
এ ছার রাজার দেশে না করিব ঘর।
ভিখারী হইয়া যাব দেশ দেশান্তর॥

ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী কাব্যগুলির মধ্যে অধিকাংশগুলিতে এই প্রসঙ্গ বর্ণনায় কেবলমাত্র নারীগণের নিজ নিজ দুর্ভাগ্যের বর্ণনা ব্যতীত আর কিছু নাই কেবলমাত্র কবিকঙ্কণের কাব্যে কিছু হাস্যরস বা Satire এর উপাদান পাই। এবং তাঁহার রচনাশৈলীও অন্যান্য কাব্যগুলি হইতে উৎকৃষ্ট। আমরা ভারতচন্দ্রের সহিত অন্যান্য কবিদিগের বর্ণনার তুলনামূলক সমালোচনা করিবার পূর্বে কয়েকটি কথা বলতে চাই। বিদ্যাসুন্দরে কাব্যগুলিতে দুইটি প্রসঙ্গে সুন্দরের রূপ দেখিয়া নগরবাসিনী যুবতীগণের appreciation বা গুণগ্রহণের বর্ণনা আছে। প্রথমতঃ সরোবরতীরে তরুতলে পথক্লান্ত সুন্দরকে বিশ্রাম করিতে দেখিয়া সরোবরে জল লইতে আগত রমণীগণের উক্তি। দ্বিতীয়তঃ সুন্দরকে কোটাল বন্দী করিয়া পথ দিয়া লইয়া যাইবার সময় তাহাকে দেখিয়া নগরবাসিনী যুবতীগণের উক্তি। সুপুরুষ নায়ককে দেখিয়া নগরবাসিনী যুবতীগণের মনে সাত্ত্বিকরসের সঞ্চার ও তাহাদের বিভ্রমের বর্ণনা আমরা বহু সংস্কৃত ও বাংলা কাব্যে পাই। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগের কাব্যে পর্য্যন্ত ইহার দর্শন মিলে। ইহা সাধারণ ধর্ম সুন্দরী রমণীকে দেখিয়া যেমন পুরুষের মনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাত্ত্বিকভাবে সঞ্চার হয়

---

১ বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত 'বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী'তে ইহার পর ভারতচন্দ্রের দুইটি পংক্তি জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে—"বিদ্যারে করিয়া চুরি এই হইল চোরা। ইহারে যদ্যপি পাই চুরি করি মোরা॥"

তেমনি সুন্দর পুরুষকে দেখিয়া রমণীদিগেরও মনে আপনা হইতেই সাত্ত্বিক-রসের সঞ্চার হয় ও সেই পুরুষের সৌন্দর্য্যের গুণগ্রহণ তাহারা প্রকাশ্যে না করিলেও অন্তরে অন্তরে করে। প্রাচীন কবিগণ তাই এই শৃঙ্গাররসঘটিত বর্ণনাটি সুললিত কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু পতিসঙ্গ-সুখ-বঞ্চিতা বা অতৃপ্তকামা রমণীর আক্ষেপোক্তি একটা স্বতন্ত্র ব্যাপার। অন্যান্য বিদ্যাসুন্দর কাব্যে প্রথমটি আছে, দ্বিতীয়টি নাই কিন্তু ভারতচন্দ্রে আমরা দুইটিই দেখিতে পাই। আমি অন্যত্র প্রথমটি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি১ সুতরাং এখানে তাহার পুনরুক্তি করিব না। শ্রীযুত আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার 'মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস'এ ভারতচন্দ্র রচিত 'নারীগণের পতিনিন্দা' বলিয়া যে অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা এই প্রসঙ্গটির অন্তর্গত, ইহাতে পতিনিন্দা নাই। আমরা এইবার ভারতচন্দ্রের 'পতিনিন্দা' প্রসঙ্গটির তুলনামূলক সমালোচনা করিব।

প্রথমতঃ ভারতচন্দ্র নগর-রমণীগণকে দিয়া সুন্দরের রূপের তারিফ করিয়াছেন—

চোর দেখি রামাগণ বলে হরি হরি।
আহা মরি চোরের বালাই লয়ে মরি॥
কিবা বুক কিবা মুখ কিবা নাক কান।
কিবা নয়নের ঠার কাড়ি লয় প্রাণ॥
ভূষণ লয়েছে কাড়ি হাতে পায়ে দড়ি
কেমনে এমন গায়ে মারিয়াছে ছড়ি॥
দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার।
হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার॥
এ বড় বিষম চোর না দেখি এমন।
দিনে কোটালের কাছে চুরি করে মন॥
বিদ্যারে করিয়া চুরি এ হইল চোরা।
ইহারে যদ্যপি পাই চুরি করি মোরা॥

---

১ *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৬০।২।৭৩-৭৬

দেখিয়া ইহার রূপ ঘরে যেতে নারি।
মনোমত পতি নহে সহিতে না পারি॥

এই ধরণের উক্তি আমরা অন্যান্য বিদ্যাসুন্দরে সরোবরতীরে সুন্দরকে দেখিয়া নারীগণের বিতর্ক' প্রসঙ্গে দেখিতে পাই কিন্তু চোর সুন্দরকে দেখিয়া নারীগণের উক্তির মধ্যে এরূপ কোন বর্ণনা নাই। ইহার পর ভারতচন্দ্র নারীগণের পতিনিন্দা বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমে পতিদিগের দৈহিক দোষ ত্রুটি উপলক্ষ্য করিয়া নারীগণ আক্ষেপ করিয়াছে। পরে স্বামীদিগের বৃত্তি লইয়া ও সেইজন্য পত্নীদিগের প্রতি অবহেলার উপর কটাক্ষ করিয়া ভারতচন্দ্র সুদীর্ঘ পতিনিন্দা প্রসঙ্গটিতে সে যুগের মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীগণের কি জীবিকা ছিল তাহার পরিচয় দিয়াছেন। এই দ্বিতীয় অংশটি ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী কোন কবির কাব্যে নাই।

(ক) প্রথম অংশটি ভারতচন্দ্র যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন আমরা তাহার তুলনামূলক সমালোচনা করিব।

(১) ভারতচন্দ্র প্রথমে কালার পত্নীর খেদ এইভাবে বর্ণনা করিতেছেন—

আপন আপন পতি নিন্দিয়া নিন্দিয়া
পরস্পর কহে সবে কান্দিয়া কান্দিয়া॥
এক বামা বলে সই শুন মোর দুখ।
আমারে মিলিল পতি কালা কালামুখ॥
সাধ করি শিখিলাম কাব্যরস যত।
কালার কপালে পড়ি সব হৈল হত॥
বুঝাই চোরের মত চুপ করি ঠারে।
আলোতে কিঞ্চিৎ ভাল প্রমাদ আঁধারে॥
নৈলে নয় তেঁই করি কষ্টেতে শয়ন।
রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন॥

এই বিষয়টি কবিকঙ্কন এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

আর যুবতী বলে সখি মোর পতি কালা।
অন্তের হইল্য ঘরকন্না মোর হইল্য আলা॥
ঠারে ঠোরে কথা কহি দিনে পতি সনে।
রাত্রি হলে থাকে যেন পশুর শয়নে॥[১]

১ বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে 'গরুড় শয়নে' পাঠ আছে।

রন্ধনের তরে আমি যদি চাহি জল।
দড়ি ধর‍্যা এনে কালা দেয় মোরে ছাগল॥

"বাশুলীমঙ্গল" বা "শিবায়নে" এই কালার বর্ণনা নাই। কবিকঙ্কনের বর্ণনায় রাত্রে শয়নকালে স্বামীর সহিত কোনরূপ প্রেমালাপ করিতে পারে না বলিয়া স্ত্রী আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে, সে পশুর মত নির্বাক হইয়া শুইয়া থাকে এবং জল চাহিলে কালা দড়ি ধরিয়া ছাগল আনিয়া দেয় এই বলিয়া কবি ব্যঙ্গ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র কিন্তু পত্নীর প্রকৃত দুঃখ সুস্পষ্ট ও সুন্দর করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের এই বর্ণনার শেষ পংক্তি দুইটি আজিও প্রবাদ বাক্য হইয়া রহিয়াছে। ভারতচন্দ্রের অনুকরণে এক শতাব্দী পরবর্তী এক কবি কালিকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার "অবলা প্রবলা" কাব্যে বিস্তৃতভাবে নারীগণের পতিনিন্দা বর্ণনা করিয়াছেন; তাহাতে তিনি কালাপতি সম্বন্ধে পত্নীর উক্তি এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

ভাগ্যগুণে মোর ভাগে মিলিল বধির।
কহিলে সরস বাক্য হ'য়ে থাকে স্থির॥
আভাস বুঝিতে নারে চাহে মোর পানে।
কটু বুঝি কহি তারে মনে হেন মানে॥
কি করিব রসিকতা হেরে তার মুখ।
বেদনায় বুক ফাটে দূরে যায় সুখ॥
কত করি মিষ্টালাপ না শুনিতে পায়।
ঢালিলে ভস্মেতে ঘৃত কিবা ফল তায়॥
যেমন লোচনহীনে অর্পণে দর্পণ।
না জানে তাহার গুণ বলে সে কেমন॥
তাদৃশ হইল মম প্রেম কাব্যামৃত।
ভেবে ভেবে চিরদিন হয়ে আছি মৃত॥
একবার ভাবি আর না রহিব ঘরে।
বাহির হইব কুল রাখি কিবা করে॥
রাখিয়া একুল গেল একুল ওকুল।
বিরহ সাঁতারে সখি নাহি দেখি কুল॥

অকূল হেরিয়া কূলে দিতে চাই ছাই।
প্রতিকূল প্রতিবাসী এ আর বালাই॥
আকুল পরাণ এই সকল কারণে।
কুলকুণ্ডলিনীকুল দিতে কতক্ষণে॥
মুকুল ফুটিয়া এবে যৌবনের যায়।
কবে অনুকূল বিধি হবে হায় হায়॥"

এই দীর্ঘ খেদোক্তিটির মধ্যে বস্তু বিশেষ কিছু নাই শেষের অর্ধেক অংশ তো 'কূল' এই শব্দটিকে লইয়া দুর্বল অনুপ্রাসের চেষ্টা করা হইয়াছে। এতদ্‌-ভিন্ন আরও অনেক কাব্যে কালা পতির সম্বন্ধে খেদোক্তি আছে কিন্তু কোনটিই ভারতচন্দ্রের বর্ণনার সঙ্গে তুলনীয় নহে।

(২) ইহার পর ভারতচন্দ্র অন্ধপতির পত্নীর খেদোক্তি বর্ণনা করিতেছেন—

"আর রামা বলে সই এ ত বরং সুখ।
মোর দুখ শুনিলে পালাবে তোর দুখ॥
মন্দভাগা অন্ধপতি মধ্যে মাত্র ভাল।
গোরা ছিনু ভাবিতে ভাবিতে হৈনু কাল॥
ভরা পুরা যৌবন উদাসে বাসি শূন্য।
আঁধলারে দেখাইলে নাহি পাপ পুণ্য॥"

কবিকঙ্কণ লিখিতেছেন—

"আর যুবতী বলে সই মোর কর্ম্মমন্দ।
অভাগিয়া পতি মোর দুই চক্ষু অন্ধ॥
কোন দেশে দুখিনী নাহিক মোর পারা।
কোলের কাছে থাকিতে সদাই করে হারা॥
অন্ধ মুনির মত মোর গেল সর্ব্বকাল।
জলপাত্র বলয়া কাণা তুল্যাছে বিড়াল॥"

রামেশ্বর লিখিয়াছেন—

"ছকী বলে আরে আমার ছার কপাল ঝি।
অন্ধ বরে বিভা দিনু খুদী হেন ঝি॥
শুয়ে থাকে শয্যায় সুন্দরী করি কোলে।
হারা তাকে হারাইয়া হাতাড়িয়া বুলে॥

ষোড়শী সুন্দরী নারী সেকি তাকে সাজে।
পাদকুড়া পোক যেন পদ্মফুল মাঝে ॥"

ভারতচন্দ্রের কাব্যে যুবতী নারী তাহার কলহ প্রিয় অন্ধ স্বামীকে তাহার রূপযৌবন দেখাইতে না পারিয়া খেদ করিতেছে। কবিকঙ্কণের বর্ণনা এক্ষেত্রে ভারতচন্দ্রের অপেক্ষা সরস। রামেশ্বর কবিকঙ্কণেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন এবং তাঁহার শেষ দুই পংক্তি হয়ত ভারতচন্দ্রের বর্ণনাকে প্রভাবিত করিয়াছিল।

পরবর্তীকালে কালীকুমার তাঁহার 'অবলা প্রবলা' কাব্যে এই প্রসঙ্গটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

"অভাগীর পতি অন্ধ কৈতে ফাটে প্রাণ।
দেখিতে না পায় কিছু রৈলে বিদ্যমান ॥
হলুদী কাঞ্চন জিনি তনু মনোহর।
ভূধর ধরিল ধরা হেন পয়োধর ॥
কি কব রূপের কথা শশী হারে মুখে।
সে যে নাহি দেখে ইহা মরি সেই দুঃখে ॥
হাবভাব কটাক্ষ কি হবে তার কাছে
নিশি সব শব হেন আঁখি মুদি আছে ॥
অঙ্গভঙ্গ বৃথা গুন রতি সবিশেষ।
করিতে চুম্বনাধর চুম্বে অন্য দেশ ॥
ক্ষেপণ না করি তীরে লক্ষ্যে আপনার।
অপর শরীরে মারে একি চমৎকার ॥
দ্বিগুণ আগুন জলে এই সব গুণে।
বিগুণ বিধাতা ঝাঁপ দিব কি আগুনে ॥
গুঞ্জরিছে অলিকুল গুন্ গুন্ করি।
কত গুণ ধরে গুণধরে আহা মরি ॥
কামশরে পুষ্পগন্ধে হু হু করে প্রাণ।
কবে তার হাত হৈতে পাব পরিত্রাণ ॥"

এই বর্ণনার মধ্যে কিঞ্চিত গ্রাম্যতা দোষ আছে তথাপি ইহা সুরচিত কাব্য।

(৩) তাহার পর ভারতচন্দ্র লিখিতেছেন—

ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে নারীগণের পতিনিন্দা

"আর রামা বলে সই এ মাথার চূড়া।
আমি এই যুবতী আমার পতি বুড়া॥
বদনে রদন লড়ে অদনে বঞ্চিত॥
সে মুখচুম্বনে সুখ না হয় কিঞ্চিত॥
আমার আবেশ দৈবে কোনকালে নয়।
ধর্ম্ম ভাবি তাহার আবেশ যদি হয়॥
ঝাঁপনি কাঁপনি সারা কেবল উৎপাত।
অধর দংশিতে চায় ভেঙ্গে যায় দাঁত॥
গড়াগড়ি যায় বুড়া দাঁতের জ্বালায়।
কাজের মাথায় বাজ বাঁচাইতে দায়॥"

কবিকঙ্কণ এই প্রসঙ্গে লিখিতেছেন—

"আর জন বলে পতি বঞ্চিত দশন।
ঝোল ঝাল বিনা তার না হয় অশন॥
কঠিন ব্যঞ্জন আমি যেই দিন রান্ধি
মারয়ে পিড়ীর বাড়ি কোনে বসে কান্দি॥১

রামেশ্বর তাঁহাকে 'শিবায়নে' কবিকঙ্কণেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

"সোহাগী সন্তাপ করে সম্পদীর তরে।
বুড়াবরে বেটী দিয়া বুক ফাট্যা মরে॥
তরুণী তাহার বিষ বাসে নাহি ভাল।
দুহিতার দুঃখে দেহ দগ্ধ হ'য়ে গেল॥
সরস ব্যঞ্জন বিনু খাত্যে নারে অন্ন।
একটুকু মন্দ হ'লে মারে মতিচ্ছন্ন॥"

'অবলাপ্রবলা' কাব্যে কালীকুমার লিখিতেছেন—

"অভাগীর ভাগ্যেতে পাইনু বৃদ্ধ পতি।
শক্তি বিনা নাহি ইচ্ছা করিবারে রতি॥

১" আর যুবতী বলে পতির বর্জ্জিত দশন। শাক-সূপ ঘণ্ট বিনে না করে ভোজন॥
দড় বেঞ্জন আমি যেই দিন রান্ধি। মারয়ে পিড়ির বাড়ি কোনে বস্যা কান্দি॥
(বিশ্ববিদ্যালয় সং)

দিবানিশি শয্যোপরে করিয়া শয়ন।
জীর্ণদেহ লোল মাংস বাহিরে দশন ॥
না হয় বাসনা কভু করিতে রমণ
তাহে কি সন্তোষ হয় রমণীর মন ॥
তবে যদি চেষ্টা করি করি আয়োজন।
সে বলে বিপদ একি হইল ঘটন।
তুলিতে না পারে কটি কোটি কোটি বারে।
আঘাতে মূর্চ্ছিত দায় বাঁচাইতে তারে ॥
ত্রাহি ত্রাহি করে বলে কোথা ওরে প্রাণ।
বিপদ সাগরে রক্ষা কর মোর প্রাণ ॥
দেখ একে মদনে বিদীর্ণ দেহ যার।
করে শরে শরে তাহে বিপদ আবার ॥"

এই বর্ণনা কাব্য হিসাবে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। সব কয়টি বর্ণনা তুলনা করিলেই ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব আপনিই উপলব্ধি হইবে। ইহার পরে ভারতচন্দ্র যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা আর কোন কাব্যে নাই। ভারতচন্দ্র সম্ভবতঃ কবিকঙ্কণের কাব্যে বর্ণিত কুজ পতির দৃষ্টান্তে স্ফীতোদর পতির বর্ণনা করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র লিখিতেছেন—

(৪) "আর রামা বলে বুড়া মাথার ঠাকুর।
মোর দুঃখ শুনি তোর দুঃখ যাবে দূর ॥
কি কব পতির কথা লাজে মাথা হেঁট।
মোটা সোটা মোর পতি বড় ভুড়ো পেট ॥
অন্যের শুনিয়া সুখ দুঃখে পোড়ে মন।
একেবারে নহে কভু চুম্ব আলিঙ্গন ॥
বদন চুম্বিতে চাহে আরম্ভিয়া হেটে।
আঁটিয়া ধরিতে চাহে ঠেলে ফেলে পেটে ॥
একে আরম্ভিতে হয় আরে অবসর।
ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্ট ন পূর্ব্ব ন পর ॥"

ভারতচন্দ্র ইহাতে হাস্যরসের একটি অপূর্ব উদাহরণ দিয়াছেন। ইহার পরবর্তী দুইটি পংক্তিতে তাহা আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে—

"আর রামা বলে ইথে না বলিহ মন্দ।
না চাপিতে চাপ পাও এ বড় আনন্দ॥"

ইহার সঙ্গে কবিকঙ্কণের কুব্জ পতির বর্ণনার উদাহরণ দিতেছি—

"অরি যুবতী বলে সখি মোর কথা বুঝ।
অভাগিয়া পতি মোর পিঠে বড় কুব্জ॥
চিৎ হয়্যা শুতে নারে কুব্জের প্রকারে।
খুঁড়িয়া রেখ্যাছি খন্দ মেঝের ভিতরে॥"

ইহাতে হাস্যরসের উপাদান বিশেষ নাই।

(৫) তাহার পর বামনের স্ত্রীর আক্ষেপ বর্ণনা করিতেছেন—

"বামন বন্ধুর পতি কৈতে লাজ পায়।
তপাসিয়া নাহি পাই কোলেতে লুকায়॥
তাপেতে হইনু জরা না পুরিল সাধ।
হাত ছোট আম বড় এ বড় প্রমাদ॥
আর রামা বলে সই না ভাবিহ দুখ
কোল শোভা হয়ে থাকে এহ বড় সুখ॥"

রামেশ্বরের কাব্যই সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্রের এই বর্ণনাটিকে কিছুটা প্রভাবিত করিয়াছে—

"চক্ষু চাপি চাড় কর্যা চাড়ু বলে কি॥
বক্ষ বরে বিভা দিনু বুঝি হেন ঝি॥
শয্যায় শিশুর পারা শুয়্যা থাকে কোলে।
কদাচ কান্তের প্রায় কেহ নাহি বলে॥"

(খ) এইবার ভারতচন্দ্র যাহা বর্ণনা করিতেছেন তাহা তাঁহার নিজস্ব। তাঁহার পূর্বে কেহ 'পতিনিন্দা' প্রসঙ্গে স্বামীর বৃত্তির প্রতি স্ত্রীদিগের শ্লেষের কথা উল্লেখ করেন নাই। ভারতচন্দ্র সেই যুগের বিভিন্ন বৃত্তিজীবি মধ্যবিত্ত সমাজের ব্যক্তিগণের স্ত্রীদিগের নিজ নিজ পতি সম্বন্ধে উক্তি কিঞ্চিৎ শ্লেষ সহকারে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা হইতে সে যুগের মধ্যবিত্ত বাঙালীর বৃত্তি ও তাহাদিগের নিজ চাকুরী রক্ষা করিতে গিয়া দাম্পত্য কর্তব্যে কিরূপ অবহেলা ঘটিত তাহা সুরসাল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আছে রাজসভার বৈদ্য, রাজার সভাপণ্ডিত, রাজার গণক, মুনসী, বখশী, উকিল,

আরজবেগী, খাজাঞ্চি, পোদ্দার, হিসাবের মুহুরী, নিকাশের মুহুরী, বাজেজমার মুহুরী, দপ্তরী, ঘড়িয়াল ও কবি। আমরা ইহার মধ্যে কয়েকটির উদাহরণ দিতেছি—

"রাজ সভাসদ্ পতি বৈদ্য বৃত্তি করে।
ভোজনের কালে মাত্র দেখা পাই ঘরে ॥
নাড়ী ধরি স্থানে স্থানে করয়ে ভ্রমণ।
আমি কাঁপি কামজ্বরে সে বলে উল্বন ॥
চতুর্মুখ খাইতে বলে শুনে দুঃখ পায়।
বজ্জর পড়ুক চতুর্মুখের মাথায় ॥"

• • •

"আর রামা বলে সই ভাল ত মুনশী।
বখশী আমার পতি সদাই খুনশী ॥
কিঞ্চিত কত্তর নাহি কত্তর কাটিতে
বেহিসাবে একবিন্দু না পারি লইতে ॥
পরের হাজীর গরহাজীর লিখিতে।
ঘরে গরহাজীরী সে না পায় দেখিতে ॥
ফেরেব ফিকিরে ফেরে ফাকি ফুকি লেখে।
কেবল আমার গুণে পুত্র মুখ দেখে ॥"

• • •

"আর রামা বলে সই এ বড় রসিক।
অভাগীর পতি বাজেজমার মালিক ॥
যম সম ধরিতে পরের বাজে জমা
নিজঘরে বাজে জমা না জানে অধমা ॥
সবে তার একগুণে প্রাণ ঝুরে মরে।
বঁধু এলে তার ডরে কেহ নাহি ধরে ॥"

• • •

"আর রামা বলে সই এত শুনি ভাল।
ঘড়েল পতির জ্বালে আমি হৈনু কাল ॥

রাত্রি দিন আটপর ঘড়ী পিটে মরে।
তার ঘড়ী কে বাজায় তল্লাশ না করে॥
রাতি নাহি পোহাইতে দুঘড়ী বাজায়।
আপনি না পারে আরো বন্ধুরে খেদায়॥"

কালীকুমার তাঁহার "অবলাপ্রবলা' কাব্যে এরূপ দুইটি বৃত্তিজীবি ব্যক্তির পত্নীর উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন—দূতের স্ত্রী ও পণ্ডিত ব্রাহ্মণের স্ত্রী। কিন্তু এই বর্ণনা অকারণে দীর্ঘ ও মোটেই রসোত্তীর্ণ নহে।

ভারতচন্দ্র শেষ যে দুইটি বর্ণনা দিয়াছেন তাহার মধ্যে কুলীন কন্যার আক্ষেপোক্তিটি বড়ই মর্মস্পর্শী—

"আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে।
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে॥
যদি বা হইল বিয়া কতদিন বই।
বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই॥
বিয়াকলে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বাদ লাগে
পুনর্ব্বিয়া হবে কিবা বিয়া হবে আগে॥
বিবাহ করেছে সেটা কিছু ঘাটি বাটি।
জাতির যেমন হোক কুলে বড় আঁটি॥
দু চারি বৎসরে যদি আসে একবার।
শয়নে করিয়া বলে কি দিবি ব্যভার॥
সুতা বেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায়।
তবে মিষ্ট মুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায়॥"

ভারতচন্দ্রের পরবর্তী বহুকাব্যে কুলীন কন্যাদিগের নানাবিধ দুর্গতির বর্ণনা দেখিতে পাই সেসকল উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। বিকলাঙ্গ স্থবির কুৎসিত বা চিররুগ্ন স্বামীকে মন হইতে কোন স্ত্রীই ভালবাসিতে পারে না। কোন পিতাই এইরূপ বরকে কন্যাসম্প্রদান করিতে ইচ্ছুক নহেন। কামশাস্ত্রে লিখিত আছে—

"বৃদ্ধো দুর্ব্যসনো দয়াবিরহিতো রোগী মহাপাপবান্
ষণ্ঢো দুষ্টকুলোদ্ভবশ্চ পিশুনো দ্যূতেঽতিবদ্ধস্পৃহঃ।

নির্বিত্তঃ কৃপণোঽতিচঞ্চলমতির্নিত্যপ্রবাসীঋণী
ভিক্ষুঃ স্নেহবিবর্জিতঃ সুমতিভিঃ কার্যোবরোনেদৃশঃ ॥

(অনঙ্গরঙ্গ : ৮।৮)

অর্থাৎ বৃদ্ধ, মদ্যব্যসনাসক্ত, নির্দয়, চিররুগ্ন, অতিপাপী, দুষ্ট-কুলোদ্ভব, ধনহীন, কৃপণ, জুয়াড়ী, অতি চঞ্চলমতি, নিত্যপ্রবাসী, ঋণগ্রস্ত, ভিক্ষাজীবী, স্নেহহীন এইরূপ ব্যক্তিকে বুদ্ধিমান্ লোক কখনও কন্যাদান করিবে না। সুতরাং এইরূপ স্বামীর স্ত্রীদিগের পক্ষে আক্ষেপ করা স্বাভাবিক।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় 'মনসামঙ্গলে' নারীগণের পতিনিন্দা উপলক্ষ্য করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, "ইহাতে একদিকে মৃত পতির অস্থিকয়খানি সম্বল করিয়া অপরিস্ফুটযৌবনা এক নারী পাতিব্রত্যের শ্বেতপতাকা উঠাইয়া দুস্তর সংসার-গাঙ্গুরে দুঃখের ভেলা লইয়া ভাসিয়াছে। আর একদিকে তাহারই প্রতিবেশিনী নারীগণ নিজেদের পতিদিগের ঐহিক ছোটখাট দোষ ত্রুটির কথা স্মরণ করিয়া তাহাদিগের প্রতি নির্লজ্জ ধিকারে পাতিব্রত্যকে পদদলিত করিতেছে।"

আমরা ইহার উত্তরে বলিতে চাই প্রথমতঃ প্রাচীন মনসামঙ্গলের অধিকাংশ পুঁথিতে 'নারীদিগের পতিনিন্দা' প্রসঙ্গটি নাই। আর যদি থাকেও তবে বলিব ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার এই উক্তির দ্বারা বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়াছেন। বেহুলার স্বামী লক্ষীন্দ্র ধনীর সন্তান, সুপুরুষ ও যুবা। বাসরঘরে সর্পাঘাতে তাহার মৃত্যু হইল। তাহার জন্য হিন্দু স্ত্রী, যাহাকে আমরণ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, সেই বেহুলার পক্ষে স্বামীর জীবন লাভের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করা সম্ভব কিন্তু যে সমস্ত নারী স্বামী বর্তমানে দাম্পত্য সুখ বঞ্চিতা এবং যাহারা স্বেচ্ছায় পতিবরণ করে নাই, তাহাদের পক্ষে এইরূপ চিররোগ-গ্রস্ত, স্থবির বিকলাঙ্গ বা পৌরুষবঞ্চিত স্বামীর পত্নী হওয়ার জন্য আক্ষেপ করা কি অস্বাভাবিক না অন্যায়? কৌলিন্যপ্রথার কুসংস্কারে পড়িয়া কতশত যুবতীকে যে সে যুগে পরিণয়ের যূপকাষ্ঠে আত্মাহুতি দিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই সে যুগের কবিগণের মন হইতে এই সকল নির্যাতিতা নারীর স্বপক্ষে মর্মবেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

ভারতচন্দ্র মানুষের মনস্তত্ত্ব বুঝিতেন। যে সকল স্বামী মনে করেন যে তাঁহাদের অর্থ ও পদমর্যাদা তাঁহাদের স্ত্রীদিগের সকল অভাব মিটাইতে সক্ষম,

দাম্পত্য কর্তব্যকে যাঁহারা গৌন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা যে কত ভ্রান্ত তাহা ভারতচন্দ্র চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। প্রাচীন কামশাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

"সপ্রেমদানৈর্মধুরৈর্বচোভিঃ
সংরক্ষিতব্যাঃ সততং যুবত্যঃ।
অরক্ষিতা হ্যল্পপতিত্রিবর্গ-
নাশং করোত্যন্যজনানুরাগাৎ॥"

প্রাচীন সমাজে পুরুষ নারীকে তাহার ভোগের সামগ্রী মনে করিত। তাহার যে একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে তাহা তাহারা মনে করে নাই; তাই সমাজে চিরকালই দাম্পত্যজীবনের এই অসঙ্গতি থাকিয়া গিয়াছে। নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য তাই ঢক্কানিনাদ করিয়া সতীত্বের জয়গান পুরুষগণ ঘোষণা করিয়াছে।

কবিতাবলী

দিনলিপি

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

॥ ১ ॥

আমি যেন অন্ধকারে ষ্টেশনে দাঁড়াই
মূঢ়তায়, সব ট্রেন ছেড়ে গেছে তাই
শুধু ইস্পাতের আছে দুরন্ত ইশারা
আছে আকাশের বুকে শুটি কয় তারা
তাই নিয়ে রাত্রি কাটে, প্রভাত ধূসর,
দেখা দেয় অবশেষে চিনে নিতে ঘর ॥

॥ ২ ॥

সন্ধ্যার শরীরে আজ অপর সন্ধ্যার মত মেঘ
আমি দুই সন্ধ্যা দুই কালো মেয়ের মতো নিয়ে আছি
মেয়েরা নেই আমার এই নিঃসঙ্গ বয়েসে
আমি তাদের নিসর্গে মেশাই।
তাতেই আমার হৃদয়ের উল্লাস —
প্রৌঢ়তার উল্লাস।
যেন এক নিষেধের উত্তুঙ্গ শরীর আমার আর সেই মেয়েদের মধ্যে
আমি ডিঙ্গিয়ে যেতে পারিনে যা।
কিন্তু ডিঙ্গিয়ে যেতে পারি আমার নিঃসঙ্গতা
নিসর্গের প্রগাঢ় আশ্লেষে।

আমি এ দুই সন্ধ্যায় তৃতীয় সন্ধ্যা
আমি অন্ধকার এই দুই সন্ধ্যার মতন।

অতঃপর

মানস রায়চৌধুরী

কবিতাও ব্যর্থ হয়ে যায়,
যাকে লোকে প্রণয়ের মহামন্ত্র বলে জ্ঞান করে।
গান, তুমি সপ্তকে ঝঙ্কার তুলে নির্বীজ হাওয়ায়
কোন প্রতিক্রিয়া রেখে যাও, আমাদের ঘরে ঘরে
শাদা আয়নায় পুরু ধুলো জমে।
দেখছোনা পাতা, কুঁড়ি সব ঝরে যায়
কালের অদৃশ্য ইশারায়, রসেভরা ফলও
হয় কীটপতঙ্গের গ্রীষ্মাবাস। বলো তবে বলো
কাকে এই মহাশূন্যে পড়ন্ত দেওয়ালে লম্বমান
চিরন্তন কাকে রাখবে ধরে?
কালো চুল উড়ে যায়, শূন্য মাথা। রাঙানো অধরে
দেখ নামে বিবর্ণতা, সব দম্ভ একে একে হবে অবসান।

আলিঙ্গনও খুলে যেতে চায়।
ক্ষীণায়ু বসন্ত দিন, বাতাস চকিতে ভাঙে ভুল
বুকে রাখছি, চোখে রাখছি, দেখতে দেখতে মালাটি শুকায়
ছিঁড়ে ফেলতে বাধা কই? এইসব শুকনো বাসি ফুল
দর্শন বই-এর পাতা, গন্ধহীন—নীরব অক্ষর
মৃত মাছি শুয়ে আছে, শুয়ে থাকবে স্তব্ধ সারি সারি
কখনো হবে কি আর পবনবিহারী?
আমাদের অন্ধ চোখ, এ ফুলেই মালা গেঁথে সাজাবো বাসর।

তিনটি কবিতা

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

কান্না

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে শুনি
কে যেন কোথায় কাঁদছে
অস্ফুট
চাপা
মৃদু
মোহামোছা কান্না।

ধীরে ছাদে উঠে যাই
উপরে ছড়ানো স্তম্ভিত কালো আকাশ
নীচে কলকাতা
আলুলায়িত
কণ্ঠের রত্নহার সুতো ছিঁড়ে ছত্রাখান।

পা টিপে ফিরে আসি নিজের ঘরে
এবং সকালে ঘুম ভাঙে
চোখে রোদ লেগে॥

প্রেম

কখনও যেখানে মানুষের পা পড়েনি
সেখানে নরম সবুজ ঘাস গজিয়ে ওঠার
পরাক্রান্ত নিঃশব্দতা
কতদিন শুনিনি!

হয়তো শুনব না কোনদিন আর॥

বৃষ্টি

নেমে এস বৃষ্টির রাজপথে।
দেখ

তিনটি কবিতা

কণা-কণা সমুদ্র ঝরে
অবিচ্ছিন্ন মুগ্ধ প্রলাপে
সূর্যের থাবা খেয়ে
অচৈতন্য শহরের মুখের উপরে

আজ
মর্মরিত সমুদ্র এল
তোমার দুয়ারে ॥

প্রাক্তন উদ্ভিদ

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

হে বন্ধু, কি প্রবাহিত জ্যোৎস্না দেখালে
ওই হাতে, ও হাত নয়·····প্রান্ত গান, হাওয়া
হাওয়ার আস্তর খুলে দুঃখময় যাওয়া :
আগুনে-শাখার ফুল অমলিন, কেমন দোলালে।

শিশুকাল মনে আসে, প্রাঞ্জল আলোয় সেই ব্যাকুল পাহাড়
ঘুরে ঘুরে চক্রাকার সিঁড়িগুলি মেঘলা আঙুল
···অদেখা স্নায়ুর মতো ভিতরে আমূল
বিঁধে আছে ঝর্ণাগুলি—জড়ানো জলের সংসার।

তুমি আমি রাত্রি জল·····জন্ম, জলধারা
করতলে রোদের দর্পণে রৌদ্র ঝ'রে যায় স্মৃতি,
ও স্মৃতি! ও জল! জন্ম ·····ছায়াচ্ছন্ন—কোথায় আকৃতি
পিপাসার অন্ধ মুখে ; অবয়বে দেবদারু···দীর্ঘ বাসনারা।

কি জ্যোৎস্না দেখালে বন্ধু, জ্যোৎস্নার ভিতরে —
এ বড়ো জ্বালার ঘর ; চন্দ্রালোক·····এ-ঘরে ও-ঘরে ॥

শীতের আকাশ

চিত্ত ঘোষ

সকালের মুখ সজীবতা
সন্ধ্যার মুখ বিষাদ
রাত্রি অতল গভীরতা
বিকেলের হাতে হাত।

কবে যে ঘুড়ি উড়িয়েছিলাম
মনেও নেই।
বুড়ির ড্যারা পুড়িয়েছিলাম
মনেও নেই।
চৈত্রে আকাশে
টিয়ার ঝাঁক পালিয়ে গেলো
নদীর বাতাসে।

শান্-তাতানো গরম চোখ রাঙায় :
বিকেল বৌ সোনালী গম ভাঙায়,
ভাঙা কাচের ওপর দিয়ে ইঁদুরগুলো হাঁটে।
ঘূর্ণি হাওয়া ধুলো ওড়ায়
শহর যেন শাদা ঘোড়ায়
কদম ফেলে ছোটে।

মনে পড়ার কচি পাতার বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে যেন কে—
রোদের দিনে শাড়ী শুকোয়
ঝড়ের দিনে ঘরে লুকোয়

শীতের আকাশ

বৃষ্টি যেন অন্তরের গন্ধ ঢেলেছে।
বৃষ্টি যেন গন্ধে তার দুচোখ মেলেছে।

২

সামনে পেছনে কে যেন আমার
পাশাপাশি হাঁটে অন্ধকারে।
শীতের হাওয়ায় কেঁপে ওঠে বার বার
ঘুমের বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়ে।

দরজাগুলো ভেতর থেকে বন্ধ।
ওদের চোখে ঘুম পাড়ানি মাসী ;
পুরোনো পুরু দেয়ালগুলো অন্ধ
ছায়ার সাথে দাঁড়িয়ে পাশাপাশি।

স্মৃতির বোঝা লুটিয়ে পড়ে ধুলোয় !
এখন তবে কী—
চেঁচিয়ে ডেকে উঠলে যদি হয়
হয়তো ওরা শুনতে পায় নি।

নামধরা ডাক শীতের আকাশ নিলো।
তুমি বলে দাও শুধু—
কবে কোন্‌খানে পরস্পরের নাম লেখা হয়েছিলো
শীতের আকাশ ধূ ধূ॥

এক মাঠ বৃষ্টিতে

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজে গোরুগুলো বিলাসী বৃষ্টিতে,
মস্ত মাঠ শূন্য চরাচরের প্রতীক।
মাথা বাঁচাবার জায়গা একফোঁটা দিতে পারবে কেউ ?

উত্তরস্থরী

অগত্যা ভিক্ষুক তারা গোয়ালের আশা ভরসা ছেড়ে,
দু'দণ্ড দেখুক তবু ট্রেনে-ঝোলা নীরক্ত যাত্রীরা :
উত্তর-বাতাসী ঝাপটা, গোরুগুলো নৈর্ব্যক্তিক, স্থির।

শব্দহীন ফড়িং ওড়ার মতো অকালবর্ষার
বৃষ্টি গুড়িগুড়ি পড়ে, ঘাসের গোড়ায় জল জমে,
কচুবন, ফণিমনসার কিংবা খেজুর-কাঁটার
কেঁচোর কোটর ভেজে, শুঁড়-ভাঙা শামুকের খোল
অনিশ্চিত পুকুরের মূলধন জমায়।

ঝাপসা মাঠ : প্রকৃতিবিদ্যার অন্য আকর্ষণ নেই।
পশ্চিম সীমান্তে শুধু প্রকাণ্ড পাকুড়।

তার তলে দল-ছাড়া আত্মম্ভর একটি বাছুর।
সে ভাবে : এক ছুটে যাবে লিচুবনে দুর্জয়-তিলায়,
চতুষ্পদ পরাক্রমে দুরন্ত ঝোপের বিরুদ্ধতা
বালির বাঁধের মতো ভেঙে পড়বে ; বাগান-বিলাস,
বীন-স্টার, কর্পূরগাঁদার বর্ণগন্ধের বাতাসে
সেও হ'তে পারবে প্রাতিস্বিক প্রজাপতির আত্মীয়।

যদিও বৃষ্টির ফোঁটা সুস্পষ্ট ডালের ধার ঘেঁষে
চোখ চুইয়ে গলগণ্ড ধরে নামে অপুষ্ট বাঁটেও।
এই দৃশ্য সাধারণ দেশকাল-বিধৃত বাস্তব,
বর্ণের জৌলুষ নেই, এর কোনোখানে।

স্রষ্টার বিবেক তবু অসহায় নয়।

নির্জন সংলাপ

রাম বসু

শিশির জড়িয়ে নিয়ে কৌতুকী জোনাকি
আমার কপালে বসে কি খুঁজেছো তুমি
পাথরের স্তাওলার মন্থন নির্জন
লতা পাখী পতঙ্গের কারুকার্য বিস্মৃত প্রাসাদ
আমাকে ভেবেছো বুঝি
জলের কিন্নর কণ্ঠে অভিভূত বালির পাহাড় ?

জোৎস্নার মদির ছায়া অতৃপ্ত অপ্সরী
কেন তুমি ছুঁয়ে যাও
চাও নাকি
মুখের কুহক স্বাদে স্পর্ধ চকমকির স্ফুলিঙ্গ
মাটির আঁধার দৃঢ় শিকড়ের মত স্নিগ্ধ নিপুন সংগ্রাম
হাজার হাজার পাখী ছেয়ে দিলে চোখের নিলীমা
দুই কান ভরে নেবে সদ্য হাওয়া পাতার চিৎকারে ?

না, না, আমি তার কেউ নই
তোলো জলকুণ্ডের দর্পণ
ভাখো মুখে কটু কুয়াশা ও বন তুলসীর স্বাদ
কান্নার খঞ্জনী দূরে বিদ্ধ করে শোকের আকাশ।

মাঘের দুঃসহ তারা আমি দীপ্ত শাণিত স্ফটিক
আমার রক্তের স্রোতে অনির্দেশ্য আকাঙ্ক্ষার সুর
অস্থির খরতা বুকে কুরে কুরে নিঃশব্দে নিভৃত
বিমূঢ় চরের মত অন্তঃসারশূন্য করে দেয়।

উত্তরস্থরী

দুঃখের গভীর বৃত্তে আমি ঘুরে ঘুরে
চরের মতন জানি ব্যর্থতার স্পষ্ট উচ্চারণে
একদিন চিহ্নহীন হবো অন্ধকারে
আমার উলঙ্গ কণ্ঠ আদিগন্ত শূন্যতার মাঠে
গোধূলির দিকে যাবে নিরাশ্রয় বালকের মত।

জোনাকি, অপ্সরী,—না, না
কেউ নই তোমাদের আমি।

শিল্প প্রত্যয়

অরুণ ভট্টাচার্য

দৃশ্যপট বদলাবে, নিয়তি নির্জনে হাসবে, তবু
বোলো তাকে সহজিয়া, সে যেন আপন
সৃষ্টিকে ভুলতে পারে ; সৃষ্টি তার উজ্জ্বল দর্পণ।

শিল্পের অন্বিষ্টে তার সাধ, দুহাতে নির্মম
মাটি ছেনে অর্থহীন প্রত্যয়ের ভীড়ে
নিজেকে গড়ছে সুখে। অনুভূতি নিরালম্ব। তার
যৌবনে প্রেমিক মুখ সুখী পারাবত।

তথাপি নির্মল দেহে অসংগতি ঘিরে
দিনরাত্রি ভরবে উল্লাসে। যদি নিপুণ পটুয়া
গড়ে তার ডৌল বিম্ব, সে দেখে আপন
চরিত্রকে, আঁতকে উঠবে অজানিত ভয়ে

এবং মুখোশ খুলে তৎক্ষণাৎ ভাসাবে নদীতে।
দর্পণে, দৃশ্যের হাত ফিরে পাবে অনেক সান্ত্বনা
নারী, প্রেম, গৃহ, শান্তি যদিও অন্ত না—
পটুয়া বিকল্প অর্থ আরোপিত করবে তার মুখে।

আলোচনা-
সাহিত্য

একালের চোখে—অচিন্ত্যেশ ঘোষ। মিত্রালয়, কলকাতা ১২।

বাংলা গ্রন্থ-প্রকাশের জগৎ ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে। যেসব প্রসঙ্গে রচিত গ্রন্থ আগে অচল ছিল অধুনা সেসব প্রসঙ্গ বাংলাভাষাতে স্বাগত। অচিন্ত্যেশ ঘোষের "একালের চোখে" তেমনই বিষয়ের অভিনবত্বে বাংলা গ্রন্থের তালিকাতে একটি নতুন যোজনা। 'একান্নবর্তী পরিবার প্রথা', 'বাঙালীর পরিচ্ছদ', 'করণিক প্রসঙ্গ', 'রবীন্দ্রজয়ন্তী', 'প্রাদেশিকতা', 'দেবরহস্য', প্রবন্ধের শিরোনাম হতেই এই গ্রন্থটির বিষয়-বৈচিত্র্যের আভাস মিলবে। এই আপাতসম্পর্কহীন প্রসঙ্গগুলির মধ্যে একটা অদৃশ্য যোগসূত্র বর্তমান। তাই রচনাগুলির প্রসঙ্গ বিভিন্ন হলেও মৌলত বিচ্ছিন্ন নয়। সে যোগসূত্র আর কিছু নয়, একজন তরুণ সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গির সুসঙ্গতি।

বোধহয় এজন্যে গোড়াতেই অচিন্ত্যেশ ঘোষ মহাশয় সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ধারণে উদ্যোগী হয়েছেন। ফ্রয়েড-কথিত সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির তথাকথিত বিরোধের তত্ত্বকে খণ্ডনপূর্বক তিনি পাঠকের সামনে এই বক্তব্য এগিয়ে দিয়েছেন যে সমাজ ও ব্যক্তির সাযুজ্যেই সংস্কৃতির প্রাগ্রসর। শ্রীঘোষের আলোচনাভঙ্গি যথেষ্ট প্রাঞ্জল অর্থাৎ তাঁর চিন্তায় কোনও অস্পষ্টতা নেই, আপন বক্তব্য সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনও অস্বচ্ছতা নেই। শুধু এই কারণেই তাঁর কাছে বাঙালী পাঠক কৃতজ্ঞতা বোধ করবেন, কেননা কৃত্রিম মননশীলতার আকর্ষণে নবীন লেখকবৃন্দ ক্রমশই দুর্বোধ্য হয়ে উঠছেন। তবু এ অভিযোগ গভীর নয়। কেননা নিজের পথে তিনি ফ্রয়েডীয় মতকে খণ্ডনে সমর্থ হলেও সমাজ কাকে বলে, ব্যক্তি কাকে বলে, সমাজের ইতিহাস ও ব্যক্তির স্বরূপ কী এ সমস্ত প্রাথমিক প্রশ্নের উত্তর দেননি। সমাজ ও ব্যক্তির সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব হতে কেবল ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকে আলদা করে নেওয়া ও তার প্রতিবাদ করার কারণও ঠিক বোঝা গেল না।

তদুপরি ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকে সর্বৈব্রান্ত বলা চলে কিনা সন্দেহ। একথা পাঁড় সমাজবাদীও স্বীকার করবেন যে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব মিথ্যা নয় এবং তাতে যেসব ব্যক্তির সত্তা নিষ্পিষ্ট হয় তেমনই বিকাশের পথে এগিয়ে যায়। তাছাড়া ফ্রয়েড দেখেছেন বুর্জোয়া সমাজকে, যার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব অনস্বীকার্য এবং এই সমাজে ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব অপ্রকট নয়। শ্রীঘোষ যদি ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের বিচার করতেন তা হলে তাঁর সিদ্ধান্তকে একতরফা মনে করি। আসলে বিচারটা নির্ভর করছে 'সমাজ' কথার অর্থের উপরে। এজন্যে 'সমাজ কাকে বলে?' প্রশ্নটা খুবই জরুরী।

অবশ্যি শ্রীঘোষ বারবার চেষ্টা করেছেন নিজেকে একদেশদর্শিতা হতে মুক্ত করতে এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর লেখনীতে ধিক্কৃত। যেমন "প্রাদেশিকতা" প্রবন্ধে তিনি বাঙালীর কাছে উন্নত উদার ও মার্জিত দৃষ্টি দাবি করেছেন। কিন্তু তাঁর বিশ্লেষণে যত উৎসাহ সংশ্লেষণে তত আগ্রহ নেই। তাই একান্নবর্তী পরিবার বা আমাদের পরিচ্ছদ সম্পর্কে তিনি শেষ পর্যন্ত কোনও দিশা দেননি। পক্ষান্তরে 'সাহিত্যের সামাজিক দায়িত্ব', কিংবা 'রবীন্দ্রজয়ন্তী' অথবা 'সনাতনী সমাজ' প্রভৃতি রচনায় তিনি যে মীমাংসাতে উপনীত হয়েছেন তা অশ্রুতপূর্ব না হলেও গঠনমূলক। কিন্তু তার গঠনমূলক প্রস্তাবেরও একটা সীমা আছে। কারণ বিড়ালের গলায় কেমন করে ও কে ঘণ্টা বাঁধবে, সেটাই সমস্যা। অচিন্ত্যেশবাবু নিজেই এই সমস্যা সম্পর্কে সম্যক সচেতন এবং 'প্রাদেশিকতা', 'রবীন্দ্রজয়ন্তী' শীর্ষক দু' একটি প্রবন্ধে এই সমস্যার স্বরূপ নির্ধারণ করতে চেয়েছেন। আমাদের সাংস্কৃতিক অবনতির মূলে যে সদিচ্ছা ও নিষ্ঠার একান্ত অভাব, এ বিষয়ে তিনি যথার্থ অবহিত, কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে, এই বইয়ের প্রথম নয়-দশটা প্রবন্ধে লেখক স্বয়ং যথেষ্ট তন্নিষ্ঠ নন।

তা বলে এই বইয়ের গুরুত্ব অস্বীকার করা যাবে না। কেননা দেশের পণ্ডিতবর্গ অধুনা যে তুরীয় মার্গ অভিমুখী হয়েছেন তাতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের ব্যবধান ক্রমশঃ দুস্তর হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে "এ কালের চোখে" অচিন্ত্যেশবাবু তাকিয়েছেন সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার দিকে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীঘোষের উদ্দেশ্য সমাধান নির্দেশ করা নয়, তিনি পাঠকের সামনে এমন কিছু সূত্র এগিয়ে দিতে চেয়েছেন যেগুলিকে অবলম্বন করে পাঠক আপন ভাবনা-চিন্তাকে অনায়াসে প্রসারিত করতে পারবেন। এটাই হলো এ গ্রন্থের

বৈশিষ্ট্য। লেখক কোন কোন ক্ষেত্রে নিজস্ব সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার দায় এড়িয়ে গিয়েও এমন সব প্রসঙ্গ উথাপন করেছেন যেগুলি কিছু কিছু পরিমাণে অভিনবত্বের জন্যে ও প্রধানত সামাজিক তাৎপর্য অনুসন্ধানে চিন্তাশীল পাঠকবর্গের অভিনিবেশ আকর্ষণ করবে।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় অংশের নামকরণ করা হয়েছে 'অলৌকিক।' অচিন্ত্যেশবাবু বলেছেন যে এক ধরণের ঘটনা বা ফেনমেনন্ আছে যেগুলিকে আমরা সর্বদা ব্যাখ্যা করতে পারিনে। এইসব ঘটনাকে তিনি অলৌকিক আখ্যা দিয়েছেন। লেখক যে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন তার প্রমাণ 'অলৌকিক' অংশের পাতায় পাতায়। 'দেব-রহস্য' প্রবন্ধটির বক্তব্য কিছু নতুন নয়; যেসব প্রাকৃতিক ঘটনাবলী একদা আমাদের পূর্বপুরুষদের আতঙ্কিত করেছিল সেগুলির জন্যে এক-একজন দেবতা কল্পনা করে মানুষ সেই দেবতাদের তুষ্ট করার চেষ্টা করত, তার থেকেই এসেছে জপ-তপ-পূজা-আর্চা ইত্যাদি। সে জন্যে বলা হয় যে নাস্তিকের ভগবান হলো নিস্বর্গ্। 'দেব-রহস্য' প্রবন্ধে যে-বক্তব্যটাকে কুঞ্চিকা-রূপে বলা হয়েছে পরবর্তী প্রবন্ধগুলিতে সেই একই বক্তব্যকে বিশদ ও বক্তব্যের উদাহরণ তথা প্রমাণরূপে বলা হয়েছে। যেমন 'দোল-উৎসবের উৎস' প্রবন্ধটিতে তিনি দেখিয়েছে- যে ভারতবর্ষের এই সার্বজনীন উৎসবটির এক গূঢ় তাৎপর্য আছে এবং সে তাৎপর্য মোটেই অমর্ত নয়, বরং, সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে প্রায় সর্বত্রই দোল উৎসবের অনুরূপ একটি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়, যদিও এই উৎসবের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্র একই বিগ্রহে গৃহীত হননি। এই প্রসঙ্গে অচিন্ত্যেশবাবু যেসব তথ্য পরিবেশন করেছেন সেগুলি ভয়ানক কৌতূহলোদ্দীপক এবং একটি দু'টির উল্লেখ করতে গেলে বাকিগুলির উল্লেখে উৎসাহ সংবরণ করা অসাধ্য হতে পারে এই ভয়ে একটির উল্লেখ থেকে নিবৃত্ত হলাম। তবে তাঁর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে দোল উৎসব হলো ফলোৎসব বা শস্যোৎসব যা উত্তর গোলার্ধের বিভিন্ন দেশে বসন্তকালে পালন করা হয়ে থাকে। "তার সূত্রপাত ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার মধ্যে এবং পরে তা' ধর্মীয় উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে। আনুপূর্বিক বিচার করলে একথা স্পষ্ট হবে যে এই উৎসবের সূত্রপাত কোন ভক্তিবাদ বা দেব-মাহাত্ম্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না; এর সূত্রপাত অন্যান্য সমস্ত সামাজিক উৎসবাদির মতো আদি মানবগোষ্ঠীর নিতান্ত বৈষয়িক প্রয়োজনের তাগিদেই ঘটেছে।"

'দেব-রহস্য' প্রবন্ধে অচিন্ত্যেশবাবুর এমন কোনও প্রত্যাশা নেই যে তাঁকে মৌলিক তত্ত্বের জন্যে কেউ স্বীকৃতি দেবেন ; অবশ্যি মৌলিক তত্ত্ব পরিকল্পনা করেন শুধু অতি মুষ্টিমেয় কয়েকজন অসাধারণ পুরুষ। কিন্তু সেই তত্ত্বের সুষ্ঠু প্রয়োগও বিশেষ বিচার ও বিবেচনা সাপেক্ষ এবং তার প্রয়োগে সেই তত্ত্বই দৃঢ়মূল হয়। শ্রীঘোষ এই কয়টি অর্থাৎ তত্ত্বের সুষ্ঠু প্রয়োগ সম্পন্ন করেছেন 'দোল উৎসবের উৎস' এবং 'শক্তিপূজার রূপান্তর' প্রবন্ধে। পক্ষান্তরে 'ধর্ম' শীর্ষক রচনাটিতে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞর বিচারের মধ্য দিয়ে ধর্মের একটা নিজস্ব সংজ্ঞা দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। এই সংজ্ঞার সীমাও আছে তা আসলে সমাজতত্ত্বে গণ্ডীবদ্ধ হয়েছে অর্থাৎ ধর্মের যে একটা দার্শনিক দিক রয়েছে তা তাঁর সংজ্ঞা বহির্ভূত। কিন্তু এসব তুচ্ছ সীমা ও সমস্যা নিয়ে অস্বয়কের মতো পীড়িত হওয়া অসমীচীন ; কেননা এই বইটিতে বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধিজীবিদের প্রীত করার মতো উপাদান ও উপকরণ প্রচুর। যেকালে আমরা তরুণরা মস্তিষ্কে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছি তখন "একালের চোখে" কোনও নতুন বিশ্বাস বা সত্যে আমাদের উত্তীর্ণ করে দিতে না পারলেও আমাদের বুদ্ধির জড়তা হয়তো বিচলিত করতে পারবে।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

যখন যন্ত্রণা ॥ রাম বসু। হিন্দুস্থান প্রিন্টার্স।
দৃশ্যের দর্পণে ॥ রাম বসু। গ্রন্থজগৎ।

অমোঘ বঞ্চনার থেকে যে আন্দোলিত সৃষ্টি সম্ভব, তার পর্যায়ভুক্ত উদাহরণ অন্তত অন্য শিল্প বিশ্বাসের প্রেরণায় উদ্ভূত হবে না। অপর দিকে যুদ্ধ, দেশবিভাগ ও অর্থনীতির ক্ষয়ক্ষতির চোরাটান প্রায়শই মহৎ ভাবনার জন্ম দিয়েছে ব'লেই তা' যে উৎকর্ষের অদ্বিতীয় উৎস, এমন নির্ণয়ে আমার ব্যক্তিগত সায় নেই ; বরং বিপরীত ধ্বনিতরঙ্গে ভূমিষ্ঠ বিপুল সিম্ফনির বিচিত্র, অনড় স্থিরতার কেন্দ্রকে বহু বিচূর্ণ ক'রে এক নতুন বর্ণায়ন ঘটাতে পারে। তেমনি মনে হয়, নৈঃশব্দের অনশ্বরতাও কোনো কোনো সমাহিত মননে গভীরতর সমাহিতি আনতে পারে আরো ঢের সহজে। তাই কেবলমাত্র অস্বস্তির গুমোট উচাটনে মন্ত্রসিদ্ধ জাতক-ই অধিক অভিনন্দনের।

এবং সে জাতেকের রক্তাক্ত জন্মের বিস্ময় আমাদের স্থির অভিভূত করে। আমরা জানি, projected frustation-এর যুগ উক্ত ক্ল্যাসিক উৎকর্ষের অন্যতম আবাদী ভূমি। (বর্তমান সমালোচকের যদিও ওই শব্দটির প্রতি কোনো বিশেষ আসক্তি নেই।) তবে এক সৌগন্ধে আমার বিশ্বাস আছে যার ব্যঞ্জনা অহোরহো মুগ্ধ করে আমাকে। প্রসঙ্গত আমরা এ-ও জানি যে, ওই ব্যঞ্জনার ঐকত্রিক বর্ণকল্পনা বিভিন্ন সংসক্তি থেকে আসতে পারে।..... বিশ্ব-জোড়া অসহিষ্ণুতা চিরকালের। এই অসন্তোষ কালান্তরে অথবা সমকালেই প্রবল বুদ্বুদের শরীরে আত্মপ্রকাশ করে; এবং যথারীতি আচমকা এক বিস্ফোরণের মাধ্যমে উন্মোচিত হয়। সেই বিস্তৃত আলো কিছু শিল্প, কিছু মৃত্যু কিছু অপব্যয় ঘটায়। দমবন্ধ প্রত্যাশার এমন চেহারা তাই পরস্পর-বিরোধী রঙে মিশ্রিত, যার অনেকগুলো সমান্তরাল ধ্বনিশ্রুতি।

এখানে আলোচ্য প্রথম বই শ্রীযুত রাম বসুর 'যখন যন্ত্রণা'য় সেই কালের কথা লিখিত, যে কাল আধুনিকতার মানসিকতার উত্তাপের শিকড়ে জড়িত। পঞ্চাশের যুগে যে অস্থিরতার জ্বালা এবং বহুলাংশ চেতনার উপছায়া এসেছে, তার অবশ্যম্ভাবী প্রতিবাদ রাম বসুর কবিতায় প্রতিফলিত। রাম বসু আপাত-সমর্পণে কিংবা যৌক্তিক মননধর্মিতায় ঘোর অবিশ্বাসী। স্বভাবতই স্পষ্ট কবিতা-গুলি হয়েছে কঠিন দিকদর্শনের জবানবন্দী। অস্বস্তি এবং গুমোটে পা রেখেও তার তারাকীর্ণ ছায়াপথে লক্ষ্য, সহজেই অস্বীকার করেন যাবতীয় জটিল জীবন ধারণের ছাঁচগুলোকে। কান্নার শোক তাঁর কাছে 'ক্ষণিক বিস্তার'-এর কাজ করে। 'উজাড় বিশ্বে' সর্বনাশ হয়ে গেলেও তাঁর আশা থাকে—'ছায়ার নিচে বাঘবন্দী, ডুরে শাড়ি' 'সুতানটি গাঙে রূপকথা'র 'ভাঙা পারুল ডাল', সবই আবার ফিরে পাওয়া যাবে। শহরের কংক্রীটে ঘুরতে ঘুরতে এক জলজ ক্ষমতায় 'প্রথম গর্ভিণী' 'সুরেনের কথা' লিখতে পারেন। তেমন-ই মাঝে মধ্যে বলবার তাগিদে বাগচাল হয়ে যেতেও পিছোন না যেমন 'সন্ধ্যা' 'যখন যন্ত্রণা' 'ভুলো না' ইত্যাদিতে মনে হ'লো। এখানে একটি দিশেহারা চেহারা আমাদের পীড়িত করে, চিন্তা প্রতীতির না-ধর্মিতা, হ্যাঁ ধর্মিতা তাঁকে অতিশয় যন্ত্রণায় যেন ভাবিত করে এবং বাঁকাচোরা বুদ্ধিবাদে না যেতে পেরে সাদামাঠা হৃদয়বৃত্তির ভাষায় তিনি লিখে যেতে বাধ্য হন

গরিয়সী, চেয়ে দেখ একবার নরকের প্রান্ত খুলে
দেখ ঘাতকের ঘৃণ্য হাত চোয়াল মুচড়ে ছিঁড়ে আসে
নখে কুরে তোলে চোখ, খোবলায় লোভ। কেন বারবার
ঝড় হাঁকে 'দ্বার কই' ? মাটির গোড়ায় বীজ কাঁদে 'দ্বার
খোলো, মাগো।' বালি শোষে অশ্রু, কেন স্বপ্ন আলো হানে, টানে ?
সে বাঘিনী এ জীবন প্রতিশোধে অন্ধ, মত্ত থাবা তুলে।

(রক্তাক্ত বাঘিনী)

আরেকটির থেকে :

পিতামহ অন্ধকার, পূর্বপুরুষ, পাহাড়, গন্ধর্ববাসী তারা,
যদি প্রাণ দিলে তবে প্রাণের গর্ব দিলে না কেন
যদি সাধ দিলে তবে সার্থকতার ক্ষমতা দিলে না কেন
যদি প্রেম দিলে তবে রক্ষার পৌরুষ দিলে না কেন
পিতামহ অন্ধকার, পূর্বপুরুষ পাহাড়, গন্ধর্ববাসী তারা ? (সিংহভূম)

'সিংহভূম' কবিতাটি একটি অনবদ্য উপহার ব'লে ঘোষণা করতে পারি। অপমানিত হৃদয়বৃত্তির (humiliated emotion) কাজ কতোদূর আমাদের আমূল নড়াতে পারে সে কথা সন্দেহের, যতোটা তা পারে, Romantic mannerism-এ। এমন সম্মোহনের সমাচার 'যখন যন্ত্রণা'র পাতায় পাতায়। রাম বসুর প্রধান ত্রুটি মনে হলো তাঁর চিত্রকল্প প্রয়োগের আপাত বিরোধী অমিতাচারে। তাই, সমকালীন কবিদের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট হয়েও তিনি কোনো গভীর সদর্থক ভাবনার দাম্বিক হতে পারছেন না। চিত্র সংস্থান সিদ্ধহাতে নিপুন যত্নে তিনি করেন। সেদিকে তাঁর অসামান্য ক্ষমতা, উদাহরণ দিই—

১। মাটি পাথরের তল থেকে ভালোবাসার গান মোচড় দিয়ে উঠে আসে
আর অদম্য প্রাণশক্তিতে পেশী-তরঙ্গিত ঘাড়ে
অর্জুন গাছের পাতা কাঁক করে
বাতাস আচমকা হাত রাখে।
না, আমরা মরব না।
অপরূপ নৈঃশব্দ তোমার হাতে একগুচ্ছ ফুল
বিশ্বস্ত বন্ধুত্বের মত নিঝুম বসতি গ্রাম

বাইশ বছরের নারীর মত উন্মুখ প্রকৃতি
কিংবা ডালে ডালে বিনুনি-করা অন্ধকারে রাতকানা পাখির কান্না

৪। কি আশ্চর্য সুন্দর স্বচ্ছ তপ্ত ভালোবাসায়
প্রেয়সী হাত ধরে তারার নীচে দাঁড়ান·····
কি মহান উল্লাস ধানের কাঁচা সবুজে দাঁড়িয়ে
বাঁচবার অধিকারে বর্শা তুলে ধরা। ইত্যাদি

যেখানে 'লাল মাটির স্তব্ধ তরংগ হীরাধার বর্শা তোলে, শালের কচি কচি পাতার পেছনে পলাশের দাউ দাউ আগুন' কিংবা 'রিক্ততায় ধূ ধূ করা পাহাড়ের মাথায় টকটকে কুসুম পাতা, স্বপ্নের মতো ধক্ ধক্ করে' সেখানে রাম বসু স্বচ্ছন্দে পোড় খাওয়া গম্ভীর মানুষের মতো ব'লে উঠতে পারেন ; 'হে আমার দেশ আমার পাহাড় পাথরের আক্রোশ আনন্দ।·····তোমার নামে আমার রক্তের বন্য ডাক ; অন্ধকারে স্ফীত সমুদ্রের ঢেউ, শস্যের স্বাদ, হে আমার দেশ আমার জন্মজন্মান্তরের সার্থকতা। আমরা শিহরিত রোমাঞ্চিত হতে পারি এই গর্বিত মন্ত্রোচ্চারণে।" সুতরাং অসংযম থাকা সত্ত্বেও এই বইটির এমন সব পংক্তিগুলি এবং কোনো-কোনা ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কবিতাই আধুনিক উজানি সাহিত্যে একটা ব্যাপ্তির 'বিস্তীর্ণ হরিৎ' দেখিয়েছে। উচ্ছ্বসিত দুঃখ এবং আশার মধ্যে-মধ্যে যখন 'রক্ত ক্লান্তি কুঁজ পিঠে, টলতে টলতে দেওয়ালের গায়ে ভর দিয়ে তাকাই ··· ··· চোখে পরাজয় যখন

ক্ষিপ্ত সিংহ যেন দেশটাকে দাঁতে করে ঘাড় ঝাড়া দেয়
হাড় মাস চিবিয়ে চিবিয়ে তার অরণ্য কাঁপা শাসানি
বিদ্যুৎ-কৃপাণ হাতে কাপালিক-মেঘ পাহাড় চূড়ায়
সমস্ত ব্রাহ্মাণ্ড যেন ভয়ে ডাক ছেড়ে মাথা আছড়ায়। (যখন যন্ত্রণা)

তখন তিনি কান্নাকে 'ক্ষিপ্ত ঘোড়ার মত নক্ষত্রের দিকে ছুটে যেতে' দেখেন, মগ্ন বিশ্বাসে বলে উঠতে পারেন ;

আমাকে আগাগোড়া মুড়ে দিয়েছে একটা সুশ্রী স্বপ্ন·····
চারপাশে প্রথম বর্ষাভেজা মাটির কোমল সৌরভ।
পৃথিবীর মুদিতপদ্ম চোখে নিষ্ঠার চুম্বন এঁকে
আমি সূর্যের মত আকাশ মাড়িয়ে চলে যাবো। (কাল রাতে)

'অনাবৃষ্টির দগ্ধ চোখে' 'অঞ্জলিবদ্ধ' স্বগোতক্তি করেন,

চেতনার সীমায় দাঁড়িয়ে ঢাকি শিশুর বিপর্যস্ত মুখ
বলি—"মৃত্যু, পৃথিবীর পোষণ পুষ্ট আমাকে
মুছে ফেলতে পারবে না ;—কিছুতেই না।" (স্বগত)

তাই 'যখন যন্ত্রণা'কে একালের একটি শোকবিদ্ধ মানুষের জবানবন্দী ব'লতে ইচ্ছা যায়। আধুনিক কবিতার আগামী মূল্যায়নে এর ফলশ্রুতি অনেকদিনের উপজীব্য। এবং রাম বসুও স্বাভাবতই সে আলোকিত উন্মোচনে জড়িত থাকবেন। যদিও তাঁর কবিতার গভীরতা চিত্রকলাময়তার হাত ছাড়িয়ে স্বাবলম্বী পায়ে কতো দূরে গেছে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ করা যায় না কি ?

বোধ করি মাত্র দেড় বছরের ব্যবধানে রাম বসুর পরবর্তী কবিতাগ্রন্থ 'দৃশ্যের দর্পণে' প্রকাশিত হ'লো। 'দৃশ্যের দর্পণে'র অধিকাংশ কবিতায় প্রেম-ই মূল লক্ষ্য। এবং 'যখন যন্ত্রণা' পর্যায়ের চিত্রধর্মিতা এখানে আরো ঢের প্রবল যদিচ তেমন সার্থকতার বিদ্যুৎ বিভাস এই পর্যায়ে অপ্রত্যাশিত ম্লান, বর্ণহীনতার দিকে। অর্থহীন পংক্তিযোজনে, স্থানে অস্থানে বহিরঙ্গের ভারসাম্য বজায় রাখতে তিনি প্রায় অসার্থক 'দৃশ্যের দর্পণে'তে। উপন্যাস সংগ্রহের unreal composition-এ তাঁর অস্বাভাবিক ঝোঁক এখানে স্থূল নাটকীয় ব্যর্থতায় প্রকাশিত। শিশিরের কান্না, স্মরণের দীপ, হতাশার হাতুড়ি, স্বপ্নের কীটে কুড়ে যাওয়া, সংশয়ের বেনো ঘাস, সময়ের নদী, রিপুর কাদা, রোদের চিরুনি ইত্যাদি অত্যন্ত অমার্জিত অনুষঙ্গ শুধু বিব্রতই নয়, উপরন্তু এমন একজন প্রতিষ্ঠিত কবির পরিণতি সম্পর্কে রীতিমত ভাবিত ক'রে তোলে ; 'যখন যন্ত্রণা'য় কবির যেটা ঝোঁক মাত্র ছিলো, 'দৃশ্যের দর্পণে'-তে এসে তা অসহায় দুর্বলতায় দাঁড়িয়ে গেছে। 'যখন যন্ত্রণা'র মাত্রা ও মিলের ছন্দোবদ্ধ কবিতাগুলি যথেষ্ট সহনীয়, কিন্তু এই দ্বিতীয় কবিতাগ্রন্থে সেই দিকটা অধিকাংশই পতনপ্রমাদে দুষ্ট এবং কষ্টচ্ছন্দের অন্ত্যমিলে ভারগ্রস্ত। একমাত্র মিলবদ্ধ 'পরিচয়' কবিতাটির কথা বলছি। এর অন্ত্যমিল এক মাত্রার, আধুনিককালেও ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে তা দক্ষতর ব্যবহারে। অন্যগুলির সাধারণ ছন্দোবিভাগ মোটামুটি পয়ারের সংসারভুক্ত। এবং সেগুলিও দোষমুক্ত নয়। সুতরাং মনে হচ্ছিলো, তিনি গদ্যে ও ভঙ্গ-পয়ারে ভালো লিখতে পারবেন। কেননা ব্যক্তব্যমুখী কবিতার অমন আঙ্গিক অদ্বিতীয় বলা যায়। তবে এখানেও হঠাৎ-হঠাৎ রাম বসুর পূর্ব উজ্জ্বলতা যেন পাওয়া যায়

এয়োতির চিহ্ন নিয়ে দিগন্ত তখন বাসর উন্মুখ
তখন আবীর উড়িয়ে অরণ্যের যুথবদ্ধ নাচ

আমি রুক্ষ নীল কথার সাগরে
ডুব দিয়ে যাই : যদি পাই কথার মাণিক
এই অপরাজিতা আকাশের তলায়, তবে
শান্ত নম্র গলায় বলব
নাও, জয়ন্তী, আমার ভালোবাসার দান
আমায় ধন্য কর। (জয়ন্তী)

এইসব আক্ষেপিক (relative) শিল্পকল্পনার হাতে তিনি স্বচিন্তিত একটি পরিমণ্ডল গড়তে চান, কিন্তু কোথায় যেন দেয়াল তুলে সেই উপমার 'রাজ্যেশ্বরী সন্ধ্যা, এবং রূপময়তার আবর্ত এবং তিনি ঘূর্ণিতে পড়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে আরো একবার বলে উঠতে পারেন

যদি সেই স্তব্ধতায় ডুব দিয়ে তল খুঁজে পাই
পাতালের গাঢ় মাণিক মেঘম্লান প্রেমের প্রাসাদ
আকাশের তারা ছিঁড়ে ছড়াই তোমার মুখে, আবার
সকালে জাগাই আমার স্পর্শে (নিষ্ঠুর নায়িকা)

কিন্তু এরই অন্তিমে তাঁকে নিয়তি টেনেছে আর সেই সঙ্গে উক্ত ব্যর্থতা আবার স্তম্ভের মতো বিপুল হয়েছে : নিষ্ঠুর নায়িকা যাকে বসালে গর্বের শিখরে—সেই আমি, অনাদৃত আমি।

এই অসহায়ত্ব রাম বসুকে 'দৃশ্যের দর্পণে' রচনাকালে বিপর্যস্ত করেছে। চিত্রের বর্ণবহুল অরণ্যে এখন রাম বসুকে মাত্র দিগভ্রান্তই মনে হবে। কোনো স্থিরলক্ষ্যে যেতে গিয়ে 'অকস্মাৎ জিজ্ঞাসার চতুর বেড়াল' তাঁকে অসহিষ্ণু করে তুলেছে। 'রহস্যপুরীর বিরাট দরজা শব্দ করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে'—বন্ধ হয়ে যাবে তাঁর একাগ্র সৎ দৃষ্টির সামনে, যদি না তিনি এখনও 'একটা মুহূর্তের যুগ'কে আবিষ্কার করতে পারেন।

তিনি 'আকাশময় চন্দ্রমল্লিকা'র 'ঠাণ্ডা হাতে' বন্দী হবার একটু আগে তাঁকে অনুরোধ করি, তিনি যেন তাঁর দ্বিতীয় পুরুষকে খুঁজে দেখতে চেষ্টা

করেন ; আমরা বিশ্বাস রাখি অল্পকালের মধ্যেই সেই ধ্বংসের গভীর থেকে' আশ্চর্য্য স্বর' শুনতে পাবো যাতে তাঁর কবিতা আমাদের ঈপ্সিত অস্তিত্বের একমাত্র দর্শন ঠাহর করাতে পারবে। চিৎকৃত ক্ষোভে নয়, আত্মগাম্ভীর্যের সহজ প্রজ্ঞানে পঞ্চাশের জটিল অভীপ্সাগুলোকে সমাহিত মার্গে নিয়ে যাবে। মধ্যপথ অবলম্বন করার দুরূহ বুদ্ধিবৃত্তি তখন তাঁর কবিকর্মে বলিষ্ঠ বন্ধু হবে।

দুটি গ্রন্থেরই ছাপা বাঁধাই মনোরম। বিশেষ করে 'যখন যন্ত্রণা'র প্রচ্ছদপটের জন্যে শিল্পী শ্রীযুত দেবব্রত মুখোপাধ্যায় আন্তরিক শ্রদ্ধার উপযুক্ত।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বরলিপি

আমরা দূর আকাশের নেশায় মাতাল ঘরভোলা সব যত—
বকুলবনের গন্ধে আকুল মউমাছিদের মতো ॥

সূর্য ওঠার আগে মন আমাদের জাগে—
বাতাস থেকে ভোর-বেলাকার সুর ধরি সব কত ॥

কে দেয় যে হাতছানি
নীল পাহাড়ের মেঘে মেঘে, আভাস বুঝি জানি ।

পথ যে চলে বেঁকে বেঁকে অলখ-পানে ডেকে ডেকে
ধরা যারে যায় না তারি ব্যাকুল খোঁজেই রত ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ স্বরলিপি শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

মা -গা -মা II মা -দা -া । -া -পমা -গা I মা -পা পা । দা দা -া
আ ০ ম্ রা ০ ০ ০ ০০ ০ দূ র্ আ কা শে র্

I দা দা -পা । পা পা -দা I মা -া পা । দা পা -া
নে শা য়্ মা তা ল্ ঘ র্ ভো লা স ব্

I মপা মগা -া । -া -া I না র্সা -া । র্সা র্সা -া
য০ ত০ ০ ০ ০ ব কু ল্ ব নে র্

I না -র্সা না । দা পা -া I দা -র্সা র্সা । পা পা -দপা
গ ন্ ধে আ কু ল্ মৌ উ মা ছি দে ০র্

I দা পা -া । মা -গা -মা II
ম তো ০ "আ ০ ম্"

II দা -া দা । পা সা -র্সা I পা র্সা -া ।
সূ র্ য ও ঠা র্ আ গে ০

উত্তরহরী

I গর্সা -দা দা। ণা র্সা -র্ঝা I ণা র্সা -ণা। -ণা -ণা -ণা
ম০ ন্ আ মা দে র্ জা গে ০ ০ ০ ০

I র্সা র্জ্ঞা -ণা। র্রা র্জ্ঞা -ণা I র্রা -ণা র্জ্ঞা। র্রা র্জ্ঞা -ণা
বা তা স্ থে কে ০ তো র্ বে লা কা র্

I র্জ্ঞা -র্মা র্মা। র্জ্ঞা র্ঝা -র্জ্ঞা I র্ঝা র্সা -ণা। মা -গা -মা II
ম্ র্ ধ রি স ব্ গ ত ০ "আ ০ ম্"

II মা গা -ণা। গা ঝা -গা I ঝা সা -ণা।
কে দে য় রে হা ত ছা নি ০

I না -ণা র্সা। র্ঝা র্সা -ণা I ণা দা দা। পা -ণা -ণা
নী ল্ পা ছা ড়ে র্ মে ঘে মে ঘে ০ ০

I মপা মা -ণা। গা গঝা -গা I ঝা সা -ণা
আ০ ভা স্ বু ঝি০ ০ জা নি ০

দা -ণা দা। ণা র্সা -ণা I র্সা র্সা -ণা। না র্সা -ণা
প থ্ যে চ লে ০ বেঁ কে ০ বেঁ কে ০

নর্সা দা -ণা। ণা র্সা -র্জ্ঞা I র্জ্ঞর্মা র্জ্ঞা -ণা। র্সা র্সা -ণা
অ০ ল খ্ পা নে ০ ডে০ কে ০ ডে কে ০

I র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা -ণা। র্রা র্জ্ঞা -ণা I র্রা -ণা র্জ্ঞা। র্রা র্জ্ঞা -ণা
ধ০ রা ০ যা রে ০ যা ব্ না তা রি ০

I র্জ্ঞর্মা র্মা -ণা। র্জ্ঞা র্ঝা -র্জ্ঞা I র্ঝা র্সা -ণা। মা -গা -মা II II
ব্যা০ কু ল্ খোঁ জে ই র ত ০ "আ ০ ম্"

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে মুদ্রিত

বাংলাদেশ
সাহিত্য
সংসদ

আধুনিক বাংলা গানের রুচিবিকার

হাল আমলের 'আধুনিক বাংলা গান' নামে যা গ্রামোফোনে, রেডিও জলসায় গাওয়া হয়ে থাকে তা বাংলা ভাষায় গীত হলেও চেহারাটায় আদৌ বাঙালীয়ানা নেই। সাধারণত এই আধুনিক নামে কথিত গানগুলি বিদেশী সুরের ব্যর্থ অনুকৃতির ওপর সাজানো হয়ে থাকে। কিংবা উদ্ভট অসঙ্গত-ভাবেই দেশী-বিদেশী সুরে মিশ্রন করার চেষ্টা হয়। যার ফলে এইসব গান-গুলির কোন সুনির্দিষ্ট প্রকৃতি খুঁজে পাওয়া যায় না। দেশী সুরে কিংবা রাগ মিশ্রণেও সঙ্গত বিচারবুদ্ধি এবং শিল্পদৃষ্টির অভাব পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের পর, বাংলার আধুনিক গানের গতিটি যেন থমকে তালগোল পাকিয়ে বিকৃতির চরমে উঠেছে—একথা বাংলার সত্যিকারের সঙ্গীতরসিক মাত্রেই স্বীকার করবেন।

কিছুকাল আগে একটি গানের আসরে জনৈক বিদেশী সঙ্গীতরসিক এবং সমালোচককে বাংলার আধুনিক গান শুনে মিচকি হাসতে দেখেছিলাম। তাঁর হাঁসিটা তারিফের নয়, ব্যঙ্গের। তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, এত' পাশ্চাত্য দেশের সবচেয়ে সস্তা সুরের অনুকৃতিই শুনলাম। কিন্তু আপনাদের বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের নানান বৈচিত্র্যসম্পন্ন সুরগুলির সঙ্গে সামান্য যেটুকু পরিচয় হয়েছে, তাতে মনে হয়, এ দেশের সঙ্গীতকাররা যদি তাঁদের এই লোক সঙ্গীতের বিরাট সম্পদকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারেন এবং নতুন সঙ্গীত সৃষ্টিতে কাজে লাগান, তাহলে বিদেশী সুরের অযোগ্য প্রয়োগে নিজেদের সঙ্গীত শিল্পের প্রাণশক্তিটুকু নিশ্চয়ই নষ্ট করবেন না।

বিদেশীর এই মূল্যবান মন্তব্যটি আমাদের অনেকেই নীরবে মেনে নিয়েছিলেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে গবেষণা, সঙ্গীতে উৎকর্ষের দিকে এঁদের দৃষ্টি হীনতা এবং শিল্প-নিষ্ঠার অভাবই একথা প্রমাণ করে যে আধুনিক বাংলা গানের বর্তমান শিল্পীরা আত্মপ্রচারেই সমধিক ব্যস্ত।

সামান্য অভ্যাসেই এই সহজ ফাঁকা অন্তঃসারশূন্য গানগুলি গায়করা পরিবেশন করে থাকেন। দীর্ঘ সাধনার কোন নিদর্শন এই সব গায়ক, সুরকার এবং রচনাকারদের গানগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না বলেই আধুনিক বাংলা গান অন্ধ বহির্উপকরণ প্রধান। সঙ্গীত যে অন্তরমুখী রসের মাধ্যম—এ কথা এই সব আধুনিক গান শুনলে উপলব্ধি করা যায় না।

সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে যে বাংলা সঙ্গীতের এই আধুনিক অধোগতির মুখেও সরকারী পৃষ্ঠপোষণার আনুকূল্য। সম্প্রতি লাইট মিউজিক রম্যগীতি শিরোনামায় যেসব শিল্পশ্রেণীর গান রেডিও মারফৎ প্রচার করা হয়ে থাকে, তার না আছে সুরের মাধুর্য, না আছে পদলালিত্য। এইসব রম্যগীতি বা আধুনিক গানগুলোর নেপথ্যে উচ্চগ্রামে পীড়াদায়ক যন্ত্রসঙ্গীতের চৌহদ্দীটি অযৌক্তিকর। সরকারী রেডিও মারফৎ আধুনিকতার নামে এইভাবে বম্বে মার্কা বিকৃত রুচির পরীক্ষা নিরীক্ষা যদি বাংলা গানের ওপর কিছুকাল চলতে থাকে, তাহলে বাংলা দেশের তরুণ সম্প্রদায় অদূর ভবিষ্যতে সত্যিকারের সঙ্গীতরসিক হবার যোগ্যতা হারাবে, একথা নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে।

একে তো ফিল্মের অশ্লীল সুর বাংলার যুবসম্প্রদায়ের রুচি বিকৃতি ঘটাচ্ছে, তার ওপর যদি সরকারী রেডিও থেকে লাইট মিউজিকের নামে অর্থহীন বিকৃত সুরের পরিবেশন করা হতে থাকে শিল্পীরা অদূরে ভুলবেন যে, সঙ্গীতশাস্ত্র শান্ত রসেরই প্রতীক।

এই চটুল সুর ব্যবহারে শিল্পীরা সাময়িক জনপ্রিয়তা অর্জন করছেন, কিন্তু সঙ্গীত স্রষ্টার মর্যদা কোন কালেই অর্জন করবেন না। বাংলার সঙ্গীত সংস্কৃতির সঙ্গে এঁদের কোন আত্মিক যোগ নেই, বাংলা সঙ্গীতের পুরাতন ধারাটি হয়ত কোনদিন শ্রবণ মনন করার চেষ্টাই করেননি। দুঃখের কথা অনেকে আবার বিদেশী গেতাব (আমেরিকার) ডক্টর অফ মিউজিকের তকমা এঁটে বিদেশী সুরের সঙ্গে গ্রাম্য বা দেশজ সুরের মিশ্রণ ঘটাতে চান!

অথচ বাংলা গানের আধুনিক ধারার যিনি প্রধানতম প্রবর্তক এবং যিনি বাংলা গানের শ্রীবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সফলতা লাভ করেছেন, সেই রবীন্দ্রনাথের রচিত সঙ্গীতগুলির মধ্যে, যেগুলি তিনি দেশজ সুরের মালায় বেঁধে গেছেন, সেইগুলিই সর্বকালের বাঙালী চিত্তে রসগ্রাহ্য হয়েই বেঁচে থাকবে। রবীন্দ্রসঙ্গীত দেশজ সুরেই সার্থক। এখানেই তিনি সঙ্গীতস্রষ্টা।

তাঁর এই সব সঙ্গীতগুলিই দেশকালের উর্দ্ধে, পৃথিবীর সব মানুষের কাছে বৈশিষ্ট্য হিসাবে গ্রাহ্য হবে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেখানে তাঁর গানগুলিতে পুরোপুরি ইউরোপীয় চালে সুরারোপ করেছেন, সেখানে তাঁর স্থান অপূর্ণ থেকে গেছে বলেই আমার মনে হয়। তাঁর পাশ্চাত্য সুরের গানগুলি বাঙালী চিত্তকে রসিয়ে তোলে না।

অথচ যেখানেই দেশী সুর নিয়ে কারিকুরী করেছেন, সেখানেই তিনি সার্থক স্রষ্টা। অনবদ্য তাঁর সেই সৃষ্টি। যেমনে কীর্তনে। কীর্তনের সুরে প্রচুর বৈচিত্র্য আছে। রবীন্দ্রনাথ সেই অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে কোথাও পুরোপুরি, কোথাও বা ভেঙ্গে গড়ে গ্রহণ করেছেন। কোন কোন গানে কীর্তনের সঙ্গে হিন্দুস্থানী ঠুংরির সুর মিশিয়ে সঙ্গীতের ভাবটিকে আরো বর্ণাঢ্য করে তুলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ আরো সার্থক হয়েছেন গ্রাম্য সুরের যথোচিত ব্যবহার করে। আমাদের বাংলা দেশের লোকসঙ্গীতের সুরগুলি যে অমূল্য—এ সত্য উপলব্ধি করেই লোকসুরকে শাস্ত্রীয় সুরের পাশাপাশি প্রয়োগে তিনি দ্বিধা করেন নি। এবং এই মিলনে তাঁর সঙ্গীতগুলি রসের উৎসস্বরূপ হয়ে উঠেছে। বাউল, ভাটিয়াল, বিচ্ছেদ, আগমনী ইত্যাদি গ্রাম্য সুরগুলিকে তিনি তাঁর গানের ভাবটিকে সম্পূর্ণ করতেই কাজে লাগিয়েছেন। কোথাও ভেঙ্গে গড়েছেন কোথাও পুরো সুরটিকে রেখেছেন ভাবের প্রয়োজনেই। রাগরাগিণী-গুলিকে গানের ভাবের উপযুক্ত করেই মিশ্রণ বা শুদ্ধ প্রয়োগ করেছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, হাল আমলের আধুনিক সঙ্গীতকাররা এই মর্মকথাটির মূল্যই দিলেন না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্র পদ্ধতির মতন দেশজ সুর নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যাঁরা সঙ্গীত স্রষ্টার দ্বারে পৌঁছুতে পেরেছেন এবং আমাদের চিত্তে সঙ্গীত রসের শান্ত সুন্দর আনন্দ বা বেদনার উপলব্ধি রেখে যান, তাঁদের অন্যতম অতুলপ্রসাদ।

অতুলপ্রসাদের গান বাংলা ভাষায় মানুষ যতকাল কথা বলবে, তদাবধিই বাঙালী চিত্তে রস সিঞ্চনে জীবন্ত থাকবে। অতুলপ্রসাদ মিশ্রণ কম করলেও তাঁর রচিত গানের প্রয়োজনেই ভাবের উপযুক্ত রাগরাগিনী এবং দেশজ সুরই ব্যবহার করেছেন। বিদেশী সুরের ধারেও যাননি। হয়ত এই দেশী মেজাজের জন্যেই অতুলপ্রসাদী বাঙ্গালীর মনোহর করেছেন। ইদানীং কালে, দিলীপ-কুমার রায় মহাশয়ের সুরগুলির মধ্যে নিজস্ব একটা গুণ পাওয়া যায়। কিন্তু

পুরোপুরি ঐতিহ্যসম্পন্ন নয় বলেই হয়ত গানে তিনিও সর্বসাধারণের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি।

উনিশ শতকে যেসব স্রষ্টা বাংলা গানের বিভিন্নমুখী বিকাশ ঘটালেন, তাঁদের ইতিহাস থেকেই দেখা যায় যে রচয়িতা এবং সুরকার এক ব্যক্তি হওয়ার ফলে তাঁদের সৃষ্ট সঙ্গীত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হতে পেরেছে। যাকে ঘরানাও বলা যেতে পারে এমন স্বাতন্ত্র্য তাঁরা রেখে গেছেন। রামপ্রসাদ নিধুবাবু দাশু রায় শ্রীধর কথকের গান আজিও তাই সঙ্গীতরসিকদের কাছে প্রাণবন্ত। এঁদের পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল ইত্যাদি সঙ্গীত সাধকগণ তাঁদের রচিত সঙ্গীতের কথা ও সুর নিজেরাই সৃষ্টি করেছেন।

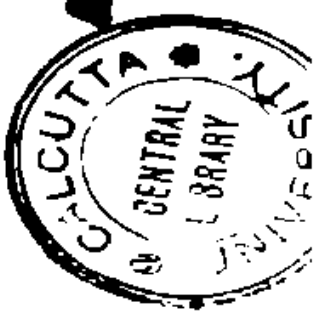
ইদানীংকালে গান রচনার ক্ষেত্রেও জাত কবিদের হস্তক্ষেপ নেই। এক-মাত্র দু' একজন আধুনিক কবি কিছু গান রচনা করেছিলেন। কিন্তু ইদানীং যারা গান রচনা করেন তাদের কাব্যচর্চায় প্রাথমিক হাতমক্সও নেই, অথচ প্রতিষ্ঠিত কবিরাও অর্ডারমাফিক সঙ্গীত রচনায় পরাঙ্মুখ।

কিন্তু কেন কবিরা আসবেন না সঙ্গীতের ক্ষেত্রে? কেন তাঁরা সুর অনুশীলন করবেন না? আজ যদি কবিরা সুর অনুশীলন করেন, যদি তাঁদের রচিত ভাবকে নিজেরাই ধরে সাধনা সুরু করেন, তাহলে হয়ত আধুনিক বাংলা গান শুধু রসিকচিত্তকে তৃপ্ত করবে না, পরন্তু রবীন্দ্রনাথ-অতুল-দ্বিজেন্দ্র-নজরুলের পর বাংলা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যে বিরাট ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে সেটা পূর্ণ হবার সম্ভাবনাই সৃষ্টি করবে।

মদন বন্দ্যোপাধ্যায়

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক টেম্পল প্রেস, ২নং শ্যামরত্ন সেন, কলিকাতা ৯ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উত্তরসূরী



প্রবন্ধাবলী : আশুতোষ ভট্টাচার্য : শিশিরকুমার ভাদুড়ী । ২৬৯ । মণি বাগচী : বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও শিশিরকুমার । ২৭৪ । সুধীর চক্রবর্তী : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর । এডিথ সিটওয়েল : তিনটি চিঠি ও দুটি কবিতা । কার্তিক লাহিড়ী : সমকালীন কথা-সাহিত্যিক : নরেন্দ্রনাথ মিত্র ।

কবিতাবলী : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণ ভট্টাচার্য, সুনীল বসু, সুশান্ত ঘোষ, মানস রায়চৌধুরী, সুশান্ত বসু, নবেন্দু চক্রবর্তী, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শান্তি লাহিড়ী, দিব্যেন্দু পালিত, পরিমল চক্রবর্তী, সুবোধ দাশগুপ্ত, শিবশম্ভু পাল, আলোক সরকার।

সমালোচনা সাহিত্য : বুদ্ধদেব বসুর 'যে আঁধার আলোর অধিক'. অরুণকুমার সরকার ॥ শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গ : কবি ও কবিতা মেলা সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায় । আলোচনা : আশুতোষ ভট্টাচার্য : ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে নারীগণের পতিনিন্দা । সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায় : পূর্ব বাংলার সমকালীন লেখা

ষষ্ঠ বর্ষ নব পর্যায় চতুর্থ সংখ্যা

শ্রাবণ-আশ্বিন

উত্তরসূরী

ষষ্ঠ বর্ষ ॥ চতুর্থ সংখ্যা ॥ শ্রাবণ-আশ্বিন ॥ ১৩৬৮

ছবি

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর স্কেচ ॥ সুবীর সেন

প্রবন্ধাবলী

আশুতোষ ভট্টাচার্য : শিশিরকুমার ভাদুড়ী। ২৬৯। মণি বাগচী বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও শিশিরকুমার। ২৭৪। সুধীর চক্রবর্তী : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২৯০। এডিথ সিট্‌ওয়েল : তিনটি চিঠি ও দুটি কবিতা। ৩১৭। কার্তিক লাহিড়ী : সমকালীন কথা-সাহিত্যিক। নরেন্দ্রনাথ মিত্র। ৩২৮।

কবিতাবলী

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণ ভট্টাচার্য, সুনীল বসু, সুশান্ত ঘোষ, মানস রায়চৌধুরী, সুশান্ত বসু, নবেন্দু চক্রবর্তী, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শান্তি লাহিড়ী, দিব্যেন্দু পালিত, পরিমল চক্রবর্তী, সুবোধ দাশগুপ্ত, শিবশম্ভু পাল, আলোক সরকার। ৩০২-৩১৬।

সমালোচনা সাহিত্য

বুদ্ধদেব বসুর 'যে আঁধার আলোর অধিক' : অরুণকুমার সরকার। ৩১৬।

শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গ

কবি ও কবিতা মেলা : সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়। ৩৪০।

আলোচনা

আশুতোষ ভট্টাচার্য : ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে নারীগণের পতিনিন্দা।
সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায় : পূর্ব বাংলার সমকালীন লেখা। ৩৪৮-৩৪৮।

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৯বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা ২



শিশিরকুমার ভাদুড়ী

স্কেচ : সুবীর সেন

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

উত্তরসূরী

ষষ্ঠ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা ॥ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৬

শিশিরকুমার ভাদুড়ী

আশুতোষ ভট্টাচার্য

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পরলোকগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা রঙ্গমঞ্চের আর একযুগের অবসান হইল। বাংলা রঙ্গমঞ্চের ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিলে দেখা যায়, কয়েকটি বিশিষ্ট প্রতিভা অবলম্বন করিয়া ইহার এক একটি যুগ সৃষ্টি হইয়াছে, অবশ্য এই শ্রেণীর প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তির সংখ্যা যেমন খুব বেশী নহে, যুগের সংখ্যাও বেশী নাই—গিরিশচন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রথম যুগ সৃষ্টি হইয়াছিল; গিরিশচন্দ্র সাধারণ বাঙ্গালী দর্শকদিগের মধ্যে রঙ্গমঞ্চের প্রতি যে কৌতূহল ও আগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে এই পথে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তাহারই সদ্ব্যবহার করিবার পূর্ণ সুযোগ লাভ করিয়াছেন। আজ হইতে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইহার দ্বিতীয় যুগের সূচনা দেখা দিয়াছিল। শিশিরকুমারের আবির্ভাবের কিছুকাল পর্যন্ত প্রথম যুগের প্রভাব একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে নাই, তবে এ কথা সত্য গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহার প্রভাব হ্রাস পাইয়া আসিতেছিল, শিশিরকুমারের সাধনার ভিতরেই তাহা অস্তমিত হইয়া গেল।

রঙ্গমঞ্চের উত্থানপতনের সঙ্গে দেশের নাট্যসাহিত্যের একটি অবিচ্ছেদ্য যোগ না থাকিয়া পারে না। ভারতে মুসলমান অধিকারের পর সর্বত্রই রঙ্গমঞ্চের যে অধঃপতন বা বিলোপ দেখা গিয়াছিল, তাহার ফলে স্বভাবতঃই সে যুগে ভারতের কোন প্রাদেশিক ভাষাতেই একখানিও নাটক রচিত হইতে পারে নাই। তারপর এদেশে ইংরেজ অধিকার স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যে নাটক রচনার এত উৎসাহ দেখা দিল, তাহার কারণ যে কলিকাতার রঙ্গমঞ্চের

প্রতিষ্ঠা তাহা ত কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। গিরিশচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা সাহিত্যে শত শত নাটক রচিত হইয়াছে, তিনি নিজে যেমন তাঁহার অকৃপণ দানে বাংলা নাট্যসাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছেন, তেমনই অন্যদিকে তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া বহু নাট্যকার অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন। শিশিরকুমারের দ্বারা সে কার্য কতদূর সম্ভব হইয়াছে, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে।

শিশিরকুমার নিজে একখানিও নাটক রচনা করেন নাই, অন্যের রচিত নাটক অভিনয় করিয়াছেন মাত্র, ইহা হইতে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে যে গিরিশচন্দ্র যে কাজ করিয়াছেন, শিশিরকুমার সে কাজ করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই বিষয়ে একটি কথা এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, গিরিশচন্দ্রের যুগে অভিনয়োপযোগী নাটকের অভাব ছিল, সেইজন্য নাটক রচনার কার্যও তাঁহার নিজেকেই করিতে হইয়াছে। শিশিরকুমারের যুগে সে অভাব পূর্ণ হইয়াছিল সুতরাং নিজে নাটক রচনা করিয়া অভিনয় করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। এমন কি এ কথাও সত্য যে নাট্যকার হিসাবে শিশিরকুমার কোন পরিচয় দিতে পারেন নাই, সুতরাং সে প্রয়োজন যদি থাকিত, তথাপি তিনি যে তাহা যথার্থ পূর্ণ করিতে পারিতেন তাহা নহে; সুতরাং গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে শিশিরকুমারের এই দিক দিয়াও পার্থক্য ছিল। তথাপি শিশিরকুমার কি ভাবে রঙ্গমঞ্চের মধ্য দিয়া বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে নূতন যুগ সৃষ্টি করিলেন, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হয়।

শিশিরকুমারের প্রথম কাজ বাংলার রঙ্গমঞ্চকে তিনি সামাজিক পাতিত্য হইতে রক্ষা করিয়াছেন। শিশিরকুমারের সমসাময়িক কাল পর্যন্ত বাংলার ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চ কিংবা অভিনেতা অভিনেত্রীর কার্যে যাঁহারা নিযুক্ত থাকিতেন নানা কারণেই তাঁহারা যথাযোগ্য সামাজিক মর্যাদা লাভ করিতে পারেন নাই। যে সমাজ হইতে তাহাদের অভিনেত্রী সংগ্রহ করিয়া মঞ্চব্যবসায় পরিচালনা করিতে হইত, সমাজের দৃষ্টিতে তাহা পতিত ছিল বলিয়া স্বভাবতঃই ব্যবসায় সূত্রে তাহাদের সাহচর্যে যাহাদের জীবন কাটাইতে হইত, তাহারাও সমাজে নিন্দনীয় হইতেন। ইংরেজি শিক্ষিত আধুনিক রুচি ও নীতিবোধ সম্পন্ন কলিকাতার সমাজের পূর্বে রঙ্গমঞ্চের প্রতি আকর্ষণ অনুভব না করিবার ইহাই কারণ ছিল। দেশের মননশীল সমাজের নিকট রঙ্গমঞ্চের কোন আবেদন

ছিল না, অথচ এ কথা সকলেই বুঝিতে পারেন যে দেশের উচ্চশিক্ষিত ও চিন্তাশীল সমাজের এদিকে যদি দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়, তবে রঙ্গমঞ্চই হউক কিংবা নাট্যসাহিত্যই হউক কাহারও উন্নতি সম্ভব নহে। শিশিরকুমার কেবল মাত্র আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া সেদিন একটি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত জীবিকা পরিত্যাগ করিয়া এই জীবনে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। এ বিষয়ে তিনি যে দুঃসাহস দেখাইয়াছিলেন, তিনি যদি সেদিন তাহা না দেখাইতেন তবে বাংলার রঙ্গমঞ্চ বর্তমানে যে সামাজিক মর্যাদা লাভ করিয়াছে, তাহা সম্ভব হইতে কত দেরী হইত, আজ কল্পনা করাও কঠিন। শিশিরকুমারকে দিনের পর দিন এ অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া বাংলার অভিনেতা অভিনেত্রী গোষ্ঠির জন্য বর্তমান মর্যাদা আদায় করিতে হইয়াছে, এ কাজ একদিনে সম্ভব হয় নাই। রঙ্গমঞ্চ যে উচ্চশিক্ষিত সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরও জীবিকার ক্ষেত্র হইতে পারে তাহা তিনি ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। ১৯২৮ কিংবা ১৯২৯ সনে তিনি যখন একবার তাঁহার দলবল লইয়া ঢাকা সহরে কয়েক রাত্রির জন্য অভিনয় করিতে যান, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সমিতি হইতে তাঁহাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্বর্ধনা জানান হয়। সেই সম্বর্ধনার উত্তরে তিনি একটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বর্তমান প্রবন্ধ লেখক এখনও স্মরণ করিতে পারেন। শিশিরকুমার তাঁহার ভাষণ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'ঢাকায় এসে আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন জাতে উঠেছি।' এ কথার তাৎপর্য অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁহার এই কথা হইতেই তখনও তিনি কলিকাতায় সামাজিক মর্যাদা লাভ করিবার জন্য যে কি কঠিন সংগ্রাম করিতেন, তাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। আজ যাঁহারা অনেকেই শিশিরকুমারের মৃত্যুসংবাদ পাইবামাত্র ফুলের মালা লইয়া তাঁহার মৃতদেহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবার জন্য ছুটিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই পঁচিশ বৎসর পূর্বে তাঁহাকে কোন সামাজিক মর্যাদা দিতে কুণ্ঠাবোধ করিয়াছেন। শিশিরকুমারের এই উক্তি তাহারই প্রমাণ। শিশিরকুমার তাঁহার অতুলনীয় অভিনয় প্রতিভার গুণে সকল বাধাবিঘ্ন জয় করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। সমাজের অবজ্ঞা তাঁহাকে আদর্শচ্যুত করিতে পারে নাই। নিজের লক্ষ্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন, ইহার মধ্য দিয়াই তাঁহার চরিত্র শক্তির যথার্থ বিকাশ হইয়াছে। আত্মপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে

শিশিরকুমার শিক্ষিত বাঙালীর মনীষা এইদিক দিয়া আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সম্ভ্রান্ত সমাজ যে আজ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত হইয়াছেন, তাহার মূল যে তিনিই, তাহা আমরা কোনদিন অস্বীকার করিতে পারিব না।

'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' বইখানি প্রকাশিত হইবার পর, আজ হইতে প্রায় চারি বৎসর পূর্বে, একদিন যখন শিশিরকুমারের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় তখন বাংলা রঙ্গমঞ্চের এমনই একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি আলোচনা করেন। ইংরেজি রঙ্গমঞ্চের সুদীর্ঘ ইতিহাস রচিত হইয়াছে, তাহা অনুসরণ করিলে একটি জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের ক্রমবিকাশের একটি বিশিষ্ট ধারার সঙ্গে পরিচয়লাভ করা যায়। বাংলায় নাটকের ইতিহাস ইদানীং কিছু কিছু রচিত হইয়াছে সে কথা সত্য, কিন্তু যে রঙ্গমঞ্চ হইতে নাটক স্ব-রূপ লাভ করিয়া জাতির হৃদয়ের একান্ত সন্নিকটবর্তী আসন লাভ করিয়াছে, তাহার কোনও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আমাদের জানা নাই। শিশিরকুমার বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রথম হইতে আধুনিকতম কাল পর্যন্ত ইহার বিচিত্র জীবনধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতমভাবে পরিচিত ছিলেন। আলোচনাকালে দেখা গেল, এই বিষয়ে তাঁহার স্মৃতিশক্তি তখনও এমনই প্রখর যে তিনি সমস্ত বিষয়টির ঐতিহাসিক পারম্পর্য রক্ষা করিয়া মৌখিক প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। বাংলা নাটকের ইতিহাসের মত বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসও খুব প্রাচীন নহে; তথাপি প্রথম হইতেই যে বাধাবিঘ্ন জয় করিয়া বাংলা রঙ্গমঞ্চ আজ বাঙালীর সাংস্কৃতিক অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষার বিকাশ সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে, তাহার ইতিহাস বিচিত্র ঘটনা-সঙ্কুল। বাঙালীর জীবনে বহুদিন যাহার অস্তিত্ব ছিল, তাহাকে তাহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তিরূপে সৃষ্টি করিয়া তুলিবার ইতিহাস প্রত্যেক অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরই অনুসরণের যোগ্য। জাতীয় রঙ্গমঞ্চের মত বাংলা রঙ্গমঞ্চের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হউক ইহাই শিশিরকুমারের অভিপ্রায় ছিল। তিনি নিজের জীবনে তাঁহার কোন ইচ্ছাই দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। যে শিল্পকে তিনি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস দিয়াও অনুশীলন করিয়াছেন, তাহার সম্পর্কিত কোন কিছুরই অভাব তাঁহার সহ্য হইত না।

তথাপি শিশিরকুমারের মত প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও বাংলার নাট্যসাহিত্য তাহা দ্বারা কোনদিক দিয়াই লাভবান্ হইতে পারে নাই। শিশিরকুমার নিজে

শিশিরকুমার ভাদুড়ী

যেমন কোন নাটক রচনা করেন নাই, তেমনই কেবল মাত্র তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া বাংলার কোন নাট্যকার-গোষ্ঠিও গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তাঁহার মত একজন বিদগ্ধ শিল্পী কি এ কাজ যথার্থ সম্ভব করিয়া তুলিতে পারিতেন না? অভিনেতার প্রভাব সমাজে সাময়িক, কিন্তু সার্থক নাট্যকারের সৃষ্টি দেশ ও কালোত্তীর্ণ। সুতরাং শিশিরকুমারের মধ্যে অভিনেতার যে গুণই প্রকাশ পাক না কেন, তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যদি তাহা তিরোহিত হইয়া যায়, তবে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনে তিনি কি কীর্তি রাখিয়া গেলেন? একথা সত্য শিশিরকুমার অভিনয় ও নাট্যকলা সম্পর্কে যত অধ্যয়ন করিয়াছেন, লিখিত ভাবে তিনি তাহা তত প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার সঙ্গে সামান্তকাল আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইত, নাটক সম্পর্কে এত বড় পণ্ডিত ব্যক্তি এদেশে আর দ্বিতীয় নাই, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাঁহার এই অধ্যয়নের স্পৃহা জাগ্রত রাখিয়া ছিলেন, এ কথাও সত্য তিনি অধ্যয়ন ও অভিনয় লইয়া সমস্ত জীবনই ব্যস্ত ছিলেন। তথাপি ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকিবার ফলে ইহার আর্থিক দিকটিও লক্ষ্য রাখিবার যে দায়িত্ব আছে তাহা পালন করিতে গিয়া তিনি গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে কিছু লিখিয়া যাইবার সুযোগ পান নাই। কিন্তু এ সম্পর্কে আমাদের দায়িত্বই কি আমরা পালন করিয়াছি? আমরা, যাঁহাদের মঞ্চ-পরিচালনা কিংবা অভিনয় করা কাজ নহে, তাঁহারা স্বচ্ছন্দেই তাঁহার অমূল্য সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাহা দ্বারা এই বিষয়ে প্রেরণা লাভ করিতে পারিতাম। কেবল মাত্র তাঁহার সান্নিধ্য হইতে বাংলা সাহিত্যের একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হইতে পারিত। এক বিষয়ের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া যিনি সমাজকে এক অমূল্য সম্পদ উপহার দিয়া থাকেন, তাঁহার নিকটই আমরা সব কিছুই প্রার্থনা করিয়া আমাদের শূন্য ঝুলি পূর্ণ করিতে চাহিব এই কথাও অর্থহীন। শিশিরকুমার যাহা দিবার তাহা সমাজকে অকৃপণ হস্তে দিয়াছেন, তাঁহার প্রত্যক্ষ সাহচর্যের সুযোগ লাভ করিয়াও আমরা যদি আমাদের কর্তব্যচ্যুত হইয়া থাকি, তবে তাহার জন্য তাঁহাকে দোষী করা যায় না। ইহার দায়িত্ব নিজেদের উপর লওয়াই সঙ্গত।

জাতীয় রঙ্গমঞ্চ ও শিশিরকুমার

মণি বাগচি

প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশালা বিদেশীর কীর্তি। দেশের লোকের উৎসাহ ও রুচির সঙ্গে এর কোনো প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না, তাই এ প্রয়াস স্থায়ী হতে পারেনি। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাঙালি-জীবনের ওপর পুরাতনের প্রভাব সম্পূর্ণ বর্তমান ছিল। তখনো পর্যন্ত বাঙালিরা আমোদ-প্রমোদের ব্যাপারে যাত্রা, পাঁচালী, কবি-গান প্রভৃতি নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল, য়ুরোপীয় ধরণের নতুন কোনো আমোদ-প্রমোদের অভাব অনুভব করতে আরম্ভ করে নি। এই অভাব তারা অনুভব করতে আরম্ভ করলো এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে। তারপর যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রুচির পরিবর্তন হলো; গতানুগতিক আমোদ-প্রমোদ ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালির কাছে রুচিকর হওয়া দূরে থাকুক, অত্যন্ত ঘৃণ্য ও স্থূল মনে হতে লাগলো। হিন্দু কলেজের শিক্ষার ফলেই কলকাতায় ইংরেজি ধরণের নাট্যশালার উদ্ভব হলো। ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালিরা নিজেদের বাড়িতে শহরে ইংরেজদের নাট্যশালার অনুকরণে ইংরেজি নাটকের অভিনয় করে বাঙালিদের মধ্যে নাট্য-অনুরাগ জাগিয়ে তোলেন। বাঙালি-প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালার সূত্রপাত হলো শেক্সপীয়রের নাটক ও ভবভূতির ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে। মোট কথা, বাংলা থিয়েটার ও বাংলা নাটকের উৎপত্তি ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালিদের দ্বারা বিদেশীর আদর্শে।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'হিন্দু থিয়েটার'ই ইংরেজি-শিক্ষিত নব্য বাঙালি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা। এ হলো ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের কথা। কিন্তু ইংরেজি নাটক নিয়ে বাংলা থিয়েটার জমে উঠল না, জনপ্রিয়ও হয়ে উঠল না। এর পরেই কলকাতায় যে নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হয়, তাতে ইংরেজি নাটকের পরিবর্তে বাংলা নাটক অভিনীত হলো; প্রকৃতপক্ষে বাঙালির উদ্যোগে বাংলা নাটকের অভিনয় এই নাট্যশালাতেই সর্বপ্রথম হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নবীনকৃষ্ণ বসু। নবীনবাবুর থিয়েটারই বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে বিশেষ-

ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই থিয়েটার তাঁর শ্যামবাজারের বাড়ীতে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দেখা যায় যে বাংলা দেশে একটিও স্থায়ী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় নি। বাংলা থিয়েটারের প্রথম পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস তাই একান্তভাবে ধনীদেরই ব্যক্তিগত উদ্যমের ইতিহাস, জাতীয় চেতনা সেখানে একেবারেই অনুপস্থিত।

থিয়েটারে নতুন যুগ দেখা দিল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে। এই সময়েই বাংলাদেশে নাট্যাভিনয় ও নাটকরচনার ধারায় একটি নূতনত্ব দেখা দিল এবং এরই পূর্ণ বিকাশ আমরা লক্ষ্য করি বেলগাছিয়া নাট্যশালায়। তখনকার দিনের গণ্যমান্য ও শিক্ষিত লোকের মতে এমন সুন্দর সুসজ্জিত নাট্যশালা ও উচ্চাঙ্গের অভিনয় আগে আর হয়নি। এই নাট্যশালার প্রতিষ্ঠায় পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তাঁর ভাই ঈশ্বরচন্দ্র বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। এর পর থেকেই বাংলা রঙ্গমঞ্চ দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকে এবং উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শেষ পর্যন্ত এই উদ্যম অব্যাহত থাকে।

শুধু রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হ'লেই ত হয় না, চাই এর জন্য নাটক; নাটক কোথায়? বাংলা সাহিত্যের যেমন একটা প্রাচীন ইতিহাস আছে, বাংলা নাটকের তেমন কিছু নেই। উনিশ শতকের আগে বাংলা নাটক ছিল না বললেও অত্যুক্তি হয় না। বাংলা দেশে রঙ্গমঞ্চের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নাটকের আবির্ভাব। পুরাতন যাত্রার সঙ্গে বাংলা নাটকের কোনো নাড়ীর যোগ নেই। যাত্রা থেকে বাংলা নাটকের উদ্ভব হয় নি। উনিশ শতকের মাঝা-মাঝি বাংলা রঙ্গমঞ্চের নবজীবন লাভ হতে থাকে, বাংলা নাটক রচনার সূত্রপাতও এই সময় থেকে। এতদিন কলকাতায় যেসব নাটকের অভিনয় হয়েছিল, সেগুলো প্রায়ই পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে অথবা ইংরেজি নাটকের আদর্শে রচিত। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি বাংলা দেশে সমাজ সংস্কারের আন্দোলন আরম্ভ হওয়াতে তখন থেকে নাটকে সামাজিক সমস্যার অবতারণা হয়। যতদূর জানা যায়, রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' এইরকম সামাজিক নাটকের মধ্যে সর্বপ্রথম। নাটকটি লেখা হয় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে আর এর অভিনয় হয় বেলগাছিয়া থিয়েটারে ১৮৫৬-তে। বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে সবচেয়ে এর ঐতিহ্য ও গৌরব এই যে 'কুলীন কুলসর্বস্ব'ই প্রথম অভিনীত বাংলা নাটক। এই মৌলিক প্রহসনখানিই বাংলা সাহিত্যে বিয়োগান্ত সামাজিক

নাটকের সূচনা করে দিয়েছে। তা'ছাড়া নূতন বাংলা ভাষারও প্রথম উদ্যমের একটি নিদর্শন হিসেবে এই নাটকখানির একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে। রাম-নারায়ণের সবচেয়ে বড়ো গৌরব এই যে, বেদনার্ত জীবনধর্মের সহৃদয় নাট্যকার তিনি এবং মঞ্চের মাধ্যমে সামাজিক বিষয়ের সংস্কার সাধন করতে তিনি ছিলেন বাংলার লেখকদের মধ্যে অগ্রবর্তী।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বাংলাভাষার প্রথম নাটক লিখলেন ইংরেজি তন্ত্রে দীক্ষিত মাইকেল মধুসূদন দত্ত ('শর্মিষ্ঠা'-১৮৫৯)। সমসাময়িক যাত্রা-গানের কদর্যতা ও নাটকের তুচ্ছতা দেখেই তিনি নাটক লিখবার প্রেরণা লাভ করেছিলেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় রামনারায়ণের 'রত্নাবলী' নাটকের যে চমৎকার অভিনয় হয়েছিল, পরোক্ষভাবে তাও মাইকেলকে বাংলা নাটক রচনায় প্রবৃত্ত করে থাকবে। শুধু কি নাটক? নবজাগরণের যে বিপুল জোয়ার তখন বাঙালির মনের ওপর দিয়ে বয়ে যেতে শুরু করেছে, যুগসচেতন মাইকেল অনুভব করলেন যে, এই জাগরণকে সার্থক করে তোলার পক্ষে জাতীয় নাট্যশালা অপরিহার্য। দীপাবলীতেজে উদ্ভাসিত বেলগাছিয়ার সুরম্য থিয়েটার দেখেই মাইকেল যেন জাতীয় নাট্যশালার স্বপ্ন দেখলেন। তিনি মনে প্রাণে অনুভব করলেন যে, জাতির মর্মের সঙ্গেই নাটক ও মঞ্চের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—শুধু চিত্তবিনোদন এদের একান্ত লক্ষ্য হতে পারে না। এই কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, সমকালীন অন্যান্য নাট্যকারের তুলনায় মধুসূদন বেশি বাস্তবনিষ্ঠ; কাহিনী রচনায় এবং চরিত্রাঙ্কনে তিনি রক্তমাংসের স্বাভাবিক মানুষকেই রূপ দিতে চেয়েছেন। বাংলা নাটকে প্রাণসঞ্চার করে এক নতুন পথ তিনিই দেখালেন; তাঁর নাটকেই আমরা নূতন মূল্যবোধের প্রথম আলোকোৎসার দেখলাম, তাঁরই নাটকে আমরা শুনতে পেলাম নবজীবনবাণী।

বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। যে জাতীয় নাট্যশালার স্বপ্ন মাইকেল দেখেছিলেন, মৃত্যুর ঠিক এক বছর আগে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তিনি সংবাদ পেলেন যে, তাঁর সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। প্রতাপ জহুরী ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপন করলেন এই বছর এবং এই রঙ্গমঞ্চ দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক নিয়ে পাদপ্রদীপের সম্মুখে প্রথম আত্মপ্রকাশ করলো ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭২। জাতীয় নাট্যশালার স্বপ্ন মাইকেলের, কিন্তু এর স্রষ্টার গৌরব দীনবন্ধু মিত্রের। এর ঠিক পাঁচবছর

পরেই বাংলার নাট্যজগতে প্রবেশ করলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তাঁর প্রতিভা তিন দিক দিয়ে, বাংলা নাট্যসাহিত্য, বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয় রীতিকে কিভাবে পরিস্ফুট করেছিল, সে ইতিহাস সুপরিচিত। গিরিশচন্দ্রের যুগ বাংলা নাট্যসাহিত্য তথা বাংলা রঙ্গমঞ্চের স্বর্ণযুগ। পারিবারিক রঙ্গমঞ্চের যুগ তখন শেষ হয়ে এসেছে। এতকাল যা ছিল কলকাতার নাগরিক সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজন অভিজাত সমাজশ্রেষ্ঠের রুচি ও আস্বাদনের সীমায় আবদ্ধ —জাতির সেই বৃহৎ নাট্য-প্রয়াস বৃহত্তর আর মধ্যবিত্ত সমাজ-জীবনের মধ্যে এখন ছড়িয়ে পড়ল। নবজাগ্রত সমাজবোধ ও জাতিপ্রেম তখন যে নতুন জীবন-প্রেরণার সঞ্চার করেছিল, যে সর্বজনীন চেতনার জন্ম দিয়েছিল, তাই বাংলা সাহিত্যকে, বিশেষ করে নাট্যসাহিত্যকে পূর্ণবিকাশের পথে নিয়ে গিয়েছিল। এই ছিল সেদিন গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবকালের পটভূমি। রাজনীতি, সমাজনীতি ও সংস্কৃতিগত মূল্যবোধের সংমিশ্রণে যে অখণ্ড বাঙালী জাতীয়তাবোধ তখন গড়ে উঠেছিল, তাই-ই গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভাকে যুগপৎ উন্মেষিত ও উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল: বাংলা রঙ্গমঞ্চের পরিপালনে ও পরিপুষ্টিবিধানে গিরিশচন্দ্রের সাধনা, অধ্যবসায় ও প্রতিভা নিয়োজিত হয়েছিল—সে বিস্ময়কর ইতিহাসের সঙ্গে বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই সুপরিচিত। ত্রিশ বছর ধরে তিনি রঙ্গমঞ্চকে গড়ে তুলেছিলেন, শতাবধি নাটক রচনা করেছিলেন আর সৃষ্টি করেছিলেন এক বৃহৎ অভিনেতৃ মণ্ডলী। বাংলা দেশে সাধারণ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠায় গিরিশচন্দ্রের দান সত্যই অতুলনীয়। একদা বাগবাজারের বোসপাড়ায় একটি সখের যাত্রাদলে যার নটজীবনের সূচনা হয়েছিল তিনিই পরবর্তীকালে বাংলা রঙ্গমঞ্চের জনকের গৌরব অর্জন করেন।

রসরাজ অমৃতলাল বসু লিখেছিলেন :

"মদমত্ত পদটলে নিমে দত্ত রঙ্গস্থলে
বাঙালি দেখিল সেই নটগুরু তার।"

দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটকে নিমচাঁদের ভূমিকাতেই গিরিশচন্দ্র প্রথম নটহিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। এ ঘটনা ১৮৬৮–৬৯ খৃষ্টাব্দের কথা। 'সধবার একাদশী'র অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র বাঙালি নটের যে আদর্শ সৃষ্টি করেছিলেন দীর্ঘকাল তাই ছিল বাঙালির একমাত্র আদর্শ। সেই আদর্শের

আমূল পরিবর্ত্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করলেন শিশিরকুমার। বাঙালি দর্শক 'আলমগীরে' সেই নতুন আদর্শ দেখল, দেখে মুগ্ধ হলো।

বাংলা রঙ্গমঞ্চে গিরিশ যুগের অবসান আর শিশির যুগের সূচনা—এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান মাত্র এগার কি বারো বছরের; কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই নাট্যশালা তার জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। থিয়েটার ছিল নিতান্ত থিয়েটার—সমাজজীবনের ওপর তার কোনো প্রভাবই ছিল না। শহরে মঞ্চ ছিল কয়েকটি, পুরাতন যুগের দিকপাল অভিনেতারা তখন একে একে গত হয়েছেন, অমৃতলাল বসু নিয়েছেন অবসর আর একা দানীবাবু ছিলেন মঞ্চে পুরাতন ভাবধারার একমাত্র ধারক এবং বাহক। মঞ্চে তখন চলেছে রীতিমত অজন্মার যুগ, নূতন সৃজনী প্রতিভা তখনো পর্যন্ত দূরে অপেক্ষা করছে। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল মিত্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী প্রভৃতি প্রতিভাধর অভিনেতারা যখন একে একে পরলোকগমন করলেন, তখন সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের যে অবস্থা হয়েছিল তা এককথায় ভয়াবহ। গিরিশপুত্র দানীবাবু (সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ) তখনকার শ্রেষ্ঠ অভিনেতারূপে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন বটে, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের সহযোগিতা হারিয়ে কোনও নতুন কিছু সৃষ্টি করতে অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ছিলেন পিতার অভিনয় প্রতিভার reflected glory মাত্র, তার বেশি কিছু নয়, তাই তাঁর দিন কেটে যেত পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করেই। তারকনাথ পালিত, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অল্প কয়েকজন অভিনেতা উল্লেখযোগ্য অভিনয় করতেন, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। দানীবাবু থেকে আরম্ভ করে তখনকার অধিকাংশ অভিনেতারই শিক্ষার সঙ্গে যেটুকু সম্পর্ক ছিল তা নিতান্তই তুচ্ছ। ইংরেজি দূরের কথা, অনেকে বাংলা কাব্য নাটকের রসও গ্রহণ করতে পারতেন না। গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির পরে এইসব অরসিকদের নিয়েই বাংলা রঙ্গালয়ের কর্তারা প্রায় একযুগ ধরে কাজ চালিয়ে গেছেন। শেষের দিকে মনমোহন থিয়েটারের আমলে বাংলা থিয়েটারের দুর্দশা উঠেছিল একেবারে চরমে। শিক্ষিত সম্প্রদায় তাই মঞ্চ থেকে দূরেই ছিলেন, তাঁরা প্রাক্-শিশিরযুগের বাংলা অভিনয়ের ধারা কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না। ফলে, থিয়েটার তখন শহরের কাপ্তেন ধনীদের বাগানবাড়ির বিলাসিতায় পর্যবসিত হয়ে পড়েছিল।

এই অন্ধকার যুগের মধ্যেই সৌখীন মঞ্চে একদিন শোনা গেল এক অপ্রত্যাশিত কণ্ঠস্বর, আমরা দেখতে পেলাম এক প্রিয়দর্শন ও শিক্ষিত নটকে। তিনি একটি কলেজের ইংরেজির খ্যাতিমান অধ্যাপক এবং এক সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে। ইনিই শিশিরকুমার ভাদুড়ী, এম. এ—মেট্রোপলিটন কলেজের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। ধ্রুবতারকার মত তাঁর সেই অভ্যুদয় সেদিন সত্যই বাংলা রঙ্গমঞ্চে যুগান্তরের বার্তা বহন করে এনেছিল—যেমন একদিন মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যের আবির্ভাব বাংলা কাব্যসাহিত্যে যুগান্তরের বার্তা বহন করে ছিল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকের বিংবা ১৯২১-এর গোড়ার দিকের কথা। তাঁর রঙ্গমঞ্চে 'ওল্ড ক্লাব' নামে এক শৌখিন সম্প্রদায় করলেন 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকে অভিনয়ের অনুষ্ঠান এবং সেই আসরেই বাঙালি দর্শক শিশিরকুমারকে সর্বপ্রথম দেখতে পেলো 'ভীম' ও 'বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ'-এর ভূমিকায়। শুধু অভিনয় নয়, নাট্যানুষ্ঠানের কৃতিত্ব সকলকে করলে বিস্মিত, পুলকিত। বাংলা রঙ্গমঞ্চে সেই বিস্ময়কর এবং অভাবনীয় অভিনয় ও প্রয়োগনৈপুণ্য সঙ্গে সঙ্গে যেন এক নূতন যুগের ঘোষণা করলো। শিক্ষিত বাঙালি দর্শক তার নূতন নটগুরুকে বরণ করে নিলো এই বলে: "হে অসাধারণ শিল্পী, হে মোহনীয় রূপদক্ষ, বাংলা সাধারণ রঙ্গালয় আজ যে তোমার জন্যই অপেক্ষা করছে। তুমি এগিয়ে এসো, অন্ধকারে জ্বালাও আলোকবর্তিকা।"

এই ঘটনার দু'তিনমাস পরেই আলফ্রেড থিয়েটারে পেশাদার অভিনেতা-রূপে আলমগীরের ভূমিকায় শিশিরকুমার প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন। এই থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ছিলেন পার্শী ধনকুবের ম্যাডান সাহেব। পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদকে দিয়ে শিশিরকুমার এই নাটকখানি লিখিয়েছিলেন এবং যতদূর জানি, এই নাটকের ঘষামাজায় শিশিরকুমারের হাত ছিল অনেকখানি। এমন কি, নাটকখানির নামকরণও তিনিই করেছিলেন। পরবর্তীকালে যোগেশ চৌধুরী প্রমুখ নাট্যকারদের দিয়ে তিনি যখনই কোনো নাটক লিখিয়ে মঞ্চস্থ করেছেন তখনো সেসব নাটকের পাণ্ডুলিপির সংশোধনে শিশিরপ্রতিভা অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। আজো ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশিরকুমার কিভাবে সমগ্র বাংলা নাট্যমঞ্চকে জয় করে ফেলেছেন। দিনের পর দিন পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠতো দর্শকদের

বিস্মিত আনন্দ কোলাহলে। এই এক ভূমিকার দ্বারাই শিশিরকুমার বাংলা পুরাতন অভিনয়ের ধারাকে প্রবাহিত করলেন নতুন খাতের দিকে। রঙ্গমঞ্চ আবার ঝলমল করে উঠলো নতুন প্রাণস্পন্দনে, নতুন আদর্শে।

কিন্তু শিশিরকুমারের নটজীবনের প্রকৃত আরম্ভ এইখান থেকেই নয়। বিংশশতকের প্রথম দশকে আরো শত শত ছাত্রের মতই শিশিরকুমার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়তে এসেছিলেন। তখনই ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের বহু ছাত্র-সদস্যের সঙ্গেই তিনি ইংরেজি-বাংলা কবিতা আবৃত্তি করতেন, বাংলা নাটক অভিনয় করতেন, মাঝে মাঝে ইংরেজি নাটকও। কিন্তু তাঁদের সকলে এমন প্রেরণা পেলেন না, যার ফলে তাঁরা আর সব কিছু উপেক্ষা করে বহু-নিন্দিত বাংলার নাট্যশালাকে গৌরব দেবার জন্য লোক-নিন্দাকেও অঙ্গের ভূষণ করে এগিয়ে আসতে পারলেন। যাঁরা ঐ সময়ে ইনষ্টিটিউটে অভিনয় করে শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁরাও নাট্যশালার প্রয়োজনকে স্বীকার করে নিতে পারলেন না। শিশিরকুমারের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো অন্ধকারাচ্ছন্ন মঞ্চের ওপর। তিনি তাঁর প্রতিভা, পাণ্ডিত্য এবং ব্যক্তিত্ব নিয়ে এগিয়ে এলেন, উত্তোলন করলেন রঙ্গমঞ্চের যবনিকা বলিষ্ঠ হাতে—আবার জ্বলে উঠলো পাদপ্রদীপের আলো। অর্থের জন্য নয়, যশের জন্য নয়, আদর্শের আকর্ষণেই শিশিরকুমার সেদিন ঘোষণা করেছিলেন—'I am meant for the stage' —এই আত্মপ্রত্যয় না থাকলে তিনি কখনোই রঙ্গমঞ্চে নতুন যুগের প্রবর্তন করতে পারতেন না। অভিনয়ের ভেতর দিয়ে তিনি দেশে শিক্ষার ও সুরুচির বিস্তার সাধন করতে চেয়েছিলেন। জাতির জীবনে উন্নত নাট্যশালার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই না তিনি নটের বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন।

প্রতিভার আবির্ভাব সকল দেশেই ইতিহাসের নিগূঢ় প্রয়োজনে ঘটে থাকে, কাল তার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখে। শিশিরকুমারের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। সবে ত' তাঁর আবির্ভাব সময়টা ছিল পেশাদার থিয়েটারের অবনতির সময়। নাচ আর গান দিয়ে থিয়েটারের দর্শক আকর্ষণ করার দিন তখন শেষ হয়েছে। বাংলা দেশে তখন সর্বত্রই একটা নতুন যুগের সাড়া পড়ে গেছে। রাজনীতিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দেশের মধ্যে অভূতপূর্ব আবেগ-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন, রবীন্দ্র-প্রতিভা

তখন মধ্যাহ্ন গগনে সহস্র কিরণে উজ্জ্বল আলো বিস্তার করেছে, নজরুল ইসলামের কবিতায় দেখা দিয়েছে বিদ্রোহের নতুন সুর আর কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র এনে দিয়েছেন যুগান্তর—স্বভাবতঃ বাংলার আকাশ-বাতাসে একটা নবজাগরণের, নবীন উন্মাদনার উজ্জ্বল ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রেণেসাঁসের যে চিত্র আমরা একদিন প্রত্যক্ষ করেছিলাম, তারই যেন পুনরাবৃত্তি বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে আমরা দেখতে পেলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় সত্যই তখন কাল সুপ্রসন্ন ছিল, একটি প্রতিভার আবির্ভাবের জন্য পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণভাবেই অনুকূল। এই অনুকূল পরিবেশের মধ্যেই রঙ্গমঞ্চে নূতনের অভ্যুদয় ঘোষণা করে আত্মপ্রকাশ করেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

শিশিরকুমারের সম্মুখে ছিল গিরিশচন্দ্রের আদর্শ। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি গিরিশের নট-প্রতিভা দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠাকল্পে গিরিশচন্দ্রের উদ্যোগ ও সার্থক প্রয়াসের ইতিহাস তাঁর ভালই জানা ছিল। গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে শিশিরকুমারের একটি মন্তব্য বড় সুন্দর। শিশিরকুমার লিখেছেন: "যে সকল গুণ থাকলে একটা নাট্য প্রতিষ্ঠানকে নিজের পায়ে দাঁড় করান যায় সে সকল গুণ গিরিশচন্দ্রের মধ্যে অতিমাত্রায় বর্তমান ছিল। নিজে খুব বড় অভিনেতা না হলে, অভিনয় সম্বন্ধে খানিকটা তত্ত্বজ্ঞান না থাকলে, কেহই অভিনেতৃমণ্ডলীর নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারেন না। গিরিশচন্দ্র অভিনয় কলার Theory ও Practice দুই বিষয়েই তাঁর সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন দক্ষতম। তাঁর বিদ্যার পরিধি ছিল বহুবিস্তৃত। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী কর্মিপুরুষ। নাট্যশালা গঠনের শক্তি যে একমাত্র তাঁরই ছিল এ সম্বন্ধেও তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন। গিরিশচন্দ্র তাই বাংলা থিয়েটারের আদি নায়ক এবং প্রধান পুরুষ। বাংলা থিয়েটারকে তিনি ভালবাসতেন, তার কল্যাণ কামনা করতেন। রঙ্গমঞ্চের উপর ভালবাসা ও রঙ্গভূমি ছিল গিরিশচন্দ্রের নেশা ও পেশা।"

বলাবাহুল্য পূর্বসূরী সম্পর্কে উত্তরসূরীর এই মন্তব্য শিশিরকুমারের নিজের পক্ষেও সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। শিশিরকুমারকে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের নবযুগ প্রবর্তক বলা হয়। এ গৌরব নিঃসন্দেহে তাঁর প্রাপ্য। এই নবযুগ তিনি শুধু তাঁর অতুলনীয় প্রতিভা দিয়ে প্রবর্তন করে যান নি। অভিনয় শিল্পে যে জিনিষটা

আমাদের দেশের থিয়েটারে গিরিশযুগ পর্যন্ত এক রকম অজ্ঞাত এবং অবজ্ঞাত ছিল বললেই হয়, শিশিরকুমারই সর্বপ্রথম বাংলা থিয়েটারে নিয়ে এলেন সেই জিনিস—প্রয়োগনৈপুণ্য বা art of production এবং এই ক্ষেত্রেই প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর বিস্ময়কর কৃতিত্ব। য়ুরোপীয় অভিনয় শিল্পে regisseur বা producer থাকে। তাঁর কাজ শুধু সমগ্র অভিনয়টির সুসম্পূর্ণতার (finish) প্রতি খর দৃষ্টি রাখা। শিশিরকুমারের ঠিক পরবর্তী যুগে মঞ্চে prodcer-এর প্রয়োজনীয়তা বা মূল্য সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না। গিরিশচন্দ্র বাংলা থিয়েটারের গ্যারিক ছিলেন, রেনহার্ট বা ষ্ট্যানিস্লাভিস্কি প্রমুখ প্রযোগাচার্যদের তুল্য কল্পনা তাঁর ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি প্রাক্-শিশিরযুগে অভিনয়ে প্রযোজ্যনৈপুণ্য রূপ শিল্পটি সম্বন্ধে আমাদের দেশের থিয়েটারের দর্শকগণ কোনো দিনই সচেতন ছিলেন না এবং নাট্যকলাকাঠামোতে প্রয়োগশিল্পীর স্থান কত উঁচুতে হতে পারে, এ ধারণাও তাঁদের মধ্যে ছিল না। গিরিশচন্দ্র বড়ো অভিনেতা ছিলেন, কিন্তু বড়ো producer তিনি ছিলেন না। অভিনয়শিল্প আর প্রয়োগ-শিল্প এ দুটিই সত্যিই পৃথক আর্ট, যেমন বড়ো গায়ক হলেই বড়ো সঙ্গীত-শিক্ষক হওয়া যায় না। বাংলা পেশাদারী মঞ্চে এই জিনিষের প্রথম প্রবর্তন করলেন শিশিরকুমার। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, এর মূল প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির অভিনয়ে প্রদর্শিত রবীন্দ্রনাথের প্রয়োগপদ্ধতি শিশিরকুমারকে বিশেষভাবেই প্রভাবান্বিত করেছিল এবং সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে শিশিরকুমারের শিল্পীমন সর্বাগ্রে এই বিষয়টির কথা চিন্তা না করে পারেননি। শিশিরকুমারের প্রযোজিত প্রত্যেকখানি নাটক তিনি তাঁর অনুপম প্রয়োগ-নৈপুণ্যের অভ্রান্ত স্বাক্ষর রেখে গেছেন। সে মঞ্চ-মায়ার কথা সহজে ভুলবার নয়।

অভিনয় প্রতিভা, নাট্যবোধ আর সূক্ষ্ম ও সুচারু প্রয়োগপদ্ধতি—এই তিনটি জিনিষের মনোজ্ঞ সম্মেলনের ফলেই শিশিরকুমার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাবের প্রথম দিন থেকেই যুগান্তর নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। শিশিরকুমারের অভিনয় acting নয়, interpretation এবং সে অভিনয় শুধু বাচনিক ছিল না—ছিল নাটকের চরিত্রের অন্তরের অনুভূতির প্রকাশ। দেশের সর্বাঙ্গ

আর মনের সর্ব শিল্পানুভূতি দিয়ে অভিনয় করতেন বলেই সে অভিনয় সজীব স্বাভাবিক এবং রসাঢ্য হয়ে উঠতো। সেই সঙ্গে বলতে হয় শিশিরকুমারের উদাত্ত সুকণ্ঠের কথা। মঞ্চ জগতে এমন দুর্লভ গুণের সমাবেশ পৃথিবীতে খুব কম অভিনেতার মধ্যেই আজ পর্যন্ত দেখা গিয়েছে। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যেমন ভারতের গৌরব," নাট্যশিল্পের ক্ষেত্রে শিশিরকুমারকে নিয়ে আমরা ঠিক তেমনি গৌরববোধ করি নিশ্চয়ই। শিশিরকুমার প্রধানতঃ রোমান্টিক অভিনেতা এবং প্রয়োগকর্তা হিসেবে তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুগামী। কবির অতি প্রিয়পাত্রও ছিলেন তিনি। বাংলা দেশের রঙ্গালয়ে মার্জিতরুচির অভিনয় দ্বারা এক নতুন যুগ আনার জন্য কলানুরাগীরা চিরকাল শিশির-কুমারের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। শিখিয়ে পড়িয়ে অভিনেতা গিরিশচন্দ্রও তৈরি করেছিলেন, কিন্তু সব জড়িয়ে যে প্রয়োগনৈপুণ্য, অভিনয়ে যে সামগ্রিক ও সূক্ষ্মের দিকে দৃষ্টি, তার প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে সব সময়ে কোনো কিছুতে রত রেখে সজীব করে তোলা, এ সবের দিকে গিরিশচন্দ্র কোনো দিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে পারেননি। শিশিরকুমারের 'পাষাণী', 'সীতা', 'পুণ্ডরীক', প্রভৃতি নাটকের অভিনয় যাঁরা দেখেছেন তাঁরা বুঝতে পারবেন সূক্ষ্মের দিকে দৃষ্টি রাখা, ছোটোখাটো অভিনেতার অভিনয়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বলতে কি বোঝায়। 'আলমগীর' নাটকে তিনি মোগল যুগের পরিবেশ মঞ্চের ওপরে কিভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তা ঐ নাটকের অভিনয়ের দর্শকমাত্রেরই উপলব্ধি করেছেন। এই সব ব্যাপারে তিনি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অবনীন্দ্র-নাথ ঠাকুর প্রভৃতির সাহায্য নিতেন। প্রাক্-শিশির যুগে যে কোন নাটকের কয়েকটি মাত্র ভূমিকার অভিনয় সুন্দর হতো, কিন্তু বাকী ভূমিকাগুলির অভিনয় ভাল হতো না এবং সব জড়িয়ে অভিনয়ের অর্থাৎ প্রয়োগশিল্পের ত্রুটি থেকে যেতো অগত্যা। যে কোনো রসগ্রাহী ও নিরপেক্ষ নাট্যমোদী শিশিরকুমারের প্রয়োগনৈপুণ্যের সঙ্গে তুলনা করলে পূর্ববর্তী যুগকে প্রয়োগশিল্পের দিক দিয়ে আমাদের রঙ্গমঞ্চে অন্ধকার যুগ বলে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন।

বঙ্কিমচন্দ্র একজন বড়ো লেখকমাত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটা যুগ। শিশিরকুমারের সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে যে, তিনি একজন রূপদক্ষ ও প্রতিভাবান অভিনেতা মাত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন যুগপ্রবর্তক

প্রয়োগাচার্য এবং অতুলনীয় নাট্যশিক্ষক। শিক্ষক হিসেবে শিশিরকুমারকে উচ্চতম স্থান দেওয়ার প্রধান কারণ এই যে, তিনিই সর্বপ্রথম অভিনয়ে ছোট ছোট অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয় শিল্পের সম্পূর্ণতার দিকটি বড়ো করে দেখেছিলেন। সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী তারাসুন্দরী একবার বলেছিলেন—গিরিশবাবুর রিহার্স্যাল দেখেছি। ভাদুড়ী মশায়ের রিহার্স্যালও দেখি। অনেক তফাৎ। এমন করে মনের দুয়ার শিশিরবাবু খুলে দিতে পারতেন না। অনেককে বলতে শুনেছি যে, শিশিরকুমারের অভিনয় 'One-man show' মাত্র; কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কতবার রিহার্স্যালের সময় তাঁর ধৈর্যের প্রগাঢ়তা, শিক্ষা দেবার নিপুণ পদ্ধতি দেখে কতই না বিস্মিত হয়েছি। যতক্ষণ না অভিনেয় ভূমিকাটি তাঁর কাছে ত্রুটিহীন বলে মনে হতো, ততক্ষণ দেখেছি তিনি বার বার প্রতি অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে বলিয়ে বলিয়ে পার্ট মুখস্থ করিয়েছেন। তাদের প্রতিটি অঙ্গসঞ্চালন, দৃষ্টির ব্যঞ্জনা, কণ্ঠস্বর ক্ষেপনের ভঙ্গী, এমন কি তাদের সাজসজ্জা পদ্ধতি তিনি মঞ্চের ওপর নিখুঁতভাবে তুলে ধরেন। অভিনয়কে তিনি আবৃত্তিপ্রধান করে তুলতে বলতেন না; বলতেন—তোমরা তোমাদের অন্তরের অনুভূতি দিয়ে তোমাদের ভূমিকাকে জীবন্ত করে তুলবে। এইখানে একটা দৃষ্টান্ত দিই। তখন নব-নাট্যমন্দিরে শরৎচন্দ্রের 'বিজয়া' নাটকে রিহার্স্যাল চলছে। প্রায় দিনই দেখতাম শরৎচন্দ্র বসে বসে শিশিরকুমারের অভিনয় শিক্ষাদানের পদ্ধতি দেখতেন, 'বিজয়া' নাটকে 'পরেশ' চরিত্রটি একটি সামান্য ভৃত্যের ভূমিকা। একটি আনকোরা নতুন ছেলেকে এ ভূমিকাটির জন্য শিশিরকুমার নির্বাচন করেন এবং ঐ সামান্য পার্টটি তাঁর শিক্ষায় মঞ্চে কী অসামান্য রূপ নিয়েছিল তা যাঁরা না দেখেছেন তাঁরা বুঝতে পারবেন না। তাই শরৎচন্দ্র বলতেন, শিশির যত বড়ো না অভিনেতা তার চেয়েও উনি বড়ো নাট্যশিক্ষক। এইভাবেই শিশিরকুমার মৃত্তিকাপিণ্ড থেকে কৃষ্ণনগরের পুতুল তৈরি করতেন। শিশিরকুমারের শিক্ষকতার বৈশিষ্ট্য ছিল এইখানেই। এইভাবেই তাঁর প্রযোজিত প্রত্যেকখানি নাটকের অভিনয়ে সামগ্রিকতা মূর্ত হয়ে উঠতো। এ জিনিস বাংলা মঞ্চে শিশিরকুমারের থাকা ছিল সম্পূর্ণ অকল্পিত ব্যাপার। শিশিরকুমার বড়ো এইজন্য যে, এক তাঁর মধ্যেই শিক্ষা, প্রতিভা, দূরদর্শিতা ও কল্পনার যে বিরল সমাবেশ ছিল যার বলে শিল্পী দ্রষ্টা ও স্রষ্টা পদবাচ্য হয়—

যার বলে শিল্পী যুগধর্মের গতি আগে থেকেই ধরতে পারে।

শিশিরকুমার যখন রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন তখন তাঁর সম্মুখে প্রধান অসুবিধা ছিল পাঁচটি, যথা—(১) শিক্ষিত যুবক অভিনেতার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবার সাহসের বিরলতা, (২) দর্শকবৃন্দের মধ্যে রুচি, শিক্ষা, ভদ্রতা, ও নিয়মানুগত্যের অভাব; (৩) শিক্ষিত সম্প্রদায়ের থিয়েটারে বিরাগ; (৪) নীতিবাগীশদের থিয়েটারের নামে নাসিকা কুঞ্চন করা এবং (৫) থিয়েটারের প্রায় সব ধরণ-ধারণের মধ্যেই একটা গ্রাম্যতাদোষ, সৌকুমার্যের অভাব ও সারারাত্রিব্যাপী নিছক পেশাদারী অভিনয়। মঞ্চের মাধ্যমে শিশিরকুমার যুগপৎ নাট্যাভিনয়ের উৎকর্ষসাধন এবং সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন করতে চেয়েছিলেন এবং সফলকামও হয়েছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম অভিনয়শিল্পে নিয়ে এলেন রুচি, শিক্ষা, সৌষ্ঠবজ্ঞান, সৌকুমার্য, ভদ্রতা, সৌজন্য এবং সুদর্শন নট-নটী। এমন কি যেখানে আগে রঙ্গমঞ্চের বিলাতিধরণের নাম ছিল, সেইখানে শিশিরকুমার খাঁটি বাংলা নাম আমদানী করলেন। বেঠোফেন য়ুরোপীয় সঙ্গীত জগতে সিমফনির প্রবর্তন করে অমর হয়েছেন; ইবসেন য়ুরোপীয় নাট্যজগতে প্রথম সমস্যামূলক নাটক এনেছেন, রঁদ্যা স্থাপত্য জগতে মিষ্টিসিজমের উদ্বোধন করেছেন। শিশিরকুমারের দান এঁদের কারো চেয়ে কম নয়। যুগপ্রবর্তক শিল্পীর দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুতর। কারণ তাঁর আর্ট সম্বন্ধে সহজ জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি সর্বপ্রথম নব নব সত্যের আবিষ্কার করে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। শিশিরকুমারের 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' অভিনীত না হলে 'কর্ণার্জ্জুন' নাটকের অভিনয়ে পাশাখেলার সুন্দর দৃশ্যটির পরিকল্পনার উদ্ভব হতো না, এ কথা মনে করার কারণ আছে। শিশিরকুমারের নাট্যপ্রতিভার পেছনে আছে তিনটি জিনিষের প্রেরণা—moral passion, aesthetic passion আর intellectual passion এবং অভিনেতা ও প্রয়োগশিল্পী হিসেবে তিনি যে অতুলনীয় সাফল্য অর্জন করেছিলেন তার কারণ "Art in any form was to him a function of life, and as a creator, in his productions, he employed the shaping hand of the artist upon the raw material of experience" পরবর্তী যুগ বুঝবে যে, একজন শিল্পীর মধ্যে নাট্যপ্রতিভা, ব্যক্তিত্ব, অসামান্য অধ্যবসায়, কল্পনার পরিসর, প্রয়োগ শিল্পের সহজজ্ঞান, সুদর্শন আকৃতি ও উদাত্ত সুকণ্ঠের এমন

আশ্চর্য যোগাযোগ যে কোনো দেশের রঙ্গালয়ের ইতিহাসেই বিরল।

পরিশেষে থিয়েটারকে শিশিরকুমার কী দৃষ্টিতে দেখতেন, সেই কথার উল্লেখ করব। 'আলমগীর' নাটকের ত্রিশবৎসর অভিনয় উপলক্ষে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গম মঞ্চে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার মধ্যে শিশিরকুমার বলেছিলেন বাংলার নাট্যশালা এখনও সর্বাঙ্গীণ উন্নতি লাভ করেনি। জগতে শ্রেষ্ঠ জাতিদের নাট্যশালার সঙ্গে হয়তো আমাদের রঙ্গমঞ্চ এখনো অনেক বিষয়ে তুলনীয় নয়। কিন্তু জাতির পরিচয় তার রঙ্গমঞ্চে, সুতরাং জগতের বড়ো জাতি বলে পরিচিত হতে হলে উন্নত নাট্যশালার প্রয়োজন। নাট্যশালাকে উন্নত করতে হলে সর্বাগ্রে মনের ভিতর থেকে যে অনাদরের ভাব আছে তা দূর করা দরকার। নাট্যশালা জাতীয় কৃষ্টির ধারক ও বাহক। এই নাট্যমঞ্চে এসে সকল কলা মিলিত হয়। নৃত্য গীত, অভিনয়, সাহিত্য, ইতিহাস, নাট্য, সকলেরই বিকাশ এইখানে। সর্বজাতির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা নাট্যকার। সাহিত্যের মধ্যমান নাটক। অভিনয় ব্যতিরেকে নাটক সম্পূর্ণ হয় না। অতএব নাট্যশালার উৎকর্ষ আমাদের জাতীয় প্রয়োজন।" ভাবিকালে শিশির-কুমারের ন্যায় আর কেউ এসে যখন রঙ্গমঞ্চের যবনিকা আবার উত্তোলন করবেন, তখন তিনি যেন নাট্যাচার্যের এই মূল্যবান উক্তিটি স্মরণ করেন।

প্রসঙ্গত আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে হয়, বিদগ্ধ অধ্যাপক শিশির-কুমার ভাদুড়ী এম.এ. যেদিন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে একটা আদর্শ নিয়ে যোগদান করলেন, সেদিন থেকেই দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে রঙ্গালয়ের যোগা-যোগ সহজ হয়ে উঠল, নিবিড় হয়ে উঠল, দেশের মনীষীরা থিয়েটারের প্রতি আগে যেমন বিরূপ ছিলেন, এখন তাঁরা তেমনি হয়ে উঠলেন সহানুভূতি-সম্পন্ন। অভিনেতার গুণগৌরবে তাঁরাও ক্রমে গর্ব অনুভব করতে শিখলেন। নাট্যামোদী দর্শন মানসের এই পরিবর্তন এনে দিয়েছেন শিশিরকুমার এবং শিশিরযুগের সাধারণ নাট্যশালার ইতিহাসে এটা বিশেষভাবে মনে রাখবার মতন একটা জিনিস। এরই একটা অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া গেল তাঁর নট জীবনের অতি অল্পদিনের মধ্যেই যখন হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের ছাত্রগণ তাঁকে একটি সভায় সম্বর্ধিত করলেন। এটা হলো ১৩৩৩ সনের কথা! তখন নাট্যমন্দিরে ক্ষিরোদপ্রসাদের 'নর নারায়ণ' নাটকের অভিনয় চলছে। 'সীতা' নাটকের মতো এই নাটকের অভিনয় ও প্রযোজনায় শিশিরকুমার

আবার নতুন বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। এই নাটকে তিনি 'কর্ণ'-চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে অদ্ভুত অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। ঠিক সেই সময়ে কলকাতার হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলের ছাত্রবৃন্দ তাঁকে সম্বর্ধনা করেন ও একটি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। শিশিরকুমারের নটজীবনে এই হলো প্রথম সম্বর্ধনা। সেইকারণে ঘটনাটি এখানে উল্লিখিত হলে। উচ্চ শিক্ষিত ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক সাধারণ রঙ্গমঞ্চের একজন অভিনেতার সম্বর্ধনা এদেশে এই প্রথম।

সেদিন ছিল ৮ই মাঘ। এই সভার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন বাংলা সাহিত্যের 'বীরবল' প্রমথ চৌধুরী, তখন তিনি 'সবুজপত্রের' সম্পাদক। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নটকুলের পিতামহ অমৃতলাল বসু, ঐতিহাসিক রখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায় প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট মনীষী; এছাড়া বহু অভিনেতা ও শিল্পীরও সমাবেশ হয়েছিল। সভার অনুষ্ঠান হয় হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলের লাইব্রেরী হলে! হল ও হলের দুপাশের বারান্দা জনাকীর্ণ হয়ে উঠেছিল। দিলীপকুমারের উদ্বোধনী গানের পর সভাপতির নির্দেশে অভিনন্দন পত্রটি পাঠ করা হয়। সেই শোভন সুন্দর ও সুচিত্রিত অভিনন্দন পত্রটি এই :—

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী

হে নবযুগের শ্রেষ্ঠ নটবীর, বাংলার নাট্যশিল্প সাধন ক্ষেত্রে তুমি তোমার ঐন্দ্রজালিক প্রতিভার মায়াস্পর্শে যে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছ, তাহার বিপুল উচ্ছ্বাস আজ আমাদের রঙ্গমঞ্চে এক অপূর্ব বিপ্লবের সূচনা করিয়াছে।

ওগো রূপদক্ষ! তোমার প্রদীপ্ত প্রতিভার উজ্জ্বল প্রভায় বাঙলার কলা সরস্বতী এক অভিনব মূর্তিতে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছেন। তোমার সেই দিব্য প্রতিভার যথাযোগ্য আদর ও সম্মান করিবার সুযোগলাভে আমরা ধন্য।

ওগো নবীন! তোমার সবুজ প্রাণে শক্তিরসের অজস্র ধারা গতির উল্লাসে অতীতের সকল বাধা লঙ্ঘন করিয়া বাঙলার নাট্যক্ষেত্র শ্যামল শোভায় পূর্ণ করিয়াছে। পুরাতনের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া, হেনু তনের সারথি, সেই

সংগ্রামকে সকল অপমান ও লাঞ্ছনা সহিয়া একাকী সত্যের মহিমায় দাঁড়াইয়া থাকিবার সাহস ও গৌরব তোমারই।

নাট্যকলার স্রোতোধারাকে উজান বহাইয়া দিবার জন্য তুমি যে শঙ্খধ্বনি করিয়াছিলে তাহার আহ্বানে বাংলার তরুণ প্রাণ আজ সাড়া দিয়াছে—ইহাই তোমার যাত্রাপথের সকল দুঃখ, সকল বেদনার পরম সুখ ও সান্ত্বনা।

হে বরেণ্য, তোমার সাধনা জয়যুক্ত হউক। তুমি আমাদের শ্রদ্ধার অঞ্জলি গ্রহণ কর।

হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলের ছাত্রবৃন্দ
সন ১৩৩৩, ৮ই মাঘ

এই অভিনন্দন পত্রের উত্তরে শিশিরকুমার একটি সুদীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি নট, নাট্যকার, রঙ্গমঞ্চ, অভিনয় এবং নাট্যশালার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছিলেন। প্রথমেই তিনি বলেছিলেন—অভিনেতা হিসাবে আমি কোনদিনই ব্যক্তিগত সম্মান গ্রহণে সম্মত হইনি। আজকের এই অভিনন্দন পাবার মতো যোগ্যতা ও উপযুক্ত সময় আমার হয়েছে কি না সে বিষয়েও আমি কৃতনিশ্চয় নই, তথাপি আজকের এই অভিনন্দন গ্রহণে আমি অস্বীকৃত হতে পরিনি তার কারণ এ সম্মান আসছে এমন একটি বিশেষ দলের কাছ থেকে যাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিতেরা যে অভিনেতাদের সঙ্গে আলাপ পর্যন্ত করতে ঘৃণা বোধ করতেন, তাঁরাই আজ আমার মতো একজন নাট্য ব্যবসায়ীকে সমাদর করতে চেয়েছেন শুনে আমি অভিনেতাদের 'জাতে' উঠবার সুযোগকে অবহেলা করতে পারিনি।" ভাষণের শেষে শিশিরকুমার অভিনন্দন পত্রের একটি কথার প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—"এই নতুন ও পুরাতনের মধ্যে পার্থক্য কিছুই নেই, যা কালকের নতুন ছিল আজ তাই পুরাতন হয়েছে আর আজকের যা নতুন কাল তা পুরাতন হয়ে পড়বে। পুরাতনের সঙ্গে নতুনের কোন বিরোধ নেই। পুরাতন ছিল বলেই আজ নতুন সম্ভব হয়েছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্ধেন্দুশেখর প্রভৃতির ন্যায় শক্তিশালী অভিনেতা যে এ যুগে কেউ জন্মগ্রহণ করেননি, একথা আমি মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করি। এ দেশের রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যকলা তাঁদের কাছে চিরদিন ঋণী থাকবে। আর একটা কথা বলব। অভিনয় রীতি এযুগের দান

নয়, এ যুগের বিশেষ দান হলো প্রয়োগরীতি এবং আজকের রঙ্গমঞ্চে যতটুকু পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তা হলো এই প্রয়োগরীতির প্রত্যক্ষ ফল !"

শিশিরকুমারের বক্তৃতার পর উঠলেন নটবৃদ্ধ অমৃতলাল। তিনি বলেছিলেন : "শিশিরকুমারের এই সম্বর্ধনায় আমি নিজেকে আজ গৌরবান্বিত বোধ করলাম। এ যুগের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতিক্রম করা যেমন দুঃসাধ্য, তেমনি অভিনয়ে শিশিরকুমারের প্রভাব অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। ইনি সত্যকার একটি প্রতিভা। গিরিশ, অর্ধেন্দু, অমৃতলাল মিত্র এঁরা আজ কেউ বেঁচে নেই। এঁদের অন্তর্ধানের পর বাংলার রঙ্গালয়ের যে দুরবস্থা এসেছিল তা দেখে আমি নাট্যশালার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একান্ত হতাশ হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু আজ শিশিরকুমার ভাদুড়ীর ন্যায় প্রতিভাশালী নটের আবির্ভাবে আমি আবার আশান্বিত হয়ে উঠেছি।"

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"সত্যেন দত্তের অনুরোধে এ্যালফ্রেড থিয়েটারে 'আলমগীর' নাটকের অভিনয় দেখতে গিয়ে আমি প্রথম শিশিরকুমারকে দেখি। দেখলাম, তাঁর অভিনয় থিয়েটারের প্রচলিত ধারাকে একেবারে পেছনে ফেলে এসেছে—এতো অভিনয় নয়, জীবনের নূতন শিল্পভাষ্য। দেখলাম, যার জন্যে এতদিন অপেক্ষা করেছিলাম, সেই মানুষ, সেই প্রতিভা—রঙ্গমঞ্চের সেই নবযুগ প্রবর্তক এসে গেছেন।"

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুধীর চক্রবর্তী

১

রবীন্দ্রসংগীতের যে কোন সার্থক আসরে অনিবার্যভাবে দিনেন্দ্রনাথকে মনে পড়ে, মনে পড়ে বর্ষণমুখর প্রান্তরে মেঘের ছায়াসঞ্চারের মতোই। দিনেন্দ্রনাথ গীতকার ছিলেন না কিন্তু অধিকাংশ রবীন্দ্রসংগীতের অন্তরে তাঁর প্রাণের স্বাক্ষর। রবীন্দ্রনাথের রচিত গান তিনিই কণ্ঠে ধারণ করতেন, পরে সেই গান অন্যান্যদের শেখাতেন এবং স্বরলিপি রচনা ক'রে সাধারণ্যে প্রচার করতেন। তিনি না থাকলে অনেক রবীন্দ্রসংগীত আজ বিলুপ্ত হ'ত। কেননা বহুসৃজনক্ষম রবীন্দ্রপ্রতিভা ছিল বিস্মৃতিবিলাসী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুভবের অজস্র সম্ভার ছড়িয়ে দিয়েছেন আর দিনেন্দ্রনাথ তাকে ধারণ ক'রে, নিয়মিত ক'রে সৌন্দর্যের মধ্যে প্রসারিত করেছেন। সূর্যের শতকান্তি সুধা পান ক'রে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ সূর্যমুখী। রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই ছিল তাঁর জীবনসাধনা। রবীন্দ্রসংগীতে নিলীন রেখেছিলেন আত্মকণ্ঠ। বোধহয় অনুভবের সমস্ত বেদনা-আনন্দ-দাহ, কল্পনার সমস্ত শিখা, স্বপ্নের সমস্ত পুষ্পবিকাশ আবিষ্কার করেছিলেন তিনি জীবনব্যাপী রবীন্দ্রসংগীত সাধনায়। তাই তার মধ্যে আত্মমগ্ন থেকে আত্মবিস্মৃত হতে পেরেছিলেন। শিল্পের সম্পন্ন প্রাঙ্গনে আত্মপ্রকাশের অস্থিরতা বোধ করেননি।

মনে হয়, রবীন্দ্রশিল্পের অজস্রতার পাশে প্রয়োজনীয় ছিল এই শান্ত নীরবতা। রবীন্দ্রসংগীত যে মানুষের জীবনব্যাপী সাধনা ও সমৃদ্ধি হতে পারে তাঁর সুন্দর প্রমাণ দিনেন্দ্রনাথ। ঠাকুরবাড়ী ও শান্তিনিকেতনের শিল্পপরিবেশে থেকেও সৃজনের তন্ময়তীর্থে তিনি পরিপূর্ণ আসন গ্রহন করেননি তবু তাঁর নাম অম্লান, শুধু ধারণ করেছিলেন সংগীতকে, প্রচার করেছিলেন সেই সংগীতকে। আর তার মধ্যে থেকেই বিকীর্ণ তাঁর শিল্পীমন, তন্ময় জীবনসাধনা এবং অনুভবের কল্পিত স্বাক্ষর। রবীন্দ্রনাথ দিনেন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখেছিলেন : 'চিরজীবন সে অন্যকেই প্রকাশ করেছে, নিজেকে করেনি।...আমার সৃষ্টিকে

নিয়েই সে আপনার সৃষ্টির আনন্দকে সম্পূর্ণ করেছিল। আজ স্পষ্টই অনুভব করছি, তার স্বকীয় রচনাচর্চার বাধাই ছিলেন আমি। কিন্তু তাতে আনন্দ যে ক্ষুণ্ণ হয়নি, সে কথা তার অক্লান্ত অধ্যবসায় থেকেই বোঝা যায়।' রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যে যে সত্য আছে সেই সত্যই দিনেন্দ্রনাথের জীবনের অবলম্বন। অর্থাৎ মহৎ শিল্পের অনুভব-আনন্দেই অনেক সময় শিল্পীর আত্মতৃপ্তি। মহৎ কিছুর মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়া, ভালবেসে মিলিয়ে দেওয়াও জীবনের প্রাণবহ্নি হ'তে পারে। দিনেন্দ্রনাথ সেই বিরল শিল্পীদের অন্যতম। রজনীগন্ধার অগোচর সৌরভের মত তিনি তৃপ্ত এবং কৃতার্থ।

২

দিনেন্দ্রনাথ স্বল্পায়ু (১২৮৯-১৩৪২) ছিলেন। মাত্র তিপান্ন বৎসরের ক্ষুদ্র পরিসরে তাঁর জীবনসাধনা আমাদের নিত্যবেদনার কারণ। বলা বাহুল্য দিনেন্দ্রনাথ নিজের সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নি। কিন্তু তিনি তাঁর আত্মীয়-বন্ধুদের মনে যে অম্লান স্মৃতিচিহ্নরূপে জেগে আছেন তারই উচ্ছ্বসিত স্বীকারোক্তি অনেকে লিপিবদ্ধ করেছেন।[১] দিনেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনায় তাঁর একটি ব্যক্তিপরিচয় আমাদের প্রয়োজন হবে।

দিনেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র, অর্থাৎ দ্বিপেন্দ্রনাথের পুত্র। এই তিন পুরুষে চরিত্রগত একটি সাযুজ্যসূত্র ছিল। তিনজনই ছিলেন উচ্চস্তরের প্রতিভাশালী অথচ বেহিসাবী। বিশেষত দ্বিজেন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথ অত্যন্ত আত্মভোলা স্বভাবের ছিলেন। আত্মপ্রকাশ-কুণ্ঠ সরল উদার হৃদয়ই ছিল উভয়ের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। দিনেন্দ্রনাথের অন্যান্য কুশলতার মধ্যে অন্যতম ছিল অভিনয় ক্ষমতা এবং আবৃত্তি শিক্ষা-

---

১ দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর 'দিনেন্দ্র স্মরণে' পর্যায়ে স্মৃতিচিত্র লিখেছিলেন অনেকে। তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমিতা সেন, তেজেশচন্দ্র সেন, প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, অনাদিকুমার দস্তিদার, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, অসিতকুমার হালদার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের রচনাগুলি সম্প্রতি 'দিনেন্দ্র-রচনাবলী-'র পরিশিষ্টে সংযোজিত। রচনাগুলিতে দিনেন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের সুন্দর আলেখ্য ফুটে উঠেছে।

দানের মৌলিকতা। শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকগণ তাঁর সংগীত-অভিনয়-আবৃত্তির ত্রিমুখী স্রোতে সর্বদা নিমগ্ন থাকতেন। যে কোন উৎসব অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন অপরিহার্য নেতা। উল্লাসে আনন্দে, চড়ুইভাতিতে, মেলায় তিনি ছিলেন সর্বজনপ্রিয় 'দিনুদা'।

সকলকে খাওয়াতে ভালবাসতেন। দান করতেন দুহাতে। তিনি ছিলেন কার্পণ্যের মূর্তিমান প্রতিবাদ। সর্বত্রই ছিল তাঁর উচ্ছ্বসিত উদারতা। অনিঃশেষ সংগীত সামর্থ্য, অনন্ত আনন্দরসপিপাসা এবং সুবিশাল শরীর এই তিন বৈশিষ্ট্যে তিনি সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। প্রমথনাথ বিশী দিনেন্দ্রনাথ সম্পর্কে এর আশ্চর্য বর্ণনা দিয়েছেন: 'সাদা-পোষাক-পরা এই বিরাট পুরুষকে দূরে আসিতে দেখিলে মনে হইত, সাদা-পাল-তোলা একখানা বিরাট বজরা স্রোতের অনুকূলে দ্রুত চলিয়া আসিতেছে।'২ সংগীতস্রোতে টলমল দিনেন্দ্রনাথের ভাবমূর্তিটি এই বর্ণনায় সুন্দর ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দিনেন্দ্রনাথের বৈপরীত্য লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ শুভ্র-সংযত স্বরস্বশ স্বভাবের শিল্পী, দিনেন্দ্রনাথ অবারিত অসংযমী পরবশ। একজনের আনন্দ শিল্পের সৃজনে, আরেকজনের আনন্দ শিল্পের প্রচারে। একজন বিশ্বশ্রদ্ধেয়, আরেকজন আশ্রমিকদের কাছের মানুষ 'দিনুদা'। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুদর্শীপ্রাজ্ঞের মহিমায় উদাত্তগম্ভীর, দিনেন্দ্রনাথ ছিলেন শিশুর মত সরল ও অকারণ উচ্ছ্বসিত। এই দুই বিরোধী চরিত্রের সম্মিলন বিস্ময়কর। কিন্তু দুটি বিরোধী শক্তির সমন্বয়েই মহৎ শিল্পের অভিব্যক্তি, এবং সেই কারণেই সম্ভবত রবীন্দ্রসংগীতের সিদ্ধি। দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ এবং দিনেন্দ্রনাথের এই সংযোগ দিনেন্দ্রনাথের জীবিতকালেই ছিন্ন হয়। আমাদের অজ্ঞাত কোন কারণে দিনেন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষদিনে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘকালের সংস্রবসূত্র ছিন্ন করে কলকাতায় চলে আসেন। দিনেন্দ্র-নাথের এইসব ব্যবহারিক জীবনের চেয়েও প্রধান আলোচ্য তাঁর আভ্যন্তরীণ সামর্থ্যের পরিচয়। শিল্পী হিসাবে অসাধারণ ছিল তাঁর ধারণশক্তি। রবীন্দ্র-সংগীত একবার শুনে শিখে নিতেন। পরে মূল সুরের অবিকৃত স্বরলিপি তৈরী করতেন। এই অসাধারণ শ্রুতিশক্তির কথা আর কারোর সম্পর্কে শুনিনি। এ

---

২ রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন। পত্রাঙ্ক ৫৬

সম্বন্ধে অনেক বিদেশী দিনেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন তা উল্লেখযোগ্য :
Oral tradition alone ensures the survival of songs. Tagore knows his memory to be poor, and sometimes he even wishes to forget previous works so as to be free to create fresh ones: therefore when he had composed a new song, he used to sing it to his nephew Dinendranath, thanks to whose excellent memory the song was saved from oblivion'.[৩]

এই ধারণসামর্থ্য তাঁর সাংগীতিক ধারণার পরিচয় দেয়। বাংলা সংগীতে তিনি ছিলেন কৃতবিদ্য। বাউল ভাটিয়ালি গানে তাঁর অনুরাগ ছিল। ভারতীয় ধ্রুবসংগীতে তাঁর চর্চা ছিল। য়ুরোপপ্রবাসে য়ুরোপীয় সংগীতের পাঠও নিয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে শিখেছিলেন হাসির গান। এই সাংগীতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর রসবোধ ও সুকণ্ঠ। এই তিনের সমবায়ে রবীন্দ্রসংগীত তাঁর গলায় শিল্পের পূর্ণতা লাভ করত। দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন : 'আমার কবি প্রকৃতিতে আমি যে গান করেছি, সেই গানের বাহন ছিলেন দিনেন্দ্র। অনেকে এখানে থেকে গেছেন, সেবাও করেছেন, কিন্তু তার রূপ নেই ব'লে ক্রমশঃ তাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন। কিন্তু দিনেন্দ্রের দান এই যে আনন্দের রূপ, এ তো যাবার নয়— যতদিন ছাত্রদের সঙ্গীতে এখানকার শালবন প্রতিধ্বনিত হবে, বর্ষে বর্ষে নানা উপলক্ষ্যে উৎসবের আয়োজন চলবে, ততদিন তাঁর স্মৃতি বিলুপ্ত হ'তে পারবে না, ততদিন তিনি আশ্রমকে অধিগত ক'রে থাকবেন।[৪]

দিনেন্দ্রনাথের অজস্র সম্পদ ছিল কিন্তু আত্মপ্রকাশে ছিল সহজাতকুণ্ঠা। শিল্প-সাহিত্যের রসগ্রহণে তাঁর মন সদাজাগ্রত ছিল! কিন্তু তিনিও শিল্পের আহ্বানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারেন নি। একেবারে অগোচরে আপন

---

৩ Twenty six songs of Rabindranath Tagore : Arnold Bake, Paris 1995

৪ শান্তিনিকেতনের মন্দিরে ৪ঠা শ্রাবণ ১৩৪২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষণ থেকে।

মনে কিছু কবিতা ও গান লিখেছিলেন। সেইসব খিন্নকমল আপন মনো-বেদনার মতই তিনি অন্তরে লালন করতেন। 'বীণ' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রথম জীবনে প্রকাশ করেছিলেন ; পরে সেটিও স্বহস্তে ভস্মীভূত করেছিলেন। আত্মপ্রকাশের এই অসাধারণ কুণ্ঠা অদ্বিতীয়। নিজের সৃজনসামর্থ্য ফুলের গন্ধের মতই তাঁর মর্মবন্দী ছিল। সৌভাগ্যক্রমে, তাঁর মৃত্যুর পর আত্মীয়-বন্ধুরা 'দিনেন্দ্র রচনাবলী' প্রকাশ ক'রে এক নীরব সাধনার ইতিহাস উন্মোচন করেছেন।৫ মোট বিরানব্বুইটি কবিতা ও স্বরলিপিসহ তেরোটি গান এই রচনাবলীর অন্তর্গত। এই সমস্ত কবিতা ও গানে তাঁর আজীবন অবগুণ্ঠিত কবিত্বভাবের পরিচয় পাই। বাংলা দেশের পাঠকের কাছে সেই কবিত্বভাবের অন্তরঙ্গ পরিচয় উদ্‌ঘাটন করার প্রয়োজন বোধ করছি।

প্রথমেই উদ্ধৃতিযোগ্য 'নীরব বীণা' কবিতাটির অংশবিশেষ :

মোর নীরব বীণা কতকালের
কত না অনাদরে
ও সে তোমার সভাগৃহের কোণে
রয়েছে একা পড়ে
* ■ ■
তুমি আপন কোলে লহ তুলে
এ যে তোমার বীণা
দেখ তোমার সুরে মিলিয়ে সুর
এবার বাজে কিনা !
আপনি যবে বাজাতে যাই
বেসুর বেজে ওঠে সদাই
রেখেছি আশা লইবে তায়
তুলিয়া নিজ করে।

নীরববীণা দিনেন্দ্রনাথের জীবনের উপমান। যে বীণা বাইরের বিপুল স্পর্শে আপন মর্মে বেদনামৌন। অথচ এর পাশেই রবীন্দ্রনাথের :

মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি
কোন্ নব চঞ্চল ছন্দে।

---

৫ দিনেন্দ্র রচনাবলী। প্রকাশিকা : কমলাদেবী ঠাকুরাণী। ১৩৪৩

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মম অন্তর কম্পিত আজি
নিখিলের হৃদয়স্পন্দে

পরপর দুটি উদ্ধৃতিতে উভয়ের বৈপরীত্য লক্ষনীয়। রবীন্দ্রনাথের অন্তর বিশ্বস্পন্দনের ছন্দে সর্বদা মুখর,—এ তাঁর কাব্যজীবনের চিরকালের সুর। আর দিনেন্দ্রনাথ বিশ্বস্পন্দনের মধ্যেও মৌনবাণী নীরববীণা। তাই তাঁকে মিশিয়ে দিতে হয় অপরের শিল্পসাধনায়, অপরের সৃজনে খুঁজে নিতে হয় আত্মকণ্ঠ।

দিনেন্দ্রনাথের সমগ্র কবিতা ও গানে কোথাও তাঁর মৌলিক কবিপরিচয় ফুটে ওঠেনি! তাঁর সংকুচিত সাধনায় এমন কোন বিশিষ্টতা ফুটে ওঠেনি যার সাহায্যে তাঁকে নির্দেশিত করা যায়। তাঁর সমস্ত রচনায় রবীন্দ্ররচনার সন্নিপাত প্রত্যক্ষ।

বস্তুত, দিনেন্দ্রনাথ কোনদিনই সচেতনভাবে কাব্যচর্চা করেছেন এমন মনে হয় না। সৃজনের চেয়ে রূপদানেই ছিল তাঁর অধিকতর আগ্রহ। মনের আবেগকে একটি কবিতা রচনায় নিয়োজিত না ক'রে বরং একটি গান গাওয়ায় ব্যয় করতেন। সেইজন্যই শিল্পসৃজনের যে মৌলিক অভীপ্সা অনন্ত আকাশে হৃদয় উন্মিলন—সেই অভিপ্সা তিনি নিবৃত্ত করতেন গান গেয়ে; অর্থাৎ একটি রবীন্দ্রসংগীতকে তার ভাবমূল্যে সুরমূল্যে উন্মোচিত ক'রে। কবিতা রচনা ছিল তাঁর অবসরের খেয়াল মাত্র। সেইজন্যই তাঁর কাব্যচর্চাকে বৃত্তি না ব'লে সত্য অন্বেষণের নামান্তর বলা চলে। এই অন্বেষণে কখনও কখনও একটি পরিপূর্ণবোধ তাঁকে অধিকার করেছে এবং তখনই তিনি একটি কি দুটি ভাল কবিতা বা কবিতাংশ রচনা করতে পেরেছেন। যেমন:

এ সংসারে সবার সাথে অনেক কথা কই
একটি কথা আছে তোমার তরে।
নয়নপাতে নীরবে কত অশ্রুবোঝা বই
তোমার লাগি একটি ফোঁটা ঝরে। (সার্থক দান)

আমার গান আধারে প্রাণে
দুয়ার খুলি ফিরে,
পথ না পেয়ে নয়ন বেয়ে
ঝরিছে আঁখিনীরে! (বর্ষার গান)

এই দুটি উদাহরণেই রবীন্দ্রনাথের ভাষার লাবণ্য ও সুচিতা অনিবার্যভাবে মনে পড়ে কিন্তু তবু দিনেন্দ্রনাথের মন এবং বাণীকে খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর কবিতা ভাষা, ভাব ও আঙ্গিকে কখনই রবীন্দ্রনাথকে উত্তীর্ণ হ'তে পারেনি তবুও এই কবিতা পড়তে ভাল লাগে। তার কারণ অন্ধ অনুকরণ নয় কবিতাগুলি, বরং শুদ্ধ ভালবাসার স্বাক্ষর।

দিনেন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতা গানের আঙ্গিকে লেখা অর্থাৎ চারটি স্তবকে ভাগ করা। সে সব কবিতায় সুর বসানোর অবকাশ আছে। তিনি নিজে অনেকগুলি কবিতার শিরোদেশে রাগ তাল নির্দেশ দিয়েছেন উনিশ শতকের বাঙালী কবিদের মত। কবিতাগুলি সংগীতধর্মি সন্দেহ নেই। সংগীতি-কবিতার লক্ষণ যদি হয় আত্মবেদনার নিভৃত সুরালাপ তবে দিনেন্দ্রনাথ সার্থক কবি। তার প্রমাণ :

নয়ন ফিরে দরশ মাগি
বাহু সে শুধু পরশ লাগি
রেখেছে চির আশা
পরাণ চাহে পাত্রে তার
ভরিতে সেই সুরভিসার
অঙ্গ হ'তে ঝরে। (বাসনা)

একটি গানে কইব প্রাণের কথা
পারিনাগো তাও যে পারিনা !
একটি সুরে বাজবে মনের ব্যথা
পারিনাগো তাও যে পারিনা ! (নিরাশের আশা)

কবির এই একান্তবানী শুনে বোঝা যায় তাঁর একলব্যের সাধনা তাঁকে স্বকীয়তার পথে অগ্রসর করেছিল।

দিনেন্দ্রনাথ অনেকগুলি সনেট রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে একটি সনেট অন্তত বাংলা সনেটের রাজ্যে প্রবেশাধিকার দাবী করে। সেইটির উদ্ধৃতি কবিতা সংকলনকারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে আশা সম্পূর্ণ করি।

অপরের খাতায় স্বাক্ষর দানের সঙ্গে উক্ত খণ্ডকবিতাটি একদা রচনা করেছিলেন দিনেন্দ্রনাথ।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আত্মদান

মধ্যাহ্নে ঘিরিয়া ছিল খর রবি-দাহ,
আঁধারিয়া ক্ষণপরে এল বারিবাহ।
সরস অমৃতধারা বক্ষমাঝে চাপি,
রসের আবেশখানি রেখেছিল কাঁপি
আচম্বিতে কোথা হ'তে অহঙ্কারে ফুলি
এল বায়ু বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ অসি তুলি।
অমনি উদার বক্ষ মেলি দিয়া তার
বরষিল তপ্তবুকে অমৃতের ধার।

তেমনি যখন রসে ভরে যায় প্রাণ
জানিনা কেমনে তারে করা যায় দান!
হেনকালে আসে যদি আবেগ-ঝটিকা
হানে প্রাণে বেদনার বিদ্যুতের শিখা,
অমনি সে বিগলিত প্রেমরসধারা
অবিরাম বহে, মোরে করে আত্মহারা।

এই চারটি পংক্তিতে তাঁর শিল্পজীবনের সমস্ত বিশিষ্টতা ধরা পড়েছে সন্দেহ নেই। তাঁর ব্যক্তিজীবনের সমস্ত সংকুচিত বেদনাদাহ গান গাইবার সময় অনর্গলিত হয়ে পড়ত। সুরের তন্ময় সুধাস্রোতে নির্বানী অনুভূতি ভাষা পেত।

বাণী যার নাহি পায় কূল
সুর সেথা করে তার খেলা,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলে সে দোদুল
সকল বাঁধন করি হেলা।

এই জন্যই কাব্যরচনার সমান্তরালে দিনেন্দ্রনাথকে সংগীতরচনাও করতে হয়েছে। সম্ভবত কবিতায় তাঁর সমস্ত হৃদয়ভাবের উন্মোচন হয়নি। তেরোটি গীতরচনার মাধ্যমে তিনি নিজেকে যেন অনেক বেশি অভিব্যক্ত করেছেন মনে

৬। ভূমিকা। দিনেন্দ্র রচনাবলী

হয়। তাঁর রচিত সংগীত আলোচনার প্রারম্ভে একটি কথা বলা দরকার। সংগীতের সম্পূর্ণ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়; কারণ তার সুরের দিকটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত থাকছে এই লিখিত প্রবন্ধে। সংগীত সব সময়েই শ্রুতিবেদ্য। তবু তাঁর তেরোটি সংগীতের আলোচনা করা দরকার।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠে আমার গান শুনেছি, কিন্তু কোনদিন তার নিজের গান শুনিনি। কখনো কখনো কোন কবিতায় তাকে সুর বসাতে অনুরোধ করেছি, কথাটাকে একেবারেই অসাধ্য ব'লে সে উড়িয়ে দিয়েছে।'৬ সৌভাগ্যক্রমে দিনেন্দ্ররচনাবলীতে তেরোটি গান আছে এবং সেগুলির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের বিরোধী ঘটনা আছে। অর্থাৎ অন্তত একটি গান যে কবিতার সাংগীতিক রূপান্তর, তার অভ্রান্ত প্রমাণ রয়েছে। মূল কবিতাটি 'বীণ' কাব্যগ্রন্থে 'সঙ্কোচ' নামে গ্রথিত। পরে এটিকে তিনি সুরে মণ্ডিত করেন। দিনেন্দ্রনাথ তাঁর তেরোটি গানেরই স্বরলিপি ক'রে গেছেন। বেহাগ, টোড়ি, মিশ্রবাহার, পরজ—এইসব রাগরাগিনীর ব্যবহার হয়েছে গানগুলিতে। রবীন্দ্রনাথের মত রাগমিশ্রণও ঘটিয়েছেন কখনও কখনও।

দিনেন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত জীবনের মর্মবাণী একটি গানে কেমন সুন্দরভাবে বলে গেছেন:

বলা যদি নাহি হয় শেষ
তাহে মোর নাহি দুখলেশ।
খেলেছি ধরার বুকে
এই স্মৃতি বহি সুখে,
ভাসার তরণী, লখি' সেই অজানার দেশ।
সুর যদি নাহি পাই খুঁজি,
আমার বেদনা লহ বুঝি।

দিনেন্দ্রনাথ যদি শুধু একজন বড় গায়ক হ'তেন তবে তাঁর সম্পর্কে খুব বেশি আলোচনা করা সম্ভব হত না। তাঁর মৃত্যুর পর, কণ্ঠস্বরের সমাপ্তি তাঁকে স্মৃতিরাজ্যে নির্বাসিত রাখত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, দিনেন্দ্রনাথ শিল্পের ধারক ছিলেন এবং ক্ষীণভাবে হ'লেও শিল্পসাধনার পরিচয় রেখে গেছেন। 'Art is not a pleasure trip, it is battle'—শিল্পসমালোচকের এই মন্তব্যটি দিনেন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সংগীতরক্ষণ ও প্রচারের সংগ্রামে সত্য হয়ে উঠেছে।

দিনেন্দ্রনাথ যে শুধু রবীন্দ্রসংগীতের গায়ক এবং শিক্ষক হিসাবেই তাঁর কর্তব্য সমাপ্ত করেন নি তার প্রমাণ তাঁর লেখা দুটি প্রবন্ধ। 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' এবং 'সংগীত সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ' প্রবন্ধ দুটি বিশেষ আলোচনার দাবী রাখে। তার কারণ একজন শিল্পীর বোধ এবং অভিজ্ঞতা প্রবন্ধ দুটিতে সংযুক্ত, তাত্ত্বিক এবং পণ্ডিতের শাস্ত্রব্যাখ্যান নয়। অর্থাৎ প্রবন্ধদুটিতে আছে রসিকের স্বীকারোক্তি, মরমীর অনুভব।

মনে রাখতে হবে, দিনেন্দ্রনাথ যখন 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' প্রবন্ধটি রচনা করেন তখনও পর্যন্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়নি। রবীন্দ্রসংগীত, দিনেন্দ্রনাথের মতে, কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত। রবীন্দ্রনাথের গীতরচনার প্রথম অধ্যায়ে তিনি লক্ষ্য করেছেন 'বাইরের প্রভাব এবং Tradition এর ধারা যুগপৎ'। 'মাঝে মাঝে স্বকীয় প্রতিভার রশ্মি Tradition এবং ওস্তাদীর গবাক্ষদ্বারের ভিতর দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মেরেছিল, কিন্তু আবরণ বিদীর্ণ ক'রে নিজস্ব প্রতিভার দীপ্তি তখনও উদ্ভাসিত হয়নি'।

গীত রচনার দ্বিতীয় অধ্যায়ে, দিনেন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন, 'Classical সুরগুলির বিশিষ্ট রস আত্মসাৎ ক'রে তিনি গীতিনাট্য রচনায় সিদ্ধহস্ত হয়েছেন। এই সময় আরও কতকগুলি গান রচিত হয়, যার Lyrical beautyর তুলনা নেই।···রবীন্দ্রনাথ এই পর্যায়ের গানগুলিকে Emotional আখ্যা দিয়াছেন। Emotional তো বটেই! Lyric মাত্রই emotional, কিন্তু সে emotion intimate নয়। এ যেন ক্ষণস্থায়ী সুখ দুঃখের দ্বন্দ্বের অতীত কোন এক অক্ষুব্ধ সরসীনীরে বিকশিত শতদল—"তার বাঁধন তো নাই"। এই detachment হোলো Art এর মূলকথা।'

এই অংশের আলোচনায় দিনেন্দ্রনাথের অসাধারণ বিশ্লেষণ এবং নিপুণ ভাষাপ্রয়োগ লক্ষণীয়।

দিনেন্দ্রনাথ আরও লক্ষ্য করেছেন: 'কবির সমস্ত কাব্যজীবনের ধারার মধ্যে দেখতে পাই তিনি আধ্যাত্মজগতের এমন এক স্তরে গিয়ে পৌঁচেছেন, যেখানে তাঁর দৃষ্টি বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎকে অতিক্রম ক'রে শাশ্বত আলোকের আনন্দে উদ্ভাসিত।···এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ human interest। আর একদিকে দেখতে পাই তাঁর প্রকৃতিপ্রীতি।'

রবীন্দ্রনাথের ঋতুসংগীত সম্পর্কে দিনেন্দ্রনাথের বিশ্লেষন : 'প্রত্যেক কিশলয়ের অব্যক্ত কাকলিতে, প্রতি কুসুমের বর্ণগন্ধময় আত্মনিবেদনে, প্রতি ঋতুসমাগম ও অবসানের মিলনবিরহের বেদনায় কবির মন আনন্দে আকুল ও বিরহে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। বাইরের বিরহমিলনের অন্তরালে যে মায়াময় রহস্যলোক রয়েছে, তার অরূপ মাধুর্যের সন্ধান, পাওয়া-না-পাওয়ার অনির্বচনীয় আনন্দের আস্বাদন পেয়ে কবির মন গেয়ে উঠল "ওকি এল, ওকি এল না"।'

দিনেন্দ্রনাথের সংগীতবোধের অসাধারণ প্রকাশ হিসেবেই দীর্ঘ উদ্ধৃতি ব্যবহার করলাম। রবীন্দ্রসংগীতের এমন সপ্রাণ ভাবময় আলোচনা আর হয়নি। দিনেন্দ্রনাথের 'গীত সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ' প্রবন্ধেও অম্লান বোধ দেখা যায় ; তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরিহাস রসিকতা। দুটি উদাহরণ : 'হিন্দীগানে একথা বলে দেবার প্রয়োজন হয় যে—আমি পূরবী গাচ্ছি। সেই পূরবীর বিশেষ ঠাটকে অবলম্বন ক'রে আমার গান গাওয়া হ'ল ; কথার মধ্যে দিনান্তের করুণ মিনতির আভাস মাত্র নেই ব'লে সুর গেয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হয় যে, এটা দিন অবসানে গাওয়া উচিত ; প্রকৃতির বুকের ভিতরকার কান্নার সুর আমি পূরবীতে রূপান্তরিত করেছি। কিন্তু আমি যখন গাই :—

বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে
সন্ধ্যা বায়ে, শ্রান্ত কায়ে, ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে।

তখন সুরটা পূরবী হ'তে বাধ্য, কিন্তু বলবার প্রয়োজন নেই, এবং তাতে শুদ্ধ ধৈবত লাগালেও সৌন্দর্যের লাঘব হয় না।'

'হিন্দীগানে কথা ও সুর মিলে একটা সুসম্বদ্ধ অখণ্ড রূপ গ্রহণ করে না। গাইচি গুরুগম্ভীর রাগিনী—সুহা কানাড়া ; তা'তে কথা বসালুম "বলমা রে চুনরিয়া ম্যয়কো লাল রঙাদে", অর্থাৎ "হে বল্লভ, আমার ওড়নাটা লাল রঙে রাঙিয়ে দাও"। এ চুনারিয়াকে কুরুসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রের মত ক্রমাগত টান মারা চলতে পারে। কিন্তু ঐ সুরই বাঙলা কথায় খাপ খাইয়ে "নাথ হে প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও" গাইবার সময় সে টান সইবে না।'

৪

এখনও মেঘগুণ্ঠিত দিনে দিনেন্দ্রনাথকে মনে পড়ে। গ্রামোফোনে তাঁর গলার আভাস ধরা পড়ে : 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' কিংবা 'আমার পরান

যাহা চায়' গানে। তাঁর আবেগভারাতুর মুক্তকণ্ঠ বক্ষে সামান্তই পাই। ভবিষ্যতে ঐ সামান্ত আয়োজনও আর পাওয়া যাবে না। দিনেন্দ্রনাথের স্বর্ণকণ্ঠ বায়ুস্তরে বিলীন হয়ে যাবে।

দিনেন্দ্রনাথের রচনাবলী দুষ্প্রাপ্য। তাঁর কবিতা ও গান অনালোচিত। তাঁর সংগীত সমালোচনা কোথাও উদ্ধৃত কিংবা পুনর্মুদ্রিত হয়না। তাঁর যে কটি রেকর্ড আছে তা-ও আর গ্রামোফোন কোম্পানী প্রকাশের উদ্যোগ করেন না। জানিনা তাঁর নামে কোন স্মৃতিসংস্থা আছে কিনা। থাকলেও তাঁরা নীরব কেন জানিনা। দিনেন্দ্রনাথ অসংখ্য রবীন্দ্রসংগীতকে রক্ষা করেছেন আজীবন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নাম স্মৃতিলোকে নির্বাসিত মাত্র। যে শিল্পী নিজের শিল্পসাধনাকে সংকুচিত ক'রে অপরের সাধনায় আত্মনিবেদন করেছিলেন তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকার প্রয়োজন আছে।

রবীন্দ্রনাথের সংগীতসাধনার একদিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর একদিকে দিনেন্দ্রনাথ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত সুরে বাণীবয়ন ক'রে রবীন্দ্রনাথ সংগীতের রাজ্যে ছাড়পত্র পেয়েছিলেন; আর সংগীতের স্বরাজে তাঁর সমস্ত লীলাময় সুরবিস্তার এবং অকুণ্ঠ আত্মপ্রকাশ রূপায়িত ও প্রচারিত হয়েছিল দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠধ্বনিতে। দিনেন্দ্রনাথ মেঘের মত সমুদ্রবিন্দুকে গ্রহণ ক'রে বৃষ্টিধারার মত তাকে অবারিত করেছিলেন।

লক্ষনীয় দিনেন্দ্রনাথের সাধনার নীরবতা। যা শিল্পীর সাধনার নামান্তর। তাঁর সমস্ত রচনায় আত্মনিবেদনের পবিত্র দীপশিখা। মহৎ শিল্পসাধকের পাশে তিনি ছিলেন মহৎ গুণগ্রাহী। নিজের মধ্যে দিয়ে তিনি রবীন্দ্রসংগীতকে বিকীর্ণ করে গেছেন। নিজেকে রেখে গেছেন অপ্রকাশের অনালোকে। রবীন্দ্রনাথ 'ফাল্গুনী'র উৎসর্গপত্রে দিনেন্দ্রনাথের নীরব সাধনার স্বীকৃতি লিখেছিলেন: 'আমার সকল গানের ভাণ্ডারী শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথের হস্তে এই নাট্য-কাব্যটি কবি-বাউলের একতারার মত সমর্পণ করিলাম'। দিনেন্দ্রনাথও সেই একতারা নিয়ে বাউলের মত নিঃসঙ্গ বেদনায় আত্মমৌন থেকে আজীবন অন্য এক মহাপুরুষের বন্দনাগান গেয়েছেন। সমুদ্রশঙ্খের মত আত্মধ্বনিতে প্রচার করেছেন সমুদ্রের মহিমা।

কিছুদিনপূর্বে মুখ্যত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহে দিনেন্দ্র সংগীতায়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সঃ উত্তরস্বরী

ভস্ম

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নাকি তুই ভোরের অমল
মহাশ্বেতা ! তোর স্তনে মুখ
রাখতে গিয়ে পায়ের পাতায়
চোখ পড়লো, কাঁপলো ভয়ে বুক :
দেখলাম, শ্বেতপদ্ম আঁকা
যেন স্থির অলকানন্দায়
হ'লোনা রে বুকে বুক রাখা
ফুলসাজে অপূর্ব সন্ধ্যায় ।

ওরে, আমি নির্জনে নির্মল
রূপে ঝাঁপ দিতে গিয়ে যদি
ফিরলাম ; তবু তুই জল
যাকে দেখি জনম অবধি ।
তুই বল্ আমার উপায়
দেহ স্বর্গ, নাকি তোর পায়ে ॥

নেপথ্য নায়ক

অরুণ ভট্টাচার্য

আমরা সবাই এক পঞ্চমাঙ্ক নাটকের
নেপথ্য নায়ক। দেখে দেখে দিন কাটে,
রাত্রি আনে অশুভ গোপন। বিধাতার
সান্ত্বনা সকলি গৌন। তথাপি দুর্বল
হৃদয়ে উৎসব নিত্য, আমরা দিনমান
এহেন সংসারে হব নদী পারাপার।

দূরে কাছে ঘণ্টা বাজে ; মন্দিরের সিঁড়ি
ঈষৎ অস্পষ্ট ছায়া, গবাক্ষের রং
চেতনার গাঢ়তায় প্রার্থনাপ্রতিম
মন্ত্রতর ; অবিন্যস্ত দেওয়ালের কোণে
ঝাড়লণ্ঠনের ঝুল, ঐতিহ্য নির্মাণ
প্রবল টানের মুখে ধূমাঙ্কিত কালি।

আমিই সে অদৃশ্য হাত, ধূর্ত কুশীলব ;
এবং সংসার জানে, বিধাতা নীরব।

রংমশালের ফুলকি

সুশীল বসু

মাঠ ঘাট জংলা দেশ পেরিয়ে তুমি এলে বসন্তের কোকিল
হাড়ভাঙা দিনগুলি এইবার হারাবে সাঁঝ-বেলাকার বুকে
সাজপোষাক পরে নটীদের মতো বেরিয়ে আসবে,
মেঘগুলি দিগন্তের ঝাড়লণ্ঠন জ্বালাবে নাচঘর থেকে।

সমস্ত আবার দোল দিতে চায় রঙিন কাগজের নৌকো
স্বপ্নগুলিকে, মন হতে চায় পাড়াগাঁয়ে জলঝিরি নদী,
কচুপাতার ওপর টলমলানো শিশির টুকরো
ভোরবেলাকার সিল্ক রঙের রোদ আর জলফড়িংদের
নীলচে-আভা ডানা, অভ্র-চিকণ দুপুর
আবার সব যাত্রাগানের দৃশ্যবদল পটে
চিন্তার রূপ রঙ্গমঞ্চ একে একে ভরে।

কিন্তু আমি কি সেই আছি, বেহিসেব বয়স গেছে ঝরে
ফুলঝুরি সেই সন্ধ্যাগুলি, রংমশাল ফুল্‌কি ঝরা রাত্রিগুলি,
পাটরাণী মেয়ের নীল নয়ন আর তারার কাঁকন ঝরিয়ে ফেলা
আলোর মত হাত, কিছুই নেই, কিছুই নেই ধুলোর ঝাঁপি ছাড়া।
বসন্তের কোকিল,
আমি এখন একটি মরাগাছ,
শোভাযাত্রার পাখিরা সব হারিয়ে গেছে
আমি এখন ভাঙা শাখায় শুনি কেবল কালপেঁচাদের ডাক
আমার শ্মশান পাহারা দেয় নীল তারাদের ঝাঁক॥

মৃত্যু এবং প্রেমিকের ভালোবাসা

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

—এমনকি প্রেমিকের জন্মশেষও পায়না বিশ্রাম—
বলেন জন্‌সন্। শান্তি নেই আর বিদেহ আত্মার,
হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসে, ধুলিতে মাটিতে অবিরাম
প্রাণে প্রাণে সুগভীর শান্তি ভাঙে স্মৃতির সম্ভার।

তাঁর প্রার্থনার গাঢ় উচ্চারণে ত্রিকালের চূড়া
কেঁপে ওঠে, প্রতিধ্বনি পাহাড়ে পাহাড়ে ক্ষিপ্রগতি—

মৃত্যু এবং প্রেমিকের ভালোবাসা

বেজে ফিরে আসে মৌনে। ভীতত্রস্ত সলজ্জ বধূরা
অন্তরালে তুলে দেয় সম্ভাবিত আনন্দ সম্মতি।

এমনকি সে লম্পটও আসক্ত যে বারবণিতায়—
আসবে আশ্রিত সুখী, সুখ দুঃখ সহজেই ভোলে,
এবং কুটিল স্বামী প্রত্যহ যে ভোগেন ঈর্ষায়
অজস্র সন্দেহে, তারা প্রেমিকের দীর্ঘশ্বাসে দোলে

এ মুহূর্তে হ'তে পারে সর্বত্যাগী নিঃস্ব অনিকাম,—
একারণে প্রেমিকের ভস্মশেষও পায়না বিশ্রাম।

স্বাগত বিষাদ

সুশান্ত বসু

প্রণয়ে প্রণত চক্ষু, বুকজোড়া অনির্বাণ জ্বালা
যৌবনের রঙ্গমঞ্চে এই নিয়ে তার কথামালা
যে নাটকে প্রচলিত ; যদিও সে নাটকে মৃত্যুর
নেই কোনো আয়োজন তবু তারই বিপ্রলব্ধ সুর
ঢেকেছে গভীর মৌনে তার ভীরু জীবনের ম্লান বারোমাস।

এ নাটকে মৃত্যু নেই। তবু এক মৃত্যুবহ জ্বালা
নিয়ত পোড়ায় তাকে। কোথাও নিরালা
নির্জন নীরব ঘর তার এই খরদীপ্তি দাহ
জুড়োবার জন্যে নেই। নিত্য এক ব্যথার প্রবাহ
মগ্নতায় ঢেকে রাখে তার ভীরু আঠারো-আকাশ

দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে কৃতঘ্ন দুঃখের করতালি
শুনেছে সে বহুবার ; তবু তার বাসনার বালি
খুঁড়লে ঠিক দেখতে পাবে দুঃখ নয় একাগ্র বিষাদ
সান্ত্বনার নদী বইছে, স্রোতে তার গান বাজছে :
স্বাগত বিষাদ।

কুয়াশা

সুশান্ত ঘোষ

শিমুল আর পলাশের অসাড় আঙুল
হয় না কখনো সুখী ব্যর্থ হবে
সে তো জানি। পুনর্জন্ম
হবে না স্মৃতির। এই সত্য
মেনে নিয়ে ফিরে যাব
অলঙ্ঘ্য পাহাড় মাঠ নদী
পেরিয়ে বিমুগ্ধ কল্পাকাশে।

অনেক দিনের ছাই আগুনে অঙ্গারে
পুড়ে শেষে মিথ্যে হবে,
তবু মনের কোণে
জ্বলবে যে বিস্মিত আগুন,
সমুজ্জ্বল নির্মল আবেশে—
সে আগুন প্রিয়সখী, দূর থেকে
তোমাকেও ছোঁবে।

দরজায় টোকা শুনে চমকাই
প্রার্থিতা এসেছে দ্বারে।
ব্যস্ত কলতলা, ভোরবেলার সমাজ,
কুলুপ খুলেই দেখা
তর্পিত মুখের চেনা হাসি।
অবরুদ্ধ হৃদয়ে তবুও
আতুর পাবার ভাষা,
কুয়াশা ঝরছে চারপাশে ?

উপহার : বন্ধুদের

মানস রায়চৌধুরী

সব ছেড়ে যেতে ভয় করে।
আমরা সকলে একসঙ্গে চলে গেলে
পরিত্যক্ত শূন্যের গহ্বরে
কি কি যাবো ফেলে ?

মূল্যবান কোন কিছু নয়,
প্রথমত কয়েকটি ছেঁড়া জামা
তারে ঝুলবে, দুলবে হাওয়ায়
আর যৌবনের কিছু উদ্বৃত্ত সময়
অপব্যয়ী আঙুলে পুড়িয়ে
ছড়িয়ে রেখেছি তার ভস্ম ইতস্তত।

এখন সমস্যা হলো কাকে পাওয়া যায়
কার হাতে তার দেবো নির্জন বাড়ীর
কত মাইনে দিলে তবে লোক মিলবে পাহারাদারীর
নারকীয় পটভূমি রাখবে অক্ষত।

অতঃপর বলে রাখা ভলো
আমরা সব কালান্তক-শিশু, পাতালের আলো
ভুলক্রমে এই পৃথিবীতে
হলো জন্ম নিতে
আমাদের সুধায় অরুচি
তাছাড়া পাবেনা ঘুম কিছুতেই
বিছানাটি যদি হয় পরিচ্ছন্ন, শুচি !
আমরা আবার আসবো

উত্তরসূরী

উত্তর-দক্ষিণে সব অবজ্ঞাত গুহাপথ দেখে
কপালে ত্রিবলী আর পায়ে এঁকে তীক্ষ্ণ ক্ষত রেখা
ডেরায় ফিরবো আমরা কে কে
ইত্যাদি কপালে আছে লেখা ;
তারপর কি যে হবে বলেনি গণৎকার—
ধরো যদি ঘরে ফিরে দেখতে পাই অন্য কার
স্বল্প পরিচিত মুখ, রাম ? হরি ? পাড়ার মধু না ?
আমাদের মূল্যবান সমস্ত জঞ্জাল ঝাঁট দিয়ে
চালডাল বাসনকোসনে খাশা সংসার সাজিয়ে
লক্ষ্মীর সামনে রোজ দিচ্ছে ধূপ-ধুনা।

আমরা চাইনা স্বর্গলোক
জেনেছি যে বাসনার এই অন্তঃসার।
তাই বড় ভয় পাই কেননা অধুনা
আমাদের উপযোগী সুন্দর নরক
ত্রিভুবনে পাওয়া বড় ভার।

পতঙ্গের গল্প

শান্তি লাহিড়ী

পতঙ্গ পালালো ভয়ে, মোমবাতি—কী ভীষণ আলো
রূপচোখে দেখতে দেখতে অসমাপ্ত যন্ত্রণার ছাপ—
কেবল পাখাটা তার পুড়ে গেছে। উত্তাপের শ্বাসে
আচ্ছন্ন শরীর ওর, প্রতিবিম্ব সন্ধ্যার মুকুরে,
এখনো সমাপ্তি নয়— শুধু ওর পাখাটাই নেই।

তা বলে পতঙ্গ তোর মিষ্টিমনে বাতাস কাঁপেনা
বেতের শিসের মত ? ধুয়ে তোর আকণ্ঠ তৃষ্ণায়
মোমবাতি নেভে নারে ? তুই শুধু টোপর পরাস

পতঙ্গের গল্প

নির্ণিত আলোকে আর অর্বাচীন স্থবির মৃত্যুকে
তারপর ছাইটুকু সাক্ষী রেখে আকাঙ্ক্ষার বিষে
আবছা সুখের ছোয়া মেখে নিয়ে যে ভাল সঙ্কেত ?

অব্যর্থ আগুন কাঁপে পাখনার শব্দের মতন !
উত্তর শিয়রে বসে লালসার বিচ্ছিন্ন উদর
সমাপ্তির সুর ভাঁজে বেহালায়, উন্মত্ত শর্বরী
—সে করুণ কাহিনীর নিবেদনে পাখাটাই শুধু
একটা পাপের মত বহুকাল গল্প হয়ে থাকে।

লাল পাহাড়

শিবশম্ভু পাল

সেই এক পাতালের স্তব্ধতায় মনে হয়েছিল
তোমার চেহারা শুধু আরণ্যক ইংগিতের উষ্ণ জলবায়ু।

রক্তের ভিতরে, নীচে বহুমুখী দ্বিধার আগুন
ঠাণ্ডা মৃত কতগুলো শিলাস্তূপ হয়ে পড়ে আছে ;
তারি 'পরে আপনাকে রোদ্দুরের দিগন্ত পেরিয়ে
প্রতিষ্ঠিত করি।
বাতাসে ইচ্ছার স্পর্শ হিল্লোলিত ইচ্ছাগুলো হাস্নুহেনা ফুল !

সুতরাং এতো স্বাভাবিক
বিমুগ্ধ সাপের ফণা লোভে আর শিকারের
প্রচণ্ড উৎসাহে

ফাঁসীর দড়ির মত অকরুণ দোলে।

পাতালের স্তব্ধতায় শঙ্খচূড় সব বিষ বুকে ঢেলে দিলে

উত্তরস্থরী

আর্তনাদে কেটে পড়ি শোকার্তের মতো :
এসো তুমি তীব্র হয়ে, কাছে এসো ; আলিঙ্গনে বাঁধি।

শিলার ও প্রান্তে তুমি। আমার প্রতিটি শব্দ
ফিরে বলে গেলে
জমাট শীতল স্তব্ধ শিলাখণ্ডে প্রতিধ্বনি তুলে।

আমার বন্ধুকে আমি

দিব্যেন্দু পালিত

আমার বন্ধুকে আমি ঈশ্বরের অভিপ্রেত আলো
দেখাতে চেয়েছি কতো ; এবং অধিক কতোবার
লাল সূর্য ডুবে গেলে যখন অশথ, বট প্যাঁচা, ডাহুকের
ডিম প্রসবের শান্ত নির্জনতা ডেকে আনে যখন জননী
গভীর জনন ভুলে ঋক্-পুরাণের প্রেমে শঙ্খ-সমুদ্রের ছবি হয় ;—
আমার বন্ধু-কে আমি সে-সময় আঁধারের নিপুন সময়
বেথুয়া গুল্মের ফাঁকে দেখাতে চেয়েছি মৃত সর্পের রমণী
কি ক'রে ডিমের দেহে সুষুম্নার সন্ধানে নিজের
প্রাগৈতিহাসিক ব্যথা ভুলে থাকে ; আর অন্ধকার
উৎক্রান্ত বিষুবের দেহের জড়ুল মুছে চিরকাল হয় আরো ভালো!

আমার বন্ধু-কে আমি সুচিরোমা অন্তর শরীরে
ঘ্রাণের প্রচুর অর্থ জেগে থাকে, দেখিয়েছি, ক্লান্ত জাগরণে
প্রতি মুহূর্তের নিদ্রা মৃত্যু হয় ; সংগ্রামী পুরুষ
সূর্যেন্দুসঙ্গম কোনো দীর্ঘল রাত্রির শেষে বয়োধর্ম স্বীকারে প্রস্তুত :
এবং বয়স্কা নারী তার বয়সের স্মৃতি ভুলে গিয়ে হয় প্রমাথিনী,
অরায়ু জটিল তবু চরিত্র স্খালন ক'রে ক্রোমরসে ঋণী
হ'তে চায় ; বিনোদিনী কোথায় বাহুর স্রোতে খোঁজে দেবদূত ;
দক্ষ প্রতিবেশী এক দ্রৌপদী ব্যথায় ভুগে হয় অমানুষ,

আমার বন্ধুকে আমি

পরস্বাপহারী ; দেব দ্বিজ তার প্রজ্ঞার প্রাচীর ভেঙে দূর আমন্ত্রণে
রাত্রি শেষে চ'লে যায় কোন এক স্থূলমতী নারীর গভীরে !

আমার বন্ধু-কে আমি নদীর গভীর জল, জলের ভিতরে
জলজ তৃণের মোহ, ভালোবাসা কতোখানি সংগ্রাম কুশলী—
দেখাই, এবং দেহে যা-কিছু শক্তি আছে সংগ্রাম-বিমুখ :—
মানুষ মানুষ হ'তে চেয়েছে অনেক কাল ব্যর্থতায় হ'তে পারেনি কো
মানুষের পিতামহ অগত্য প্রবীন এক আসেনি তো ফিরে।
আমার বন্ধু তবু ঈশ্বরের আলো খুঁজে যন্ত্রণায় নিজের শরীরে
নিয়ত নিঃসীম ব্যথা ব'য়ে চ'লে ভাবে পরলোক
এই সত্যে আস্থাবান ; কপালে ত্রিবলী টেনে তথাগত সুখ,
শান্তি করায়ত্ত ক'রে, যকৃতে দারুণ ক্ষতি, দেহে নামাবলী
নামক যন্ত্রণা ঢেকে জপে শিব-সত্যম্-সুন্দরে !

জেসন্

পরিমল চক্রবর্তী

অভিজ্ঞান নয় তার আযৌবন রূপের অনৃতে।

মৌসমীবিধুর তাই তার মন, আর তার দেহ
পুষ্পের যৌবন যেন। অথচ কখনো যদি কেহ
তাকে বলে : কাকে তুমি দূরযানী স্মৃতির অমৃতে
পান কর প্রতিদিন প্রতিরাত ? অমনি সে দু'হাতে
দু'চোখ আবৃত করে ; যেন তার ভোরের ভৈরবী
মুছে গেছে অন্ধকারে। যদিও নিবিড় সান্দ্র রাতে-
ইচ্ছার বাগানে তার ঝরে পড়ে তুষ্কার করবী।

এবং আদিম সেই আকাঙ্ক্ষার নীল মত্ততায়
সে আজ ভিখারী যেন। অনুক্ষণ সুতীক্ষ্ণ তূণীরে

উত্তরস্বরা

বিদ্ধ ক্ষতবিক্ষত সে। হায়রে, মননী স্বচ্ছতায়
সে আজো স্থাখেনি দাহ মায়ামৃগ-রূপের গভীরে!

মানুষের মানুষীর প্রণয়ের আকুনির মতো
কোনো আলো নেই বুঝি তার নর্মে প্রতিক্রিয়া রত॥

অরব আয়না

আলোক সরকার

তোমার ঘরের মধ্যে তুমি ছিলে আর জাহাজের সেই ছবি:
মাঝে-মাঝে মনে পড়ে।
লাল সিঁড়ি দিয়ে উঠে জামরুল রঙের দালান, নীরবতা।
কী ক'রে অমন জোরে হেসে উঠতে তুমি, উন্মোচিত স্বরে।
আমিও বিকৃত এক পরিশ্রম, অর্থার্থক নির্মম ব্যর্থতা
পাহাড়ের পাশের বাড়ির
খড়ের চালের প্রস্তুতি জ্যোৎস্নায় এক সংহত বিষাদ।

এবং তোমার মুখ, তোমার বসার ভঙ্গি অমূর্ত প্রসাদ।
সিঁড়ি দিয়ে স্পষ্ট নেমে এসে
প্লাবিত আকাশ স্থির শুভ্র অস্বীকৃতি, মেঘহীনতায়।
স্থবির হেমন্তকাল সমস্ত দুপুর যেন নিঃস্ব বেলাশেষে;
ভালোবাসা! তন্ময় বিরতি এক স্বতঃস্ফূর্ত অন্বিত অমায়
আমি জানি। বাগানের গোলাপ-বল্লিকা পিছে রেখে
ফিরে আসবার পথে তোমার জানালার দিকে একবারো চাইনি।

অথচ ঘরের মধ্যে তুমি ছিলে, স্মৃতি আজ-ও প্রত্যক্ষ কাহিনী।
মাঝে-মাঝে উচ্ছসিত দাবি।
অথচ নিঃসঙ্গ এক কিশোর চোখের জ্যোৎস্নার সুদূর মিলনে।

অরব আয়না

ভাবতে পারি না তবু কেন দেখবো না ফুল, খুঁজবো না চাবি
তোমার ঘরের। আমি তোমার হাসির শব্দ নীল অন্তমনে
কতো যে শুনেছি! আজ-ও আন্তরিক অর্জিত অভ্যাসে
গ্রামের ভিতরে যাই সকালবেলায়।

•

ছবি কী নিস্পন্দ ভ্রান্ত কালো মুখ মাটির ঘরের জানালায়
স্বাগত আহ্বান আর আনত চোখের
মমতা, ঘরের মধ্যে অরব আয়না স্থির তীব্র অত্যাচার
ওদিকে পাহাড়তলী নম্বিত প্রস্তুতি মগ্ন সমারোহ প্লাবিত ছন্দের
আতত বিজয়। শান্ত বাড়ি ফিরি বিকেলবেলার
কুয়াশারঞ্জিত পথে। আলোকিত মিলনী সংরাগে অচঞ্চল
লীন। করুণা, আমার
তোমার মতন জোরে হাসতে পারিনি অবিকল
ক্ষমা করো পরিণতি স্বাভাবিকতার।

জলপদ্ম

নবেন্দু চক্রবর্তী

কী গভীর অব্যর্থ সন্ধান
মুহূর্তেই করেছো যে দান
হে সমুদ্র জাননাকো তুমি
চৈত্রে কি-বা এনেছো মৌসুমী।

মণি, মুক্তো, মতি, মরকত,
গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত, শরত,
স্বপ্ন, সাধ, সফলতা সব-ই
নিরর্থক শূন্যতার ছবি

উত্তরস্বর।

এঁকে যায়, সবুজ বিলান
ভেঙে পড়ে চত্বর দালান
লুপ্ত হয় বিশাল গম্বুর
ক্ষতি, ক্ষয় পলকে নশ্বর।

শুধু থাকে ব্যপ্ত সমতল
ভেজে প্রাণ, বিন্দু বিন্দু জল
ঝরে পড়ে, ব্যগ্র আলিঙ্গনে,
মিশে যায় কী তীব্র সন্ধানে।

তোমার জলেতে, এই জল
অঞ্জলিতে সকল সম্বল
ঢেলে দিতে, গভীর বিপুল
একে নাও, এ জলের স্থূল।

একলব্য

সুবোধ দাশগুপ্ত

(স্থান পশ্চিম জার্মানীর একটি বন। নায়ক একজন আমেরিকান সৈন্য ও একটি জার্মান কাঠুরিয়া। সংবাদটি প্রকাশিত হয় "নিউ টাইম্‌স্" সাপ্তাহিক পত্রিকার ২৩শ সংখ্যায়, ১৯৫৩, ৩রা জুন।)

এখানে লোক নেই, জন নেই, এখানে সবুজ বন কেবল,
এখানে শুধু আমরা, আর দূর বিস্তার বন।
কোনো কোলাহল নেই এখানে—সহর কত দূরে!
পাতায় পাতায় হাওয়ার মর্ম্মরিত গতি ;
কচিৎ পাখির কণ্ঠে, পতঙ্গের হঠাৎ চাঞ্চল্য—গুঞ্জন ;
ছায়া-ছায়া অন্ধকার।
কিন্তু তোমাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি,
দেখতে পাচ্ছি তোমার হাতের কুড়ুল,

একলব্য

যার ধারটুকু চায়নার দাঁতের মত
হিংস্রতায় হাস্‌ছে।
না, না, হিংস্রতায় নয়, হাস্‌ছে স্নেহে,
হাস্‌ছে করুণায়।

তবে আর দেরি ক'রোনা, দ্বিধা ক'রোনা,
হাতের মুঠোয় শক্ত ক'রে ধরে হাতলটা,
কঠিন ঠাণ্ডা হাতলটায় আঙুল কটাকে
সাপের মত জড়িয়ে নাও।
পেশীতে শক্তির স্রোত আনো
শিরাগুলোকে স্ফীত ক'রে।
তারপর
যেমন ক'রে গাছের কচিডাল কাটো অরণ্যে
ঠিক তেমনি ক'রে আমার এই,
আমার এই দীর্ঘ-দীর্ঘ,
স্পর্শময় আঙুলের উপর
ক্লান্ত, গৃহোন্মুখ, শুভ্র আঙুলে
তোমার ঐ ধারালো কুড়ুলের
তড়িৎ আঘাত নামুক।
শুধু মুহূর্তের জন্যে উদ্যত হোক ঊর্দ্ধে
ঐ পরম আশ্চর্য আশ্চর্য কুড়ুল,
আর বিদ্যুৎ-ঝলকে দ্বিখণ্ডিত করুক
প্রাণ-প্রিয়,
প্রিয়ার দেহ-গন্ধ-মাখা
আমার এই উষ্ণ আঙুলগুলোকে।

কারণ,
তোমাকে কানে কানে বলি,—
তাহ'লে,
তা হ'লে ওরা আমাকে আর কোরিয়ায় পাঠাবে না।

উত্তরস্থরী

কোরিয়ার জলন্ত নরকে
যেতে হবে না আমাকে কখনো।
ফিরতে পারব দেশে।
সমুদ্রের ওপারে,
পাহাড়ি ঝর্ণার পাশে,
গম খেতের কাছ ঘেঁষে
হাজার স্মৃতিতে ঝলকিত
অলৌকিক ভাল-লাগা
সে গ্রামটি আছে,
সেখানে আবার ফিরতে পারব হয়ত।
হয়ত আবার প্রাণের শস্য পারব কুড়োতে
সবুজ-ঢালা দিগন্ত-ছোঁয়া মাঠে মাঠে।

এই চিরপরিচিত আঙুলগুলো থাকবেনা বটে,
সত্য বটে
সমস্ত হৃদয়ের আবেগ তখন বাহুর শাখা ব'য়ে
অঙ্গুলীহীন হাতের বিকৃত তালুতে
পথ হারিয়ে থম্‌কে দাঁড়াবে ;
কিন্তু তবু
প্রিয়া সুখী হবে আমাকে ফিরে-পাওয়ার আনন্দে ;
খুশীতে ছল্‌ছলিয়ে উঠবে আমার মন,
আমাদের দেহ।

সেদিন সেই মিলন-উৎসবে
আমাদের আত্মা
তোমাকে স্মরণ করবে, বন্ধু,
স্মরণ করবে চরম কৃতজ্ঞতায়।

তিনটি পত্র এবং দুটি কবিতা

এডিথ সিট্‌ওয়েল

ভূমিকা :

একসময়ে আমার ধারণা ছিল, কাব্য উপভোগ করার জন্যে কবির জীবনদর্শনের সঙ্গে পাঠকের জীবনদর্শনের মিল থাকা প্রয়োজন। কিন্তু আমার প্রিয় কবিদের প্রত্যয়ের সঙ্গে আমার নিজের প্রত্যয় মেলাতে গিয়ে পদে পদে দেখা গেল যে হয় তার জন্যে কাব্যের অপব্যাখ্যা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, আর না হয় নিজের প্রত্যয় বদলানো ছাড়া উপায় থাকেনা। আমি যুক্তিবাদ, জড়বাদ, ভোগবাদ, বিবর্তনবাদ এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। অথচ আমার বিশেষ প্রিয় কবিদের মধ্যে আছেন বৈষ্ণব সাধক চণ্ডীদাস, ফাসিজম্‌-এর সমর্থক এজ্‌রা পাউণ্ড, শূন্যবাদী র‍্যাঁবো, রক্ষণশীল এলিয়ট, কম্যুনিষ্ট বিষ্ণু দে, গোঁড়া ক্যাথলিক এডিথ সিট্‌ওয়েল। আমি আমার জীবনদর্শন বদলাবার স্বপক্ষে কোনো যুক্তি দেখিনে ; অথচ উক্ত কবিদের কাছে পাঠক হিসেবে আমার আনন্দের ঋণ অপরিশোধ্য। তাহলে ?

দীর্ঘদিন ধরে নিজের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে আমি আপাতত এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি যে কাব্য-উপভোগের জন্য প্রত্যয়ের মিল নিষ্প্রয়োজন, সে মিল খোঁজার চেষ্টা নিরর্থ। আমার এই সিদ্ধান্তের পেছনে যে যুক্তি আছে, তা নিয়ে এখানে আলোচনা করবনা। এখানে শুধু এটুকু নিবেদন করে রাখি যে আমার বিশ্বাস, সৎ কবিতা রসিকপাঠকের মনে দুটি প্রধান সূত্র ধরে' আহ্লাদের সঞ্চার করে। এর প্রথমটি হোল শব্দের যাদু। দ্বিতীয়ত পাঠক কাব্যের মধ্য দিয়ে জীবনের নিত্য অভিজ্ঞতাগুলিকে (যেমন, প্রেম, জন্ম, মৃত্যু, আতঙ্ক, আত্মনিবেদন, সৌন্দর্য) তাদের বিশুদ্ধতম রূপে অনুভব করেন। শব্দের যাদুবিদ্যা (ছন্দ, অলঙ্কার, ব্যঞ্জনা) যাঁর আয়ত্ত, এবং মানব-অস্তিত্বের নিত্য-অভিজ্ঞতাগুলি যাঁর উপজীব্য, সেই কবির দার্শনিক, নৈতিক অথবা রাজনৈতিক প্রত্যয় যাই হোকনা কেন, তাঁর সৃষ্টি আমাদের চমৎকৃত করে।

এই কারণে আমার মত নাস্তিক পাঠক এডিথ সিট্‌ওয়েলের মত ধার্মিক কবির বিশেষ অনুরাগী। ব্যক্তিগত পরিচয়ের ফলে সেই অনুরাগ না কমে

গভীরতর হয়েছে। তাঁর কবিপ্রতিভাই শুধু অসামান্য নয়; তাঁকে দেখে, তাঁর আলাপ শুনে, তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং সহৃদয়তার দ্বারা অভিভূত না হওয়া অসম্ভব। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় হয় ১৯৫৭ সালের ১৬ই জুন এক রবিবার বিকেল সাড়ে তিনটের সময় লণ্ডনে সিসেম ক্লাবের লাউঞ্জে। আমি পূর্বেই তাঁকে চিঠি লিখেছিলাম; তিনি উত্তরে প্রথম পত্রটি লেখেন। প্রথম পরিচয়েই তিনি আমার মত নিতান্ত অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির প্রতি অন্তরঙ্গ জনের মত ব্যবহার করেন। ব্লেকের দ্বিশতজন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তিনি পক্ষকালব্যাপী এক উৎসবে স্বরচিত কবিতা পাঠ করার জন্যে আহূত হয়ে যাবার পথে একদিনের জন্য লণ্ডনে নেমেছিলেন। প্রথম পরিচয়ের দিনই তিনি শুধু স্বরচিত কবিতা পড়ে শোনালেন না; নিজে উদ্যোগী হয়ে কবি সেসিল ডে ল্যুইস্-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর ইংলণ্ডে থাকা কালে তাঁর সঙ্গে আরো বারচারেক আলাপের সুযোগ হয়েছিল। আমার "প্রবাসের জার্নাল"-এ তার কিছু বিবরণ আছে। তাঁর মুখে তাঁর স্বরচিত কবিতার আবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা শোনার সৌভাগ্যও আমার ঘটেছে। একটি চিঠিতে আমি তাঁকে তার কবিতা সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করে পাঠাই। এখানে প্রকাশিত দ্বিতীয় পত্রটিতে তিনি এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেন। আমার বিশ্বাস তাঁর অনুরাগী পাঠকরা এই চিঠিটির শেষাংশ পড়ে উপকৃত হবেন। ইংল্যাণ্ড থেকে যেদিন আমি নিউইয়র্কের দিকে রওনা হই সেদিন দুপুরে কবি স্বহস্তে কিছু স্নেহভাষণ লিখে তাঁর স্বাক্ষরিত একখণ্ড Collected Poems আমাকে উপহার দেন। এটি আমার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের অন্যতম মূল্যবান সংগ্রহ।

কোলকাতায় ফিরে কিছুদিন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। এবছর এপ্রিল মাসে তাঁকে একটি চিঠি লিখি। উত্তরে তিনি প্রথমে একটি টেলিগ্রাম, এবং তারপর এখানে প্রকাশিত দ্বিতীয় পত্রখানি পাঠান। তারি সঙ্গে স্বহস্তে কপি করা সম্প্রতি রচিত তিনটি কবিতা। তারি দুটি এখানে অনুবাদ সমেত প্রকাশ করা গেল। আমার বিশ্বাস, পাঠক কবিতা দুটি থেকে বুঝতে পারবেন, সৎকাব্যের আবেদন কিভাবে প্রত্যয়গত ব্যবধান অতিক্রম করে সহৃদয়ে হৃদয়-সংবাদী হয়ে ওঠে। চিঠি তিনটি থেকে শ্রীমতি সিট্‌ওয়েল-এর সৌজন্য এবং মহানুভবতার কিছুটা আভাস মিলবে।

শিবনারায়ণ রায়

তিনটি পত্র এবং ছটি কবিতা

Letter I

Renishaw Hall,
Renishaw, Nr Sheffield
Telegrams, Eckington, Derbyshire.

5th June, 1957
Dear Mr. Ray,

Thank you so much for your letter and "*Explorations*", which I find a very interesting book. I am grateful to you for sending it to me.

As you will see, I am in the country ; but I shall be in London for *one day only*, on Sunday the 16th, (*en route* for the Aldeburgh Festival, at which Mr. Benjamin Britten has asked me to recite), and it will give me a great deal of pleasure if you and your wife, who I hope is with you, will come to tea with me at the club (at which I shall be staying) at 3-30.

The address The Sesame Club, 49, Grosvenor Street, W 1.

I have to say such an early hour; because later I have to discuss with Professor Day Lewis, who is reciting with me how we actually divide the programme.....

.....May I ask you to be kind enough not to tell anyone either that I shall be in London for that day, or, any time, my address in London, for I am nearly bothered to death by the newspapers, poetasters, etc. etc.

Believe me,

Renishaw Hall,
Renishaw, Nr Sheffield

27th June, 1957

Dear Mr. Ray,

Thank you so much for your charming letter. I hope you will enjoy your talk with Dr. Spender tomorrow. I wrote to him about the book, and talked, also, at some length with Professor Day Lewis, in the motor on the way to Alderborough where we were reciting at the festival.

It was a very great pleasure to me to meet you the other day. And I do hope that when you return to London you will let me know (well before hand) and give me the great pleasure of lunching with me. I shall be at the Sesame Club.

You kindly ask about the development in my poetry. I had always been the same person. But I was perfectly aware that no proceeding woman poet excepting Christina Rossetti (in one poem only, "Goblin Market") had any technique whatsoever. I therefore was not going to waste my fires until I knew how to make them burn.

Hence *Facade*. Without *Facade* I could never have written "*Gold Coast Customs*". That was the result of scenes I had witnessed and of tragic experiences.

The Sun in my poems, that Gold that occurs so often, are there, I think, because of the day when I was born—a day which would have been, for the Greeks, in the festival of the wheat ; I was born in a heat wave, which for the English means life-giving fertility. I am explaining this very badly, but am suffering from insomnia, and am very tired.

I look forward to seeing you again as you return.

All best wishes.

Letter III

Renishaw Hall,
Renishaw, Nr Sheffield

27th May, 1959.

Dear Mr. Ray,

No letter that I have ever received has given me greater pleasure than yours. It is very strange, but do you know if ever I want to hear from someone, if I think of them intensively—I mean with force and intensity—for about two weeks I, somehow, get into touch with them, and they *do* write to me.

This happened to me just before I received you letter. I have never talked to anyone with more pleasure than that with which I talked with you. And the otherday I thought

with sadness that I did not see how I was ever to get in touch with you again.

I concentrated on this—and your letter came.

It means a very great deal to me that you like my poetry. Herewith I send you some of my *new poems*, and I will copy and send two more.

I should have written immediately I received your letter, but I was ill—having caught a very bad chill straight on top of two serious attacks of influenza. But I hope my cable reached you intact.

Shall I ever have the great pleasure of seeing you in England again? I do *hope* so, and I hope that next time you come, Mrs. Ray will be able to come with you. You will both receive such a warm welcome.

I did enjoy our many conversations.

with very real friendship.

My best wishes to you.

THE WAR ORPHANS

(Written after seeing a photograph of Korean children asleep in the snow)

The snow is the blood of these poor Dead...
they have no other—
These children, old in the dog's scale of years, too old
For the hopeless heart—ghosts for whom there is none to care,
Grown fleshless as the skeleton
Of Adam, they have known
More aeons of the Cold than he endured
In the first grave of the world. They have, for bed,
The paving stones, the spider spins their blankets,
and their bread
Is the shred and crumb of dead Chance.
In this epoch of the Cold,
In which new worlds are formed, new glaciations

To overcast the world that has the heart,
There is only that architecture of the winter, the huge plan
Of the lasting skeleton, built from the hunger of Man.
Constructed for hunger—piteous in its griefs.

Of outworn flesh, the Ape-cerement,
O the foolish tattered clothing,
Rags stained with the filth of humanity, stink of its toiling.
But never the smell of the heart, with its warmth, its fevers,
Rapacity and Grandeur...For the Cold is Zero
In infinite intensity, brother to democratic
Death, our one equality, who holds
Alike the maelstrom of the blood, the world's incendiarism,
The summer redness and the hope of the rose.
The beast, and Man's superiority o'er the beast
That is but this :
Man bites with his smile, and poisons with his kiss.
When, in each dawn,
The light on my brow is changed to the mark of Cain,
And my blood cries "am I my brother's keeper ?"
Seeing these ghosts
Of Man's forgetfulness of Man, I feel again
The pitiless but healing rain—who thought I only
Had the lonely Lethe flood for tears.*

যুদ্ধজাতক

(বরফের উপর ঘুমন্ত কোরীয় শিশুদের একটি আলোকচিত্র দেখে লিখিত)

তুষার এদের রক্ত এসব বঞ্চিত মৃতদের···
অন্য কিছু নেই—
এমন শিশুরা, রিক্ত বছরের মতো পুরনো, প্রাচীন

---

* কবিতা দুটির যথাসম্ভব আক্ষরিক অনুবাদ করা হয়েছে। অন্যভাষায় কবিতার রূপান্তরে যদিও মূলের স্বাদ, আবেগ ও যথাযথ অর্থ বজায় থাকে না, তথাপি বাঙালী পাঠকের কাছে এর অন্য একটি আবেদন পৌঁছুবে বলে এই রূপান্তর দেওয়া গেল। সঃ উত্তরসূরী

এডিথ সিটওয়েল

আশাহত হৃদয়ের তরে—শুধু এক প্রেতের অমুখ নির্বিকার,
মাংসের দুর্ভিক্ষ যেন হাড়ের কাঠামো
সেই আদিম আদম, এরা জেনে গেছে তার ঢের বেশি
অনন্তকালের শীতে, আদম যা স্পষ্ট সয়েছিলো
পৃথিবীর প্রথম কবরে। এদের ঘুমের শয্যা পাতা আছে
বাঁধানো পাথরে, মাকড়শা বুনেছে জাল চাদরের কবোষ্ণ আরাম,
প্রাণধারণের উপহার
শোকের প্রচ্ছদে মাত্র বিমূঢ় সুযোগ।
অনাদি আজন্মের কঠিন ঠাণ্ডায়,
উৎসারিত হলো তবু জন্মাবার বীজমন্ত্র, পুনর্বার তুষার প্রবাহ
ঢেকে দিতে চাইলো তার হৃদয়ী নিখিল,
মাত্র যেন শীতের স্থাপত্য থেকে যায়, বিপুল নক্সায়
ধরা চিরকালের আবছা আকার, অনাহারে গড়া,
ক্ষুধারই জন্যে দৃঢ়—শোকার্ত,
ক্ষয়ে যাওয়া অস্তিত্বের
অপমানে, পূর্বপুরুষের বিধুর পোষাকে কালো
হে নির্বোধ নষ্টছিন্ন বেশবাস
সামাজিক ক্লেদের অঙ্কিত আবরণ, ক্লান্তির বিষাক্ত গন্ধে ভেজা,
ইচ্ছার সৌরভে নয়, না প্রাণতায়, উত্তাপে,
কিংবা কোনো লুণ্ঠনে বৈভবে···যেহেতু শীতের অর্থ কেবল মৃত্যুতা
অঙ্কুরান প্রবল প্রচুর, সমষ্টির মৃত্যুর সহজ সহোদর,
আমাদের নিটোল সমতা, যা ধারণ করে আছে
রুধিরের ঘূর্ণিত উচ্ছাস, আবিশ্ব দাহিকা দাবদাহ,
গ্রীষ্মের রক্তাক্ত কোমলতা এবং দিন-গোনা গোলাপের আশা,
মানুষের বৈজয়ন্তী পরাজিত পশুর উপর
তথাপি আশ্চর্য :
মানুষই দংশন করে স্ফুরিত হাসিতে, কাঁটার চুম্বনে ভালোবাসে।
বিভাবরী গেলে যেই
আমার ললাটে আলো ঘুরে যায় প্রথম আতঙ্ক সেই কেইন্-এর দাগে

রক্তের ভিতরে যেই চিৎকার উঠে আসে "আপন সহোদরের আমি
কি রক্ষক ?"
তখনই এমন প্রেত দেখে
স্মৃতি-অন্ধ মানুষের, আমি অনুভব করি স্থির পুনশ্চ ভিতরে
নির্মম কল্যাণী বৃষ্টিধারা—যখন কল্পিত সকলে ভেবেছে
অশ্রুর প্লাবনে আমি বিস্মৃতির বৈতরণী
কান্নায় নির্জন লিখি নদী।

অনুসরণে : অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

"HIS BLOOD COLOURS MY CHEEK" *

His Blood colours my cheek—
No more eroded by the seas of the world's passions,
greeds, I rise
As if I never had been Ape, to look in the compassionate,
the all-seeing Eyes.

His blood colours my cheek.
Oh ! were but those Flames the tongue wherewith I speak
Of the small ambitions I have seen
Rise in the common street
Where the bell that tolls in Bedlam tells the hour!
Yet still great flowers like violet thunders break
In air, and still the flower of the five-petalled senses
Is surely ours.
I, an old dying woman, tied
To the winter's hopelessness
And to a wisp of bone
Clothed in the old world's outworn foolishness—
A poor Ape-cerement
With all its rags of songs, loves, rages, lusts and flags of death—
Say this to you,
My father Pithecanthropus Erectus,
your head once filled with primal night—

* *A saying of St. Agnes.*

You who stood atlast after the long centuries
Of the anguish of the bone
Reaching upwards towards the loving,
the all-understanding Sun—
And to you, who no more walk on all fours like the first
Gardener and grave-digger, yet are listening
Where, born from Zero, little childish leaves and lives begin :
I hear from the dust the small ambitions rise.
The white ant whispers "Could I be Man's size
My cylinders would stretch three hundred feet
In air, and Man would look at me with different eyes !"
And there the Brazilian insect all day long
Challenges the heat with its heavy noise
"Were I as Great as Man, my puny voice
Would stretch from pole to pole, no other sound
Be audible. By this dictatorship the round
World would be challenged—from my uproar would a new
Civilization of the dust be born, the old would die like dew !"
I watch the new race of rulers, the snub-nosed, vain, four-
handed,
Building a new Babel for the weak
Who walk with the certainty of the somnambulist
Upon the tight-rope stretched over nothingness—
Holding a comet and the small ape-dust in their fist
Over the grave where the heart of Man is laid.
I hear the empty straw whine to the street
Of the ghost that has no bread, the lonely ghost
That lacks prosperity "I am your wheat
Come, and be fed."
But I see the Sun, large as the journeying foot of Man.
see the great traveller
Fearing no setting, going straight to his destination,
So am I not dismayed.

"তার রক্তে আমার মুখে আভা লাগে"

তার রক্তে আমার মুখে আভা লাগে—
পৃথিবীর সমস্ত লোভ এবং বাসনা সমুদ্রে আর বিক্ষুব্ধ নই, আমি আমি

যেন কখনো কারো দৃষ্টিতেই পূর্বপুরুষের মতো দয়ার পাত্র ছিলাম না।
তার রক্তে আমার মুখে আভা লাগে।
যদি সব অনুপ্রাণিত ক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্খাগুলি
খুব সাধারণ উৎস থেকে জন্ম নিত যেখানে
একটি প্রবলঘণ্টা অবিরাম নির্ঘোষে সময় জানায়,
তবু মহৎ পুষ্পগুচ্ছ তীব্র হলুদ উচ্ছাসে বাতাসে ছড়ায়,
তখনো ইন্দ্রিয়ের অনুভবের পদ্মটি
আমাদের করতলগত।
তখন আমি একজন মৃত্যু-প্রতীক্ষিত বৃদ্ধা
শীতের অসহায়তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছি,
আর এই সমষ্টি হাড়—যাদের ঘিরে রেখেছে প্রাচীন নির্বোধ
পৃথিবীর আচ্ছাদন—
সেই দুর্বল আচ্ছাদনও যেন
তার সমস্ত সঙ্গীত, ভালোবাসা বিদ্রোহ, বাসনা বা মৃত্যুসম্ভাবনা নিয়ে
তোমাদের বলে :
হে শিলীভূত অর্ধপত্তনর পূর্বপুরুষ আমার
তোমার চিন্তাও একদা আদিম অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল।
যে তুমি বহুশতশতাব্দীর দীর্ঘ যন্ত্রণার নিরতি থেকে
প্রেমিক স্পর্শের কাছাকাছি বিস্তৃত হয়েছিলে—
আর তোমারও প্রতি—যে প্রথম পুষ্পনারী কিংবা
কবর খননকারির মতো একসঙ্গে অনুসরণ করনা
তবু কান পেতে শুনছো শূন্যতা থেকেই শিশু কিশলয়
এবং জীবন স্পন্দিত হয়ে উঠছে :
আমি জানি ধুলো থেকেই ক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্খাগুলির জন্ম ;
ছোট উইপোকা ফিসফিসিয়ে বলে "মনুষ্য আকৃতি পেলে
আমার শুঁড় তিনশোহাত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হতে পারতো, তখন
নতুন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতো মানুষ"
ব্রেজিলের কিম্ভূত পোকারাও আছে যারা
গ্রীষ্মের উত্তাপের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে করতে বলে

এডিথ সিটওয়েল

"মানুষের মতো স্বরাট হ'লে আমার কণ্ঠ পৃথিবীর আদিগন্ত বিস্তৃত হতো ;
অন্য কোনো শব্দই তখন কানে আসতো না
—একনায়কোচিত এই দম্ভেই একমাত্র পৃথিবীর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যায়" ॥
আমি দেখেছি সেই উর্ধনাসা চতুর্ভুজ নতুন শাসকগোষ্ঠিদের ;
তারা নিশিডাকের মতো এক স্বপ্নময় আচ্ছন্নতায়
একটি "কমেট" এবং স্মৃতি নিয়ে
এক অবলম্বনহীন অনিশ্চয়তার উপর দিয়ে
এমন একটি অস্তিমের দিকে এগিয়ে চলেছে
যেখানে হৃদয়কেই একমাত্র কবর দেয়া হয়।
আমি সেই ক্ষুধার্ত নিঃসঙ্গ আত্মাকে বলতে শুনতে পাচ্ছি
"আমিই তোমার ভোজ্য—এসো, তৃপ্ত হও"

তবু আমি মানুষের চিরন্তন চলার মতো সূর্যকে দেখি,
দেখি সেই প্রবল পথিককে
পশ্চিমে চোখ না রেখে যে অনায়াসে তার লক্ষ্যে হেঁটে যায় ;
আমি তাই এখনো আশাবাদী ॥

অনুসরণে : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সমকালীন কথা-সাহিত্যিক ঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১)

কার্তিক লাহিড়ী

মানুষের জীবনে নানা সমস্যা এবং সেই সমস্যার প্রধানতম হচ্ছে বাঁচার সমস্যা, জীবিকার সমস্যা। অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্য বহু বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে, বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত মানুষ দারিদ্র্যের কশাঘাতে আহত হতে হতে এমন এক স্থানে উপনীত হয়েছে, যে স্থানে মানবিক মূল্য, দয়া-দাক্ষিণ্য, সহযোগিতা সমাজ বিজ্ঞানীর সংজ্ঞায় পর্যবসিত। অথচ মানুষ সব সম্বন্ধ বিচ্যুত হয়ে কদাচ একা বাসে সক্ষম। একদিকে আর্থিক অস্বচ্ছলতা মধ্যবিত্তদের নিতান্ত স্বার্থ-পর, স্ব-কেন্দ্রিক করে তুলছে, অন্যপক্ষে পরস্পরের সহযোগীতা, সহমর্মিতার প্রশ্নও প্রায়-বিলুপ্ত। কিন্তু চতুর্দিকে অক্ষমতা সপ্তরথীর মত ঘিরে রেখেছে, সেই ব্যূহ ভেদ করে বাইরে চলে আসতে হবে। অথচ মধ্যবিত্তদের অবস্থা অভিমন্যুর মত। নানা ঘূর্ণিপাকে ব্যূহে প্রবেশ করতে বাধ্য, যদিও চক্র ভিন্ন ভিন্ন করার উপায় অথবা কৌশল অজ্ঞাত। এমনতর ট্রাজিডি "দূরভাষিণী" উপন্যাসের উপজীব্য।

নায়িকা বীণা টেলিফোন অপারেটার। গিরীনবাবুর মতো তার অতীত সম্পর্কে মোহ নেই। জীবন যেখানে প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে তখন একমাত্র প্রশ্ন বাঁচার প্রশ্ন। সচরাচর এমন অবস্থায় মানুষ জীবিকার ক্রীতদাস হতে বাধ্য—একমাত্র জীবিকা ও জীবন ধারণার চিন্তায় ক্রমে সমস্ত সম্পর্ক সম্বন্ধে অশ্রদ্ধেয় এবং অস্থায়াগ্রস্ত হয়ে পড়ে মানুষ। বীণার ব্যক্তিত্ব এই অধঃপতন থেকে তাকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। তাই সে আপন সম্মান, মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে নৃপ্রয়ের ক্রীড়নক হতে অস্বীকার করে অথচ নৃপ্রয়ের সঙ্গে বীণার সম্পর্ক আত্মিক এবং হার্দ্যিক। অবশ্য গিরীনবাবুর পক্ষে এ-আবর্ত থেকে মুক্তিলাভ প্রায় অসম্ভব, তিনি বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় একজন আসামী মাত্র। এজন্য বীণাই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আমাদের সম্মুখে। প্রেমে ব্যর্থ হয়েও বীণা নিজেকে বিলীন করে দেয় নি, সমাজ-ব্যবস্থার সম্যকরূপ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছে—শুধু কমলার জন্য নয়, অসংখ্য কমলার জন্য তাকে সংগ্রাম করতে

হবে, সহকর্মীদের সঙ্গে একসঙ্গে দাঁড়াতে হবে। অবশ্য উপন্যাসটির ত্রুটি রয়েছে লিখন পদ্ধতির দুর্বলতায়। উপন্যাসটি ঘটনা-বহুল, কিন্তু প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি লেখক অপ্রধান পাত্র-পাত্রীদের মুখ থেকে শুনে লিখেছেন। ফলে ঘটনাবিন্যাসে কার্য-কারণের মালা কিঞ্চিত শিথিল। উক্ত ঘটনাগুলির বিস্তৃত চিত্রণ প্রয়োজনীয় বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ বাস্তব-প্রধান উপন্যাসে ঘটনাবলীর ঘাত-সংঘাত এবং উপস্থাপনায়, পরিবেশে সামগ্রিকতা অর্জন করতেই হয়, অন্যথায় লেখকের লেখা বলেই আমরা মানতে বাধ্য নই।

॥ ২ ॥

জীবিকার পর সহযোগিতা। নিজে বাঁচার পর আসে সবাইকে নিয়ে বাঁচার আগ্রহ। এই অভীপ্সা পূর্ণ হয় অন্যের ভালোবাসায়, প্রেমে। বীণা যে দিন বুঝতে পারল মৃণ্ময় তাকে প্রতিনিয়ত অপমান করার জন্যেই বিবাহে ইচ্ছুক, সেদিনই সে ধরা দিল বিমলের কাছে। বিমলের উদাসীন ও বীতস্পৃহ মনোভাব তিরোহিত হয়ে প্রকাশিত হলো মানুষ বিমলের সম্পূর্ণ চিত্র। এবং এ সম্ভব হলো বীণার প্রেমে, বীণার সহযোগীতায়। নরেন্দ্রনাথ মিত্র "প্রেম" নিয়ে রচনা করলেন অন্তত চারটি উপন্যাস। মানুষ শুধু রুটি, রোজগারে নিঃশেষিত নয়, এর পরও চিন্তা থাকে, ভাবনা থাকে, অনুরাগ আছে অর্থাৎ মানুষ নানা আবেগে উচ্ছ্বাসে, সুখে, দুঃখে মানব হয়ে ওঠে, যে মানব শুধুমাত্র দৈহিক অস্তিত্বে সম্পূর্ণ নয়, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে যে সর্বদাই নতুন থেকে নতুনতর হতে চলেছে তাই "দেহমন" উপন্যাসে আত্মকেন্দ্রিক নার্সিসাস রুবির রূপান্তর ঘটে! যে এতদিন দেহের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে বিজয়িনী হতে চেয়েছিল, ভেবেছিল একমাত্র রূপ ও যৌবন সম্বল করে পুরুষকে আঘাত হানবে, সে-ই অবশেষে আপন অনুভূতির তীব্রতায় অনুভব করল, দেহ-ই একমাত্র বস্তু নয়, কারণ দেহ-সম্মিলন ক্ষণস্থায়ী, যে-স্থায়িত্ব দৈহিক সম্ভোগের ভ্রান্তিতে বিনষ্ট কিন্তু যার রেশ থাকে বহুদিন, তা হচ্ছে ভাব-সম্মিলন, মনের একটি স্পষ্ট অথচ এমন সূক্ষ্ম স্পর্শ যা কোনক্রমেই চিহ্নহীন হয় না। বীণার সঙ্গে রুবির সাদৃশ্য তার ব্যক্তিত্বে। সমস্যা সম্মুখীন হওয়ার দৃঢ়তায়, প্রেমে ব্যর্থ হয়েও জীবনকে চ্যালেঞ্জ করার ব্যাপারে। তবু বীণা সাধারণ মধ্যবিত্ত কন্যা, অবশেষে আশ্রয় নিতে হয় বিমলের প্রচ্ছায়ে,

গিরীনবাবু ও মৃন্ময়ের অপমানের ভয়ে। কিন্তু রুবি বিভাস-কে ক্রীড়নকে পরিণত করে প্রত্যাখান করতে পারে, স্বামী, পিতা অথবা তৃতীয় পুরুষের ভয়ে ভীত হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেনা কারণ রুবির সমস্যা রূপবতী হবার সাধনা এবং সে-রূপতৃষ্ণা আর্টিষ্টের রূপতৃষ্ণা। অবশ্য "দেহমন" উপন্যাসে রুবির দেহ-সম্মিলন থেকে ভাব-সম্মিলনে উপনীত হবার স্তরগুলি যদি স্বীয় মন্থরগতিতে উদ্ঘাটিত হতো তবে রুবির ব্যক্তিত্ব, স্পর্দ্ধা স্পষ্টতর হয়ে উঠতো। লেখক একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন অথচ সে ঘটনা নিতান্ত মামুলি অন্তত অন্যান্য ঘটনার জোরালো অবস্থিতিতে উক্ত ঘটনা সম্পূর্ণ দুর্বল।

অন্যদিকে "সঙ্গিনী" উপন্যাসের নায়িকা বিবাহিতা এবং অসুস্থা। টি, বি, নিরোগ হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন এবং অবশেষে পায়ে একটি আব্যসেস-কে কেন্দ্র করে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্ক জটিল থেকে জটিলতর হয়ে পড়ে, বিভিন্ন দিক থেকে প্রতিবাদ জমা হতে হতে এবং স্বামী অমিয়র প্রতি নিদারুণ অসন্তোষে জয়া গৃহত্যাগ করল মনোতোষের সঙ্গে। টি, বি, এবং স্বামীর উপেক্ষা তদুপরি চিকিৎসায় অবহেলা (যা জয়ার স্ব-কল্পিত) সমস্ত মিলিয়ে যখন মৃত্যু নিশ্চিত, সে-সময় মনোতোষের মধ্যে বাঁচার ইঙ্গিত পেয়ে উন্মত্ত হয়ে গেল এবং পূর্বাপর চিন্তা না করে অথবা স্বামীর আচরণ যথেষ্ট বিবেচনা না করেই গৃহত্যাগ করল। অথচ মনোতোষের সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি কোন বিষয়েই জয়ার মিল নেই তাই অচিরেই মনোতোষের সঙ্গে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। কিন্তু যে মনোতোষ তাকে জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তার ঔরস-জাত পুত্রকে সে স্বীকার করে নিল। নরেন্দ্রনাথ মিত্র জয়ার মধ্যে এমন এক সংস্কার-মুক্ত মেয়ের চিত্র অঙ্কিত করলেন, যা আপাত শকিং, তবু এমন "ফ্রি-ওম্যান" আমাদের সাহিত্যে বিশেষ দুর্লভ। কিন্তু রাজনীতি-করা মেয়ে জয়া আপন-শিক্ষার অভিমানে মনোতোষ-কে আপন করে নিলেও আপন ভাবতে পারল না। অমিয়র অসুস্থ হওয়ার সংবাদে সে ছুটলো তাঁর শিয়রে। মাত্র অমিয়র ভালোবাসা ফিরে পাওয়ার জন্যে নয়—একদিন অমিয় জয়াকে বাঁচাতে চেয়েছিল নিজের জন্য, আজ জয়া অমিয়কে বাঁচাতে চাইল সবার জন্যে। তবু অমিয় মনোতোষের কাছে ম্লান। মনোতোষ elemental। হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা যেমন আদিমভাবে প্রকাশিত তার মধ্যে, তেমনি জয়ার প্রতি প্রেমও উন্মত্তের মতো স্ফূরিত হতে দেখা যায়। জীবিকার

জন্যে পরিশ্রম করতে সে পশ্চাদাপসারণ করবে না কখনো, যে কোন সমস্যাকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে গ্রহণ করতে কোন সময় কুণ্ঠিত নয়। জয়ার প্রশ্ন ছিল প্রেমের, যে-প্রেম তাকে নবজীবন দান করবে। কিন্তু মনোতোষের সঙ্গে গৃহত্যাগের সময় বাঁচাকেই সে প্রেম বলে ভ্রম করল। মনোতোষের সে-অবস্থায় অস্থিরতা আকুলতা একান্ত স্বাভাবিক, যেমন স্বাভাবিক অমিয়র শিয়রে জয়ার উপস্থিতি অথচ মনোতোষ-কে জয়ার নবজীবনদাতা বলে শিরোপা দিতে কুণ্ঠিত নই।

এবং এইসব জীবনের আশ্বাস পেয়েই "গোধূলি" উপন্যাসের নায়িকা ইন্দুলেখা চিন্ময়ের প্রতি আকৃষ্ট হলো। ইন্দুমতী নতুনের আশ্বাসে চিন্ময়ের কাছে প্রায় আত্মসমর্পণ করেছিল কিন্তু চিন্ময় যেদিন তার হাত ধরে সব অপমান থেকে দূরে নিয়ে যাবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল, সেদিন ইন্দুমতী স্বামী অনুপম ও চিন্ময়ের মধ্যে কোন তফাৎ খুঁজে পেল না। জয়ার ছিল রাজনীতিক পটভূমি যার জন্যে সে দুঃসাহসী হতে পেরেছিল কিন্তু ইন্দুমতী জায়া, জননী। তার পক্ষে স্বামী ত্যাগ প্রায় অচিন্ত্যনীয় তাই তাকে জ্বলতে দেখি "দেহ-মন" এর উমার মত। স্বামীর প্রতি বিরূপ অথচ চিন্ময়কে গ্রহণ করতে অক্ষম—এই দো-টানায় ইন্দুমতীর ট্রাজিডি আমাদের মনে এক ঝঙ্কার তোলে, আমরা তখন দর্শক হয়ে পড়ি, অভিযোগ-অনুযোগ সব হার মানে।

নারী চরিত্রের অসহায়তা, বিদ্রোহ সব মিলিয়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্র নারীদের নানা সমস্যা, বিশেষ করে প্রেম-সমস্যা এমন তীক্ষ্ণতায় উপস্থিত করেন, যেখানে পুরুষ চরিত্রের ভূমিকা কিঞ্চিৎ ম্লান হতে বাধ্য। বিভাস, অমিয়, অনুপম—স্বামীর দল প্রায় একই ধরণের, কিছু নিষ্ক্রিয়, কিছু উদাসীন ; যদিও এরই মধ্যে মনোতোষ বিশেষ উজ্জ্বল। এদিকে একটু নজর দিলে বোধ করি ভালো হয়, যদিও মানতে বাধ্য হই একটি সমস্যাকে নানা দিক থেকে আলো ফেলে বিচার করলে, এমন পৌনঃপৌনিকতা অনিবার্য।

"অনুরাগিনী" উপন্যাসে প্রেমের সমস্যার সঙ্গে মিলিত হয়েছে আর্টের সমস্যা। শিল্পী নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, না আপন সত্তা বিলুপ্ত করে দেবে —এ তত্ত্বটি তত্ত্বগত ভাবে উপন্যাসে না থাকলেও তর্ক-বিতর্ক, আলাপ-আলোচনায় নিরূপিত হয়েছে। নায়ক প্রদোষ শিখাকে গ্রহণ করার পর সংসারী প্রদোষে রূপান্তরিত হয় অথচ শিখা শিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠা চায়। সে "কেরিয়ারিস্ট" সংসারে বন্দী থাকতে নারাজ। এই দ্বন্দ্ব "অনুরাগিনী"

উপন্যাসের উপজীব্য কিন্তু বিষয়বস্তু এতই জটিল যে মাত্র একশ কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে বক্তব্যটি উপস্থাপিত করলে সম্পূর্ণতা পায় না। বিষয়টির জন্য পূর্ব-প্রস্তুতি, ভূমিকা রচনার জন্যই অন্তত একাধিক শত পৃষ্ঠা ব্যয়িত হবে। অতঃপর জটিলতা, পরিসমাপ্তি। "অনুরাগিনী" উপন্যাস একটি বৃহৎ উপন্যাসের খসড়া মাত্র এবং লেখক যদি উপন্যাসটিতে শিখা ও প্রদোষের শিল্প ও জীবন, সংসার ও জীবিকার এবং প্রেমের চিত্রটি উজ্জ্বল করে তোলেন তবে আমরা একটি সার্থক উপন্যাসের সাক্ষাৎ পাবো।

॥ ৩ ॥

অবশেষে নরেন্দ্রনাথ মিত্র জীবিকা ও প্রেমের সমস্যা উত্থিত নানা প্রশ্ন এবং জীবিকা ও প্রেমের জটিলতা নিয়ে রচনা করলেন পরবর্তী উপন্যাসগুলি। যা ছিল একটি মানুষের সংশয় ও সংকট, সেই প্রশ্নগুলি পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করলেন মধ্যবিত্ত বৃহৎ প্রেক্ষাপট, কখনও বা একটি যৌথ পরিবারের কাহিনী, আবার সেই সমস্যার জন্য উপস্থিত করতে হলো দুইটি অর্থ অ-সাম্য সমাজ।

"চেনামহল" উপন্যাসে তিনি ভিত্তিভূমি করলেন একটি মধ্যবিত্ত যৌথ পরিবার। মধ্যবিত্ত সমাজ অর্থনৈতিক দৈন্যের কশাঘাতে জর্জরিত এবং আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য সমাজের ভিৎ এমন শিথিল করে দিয়েছে যে মনে হয় সন্তানের প্রতি স্নেহ, প্রেম নির্ভর করে সন্তানের অর্থোপার্জন ক্ষমতার 'পর। অরুণ যখন বেকার অসহায় দিল্লী থেকে ফিরে এলো, পরিবারে তার পূর্ব সম্মান অটুট ছিল কিনা, জিজ্ঞাস্য। অর্থই যেখানে একমাত্র মানদণ্ড এবং সমস্ত সম্পর্কের নিয়ামক, সেখানে অর্থ-দৈন্য-চাপে মানুষের সমস্ত নীতিজ্ঞান বিলুপ্ত করে' করে তোলে সঙ্কীর্ণ, স্বার্থপর। এরই ফলে যৌনবিকৃতি এবং অন্যান্য প্রকারের বিশৃঙ্খলা পরিবারে আঘাত হানবে—এতে আশ্চর্য না হয়ে বরঞ্চ সত্যকে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করাই শ্রেয়।

দুই পরিবারের অবনীমোহন এবং বৈদ্যনাথ আত্মীয়তাসূত্রে একই পরিবারভুক্ত হলেও, অন্তত স্বার্থের সংঘাত যখন উপস্থিত হয় তখন তাদের মতো অনাত্মীয় কদাচ মেলে। এবং আত্মীয়তার মুখোশে এই অনাত্মীয়-তাই বাসন্তী ও কনকলতার কথাবার্তায় কলহে প্রকাশিত। এ-কলহ অনিবার্য কারণে দুটি অ-স্বচ্ছন্দ পরিবারের সহ-অবস্থান এমনি বিপর্যয়ের সম্মুখীন

করে। জামাতা সুবিমলের কক্ষত্যাগের মধ্যে কমকলতার ইঙ্গিতপূর্ণ উক্তি আমাদের সচেতন করে তোলে। তখন মনে হয় অর্থ জীবনের মর্মমূলেও এসে আঘাত হেনেছে। তাই বিভু ও প্রীতির আত্মীয়তা ভ্রাতা-ভগ্নীর গণ্ডি অতিক্রম করে দুটি নর-নারীর হৃদয় সমস্যায় পর্যবসিত হয় তখনও আমরা বিস্মিত হই না। অবশ্য মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সমাজে এ-সমস্যা এতো তীব্রভাবে অনুভূত হতো কিনা জানা নেই, তবু বিভু ও প্রীতির সম্পর্কের জটিলতায় লেখক যথেষ্ট দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন, যদিও আমরা কখনই উভয়ের পরিণতি সম্বন্ধে সন্তুষ্ট নই এবং প্রীতির প্রেমের গভীরতা নিয়েও যথেষ্ট তর্ক উঠতে পারে। অতুল যখন প্রীতিকে নিতে আসে তখন প্রীতির শূন্য ঘরে ফিরে লাভ কি উক্তির মধ্যে বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে কিনা, প্রশ্ন জাগে। আসলে প্রীতি সেই শ্রেণীর নারী, যে-নারী স্বীয় চিন্তা-ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে অক্ষম, পরিপার্শ্বের নির্মমতায় ভীত। যে প্রীতি বিভু ব্যতীত অন্য পুরুষের সাহচর্য গ্রহণে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে. সে-ই কিনা পতিগৃহে সুখে আছে বলতে কুণ্ঠিত হয় না। বস্তুত এইখানেই প্রীতির ট্রাজিডি।

এমন কি শিক্ষিত অরুণ করবীকে ভালোবাসলেও গ্রহনে সক্ষম হলো না। অরুণ মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিভূ। স্বীয় পরিবারের প্রতি অনীহা প্রবল অথচ শুধু চিলেকোঠায় অবস্থানের মধ্যে অথবা করবীকে লেখা শেষ পত্রের চাপা উত্তেজনায় কিছু প্রতিবাদ ব্যতীত সম্পূর্ণ নিরব সে। অরুণ এক্ষেত্রে ভীরু। করবী বিধবা এবং সন্তানের জননী, তাই পরিবারের চোখে অরুণের বিবাহ সমাদৃত হবে না বলেই পিছিয়ে আসে যদিও "অমৃত আমার হাতের কাছে এসেছিল কিন্তু হাত পেতে নিতে পারলুম না" উক্তির মধ্যে অরুণ নিজের অক্ষমতার জন্যে যথেষ্ট অনুতপ্ত হয়েছে বলে মনে হয়; কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, এ-শুধু অরুণের ভান, আসলে মধ্যবিত্তর সমস্ত সংস্কারমুক্ত অরুণ সমাজ বা পরিবারকে আঘাত দিতে চায় না। এরই মধ্যে সে কোন মতে সৎ এবং ভালো (?) ছেলে বলে পরিচিত হতে চায়। অথচ অতুলের উজ্জ্বল উপস্থিতি তার বলিষ্ঠতায় নির্ভীকতায় অতুলের মিল পাই মনতোষের সঙ্গে যে সব কিছুকে গ্রহণ করতে কখনও কুণ্ঠিত নয়। "সন্তুদয়া" উপন্যাসে লেখক বিস্তৃত পটভূমি নির্বাচন করেছেন। সুরপতি সামান্য অবস্থা থেকে দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের সর্বেসর্বা হয়েছেন কিন্তু উপরে উঠে আসার পরই

সুরপতি পুরোদস্তুর "বুর্জোয়া" হয়ে পড়েন। "সব মানুষ মানুষ নয়। তাদের যাচাই করে নিতে হয়। বাজিয়ে নিতে হয়।" এই নির্বাচনের জন্য তিনি ব্যাঙ্ক বন্ধ করতে অথবা কন্যা সুজাতার প্রণয়াস্পদকে হত্যা করতে কুণ্ঠিত নন; সুরপতি ডিপ্লোমাট—এক একটি চালে এক একজনকে মাৎ করতে তিনি সিদ্ধহস্ত। অস্থির অবনীমোহনকে বশে রাখেন মিষ্টি কথার মোড়কে, অন্যদিকে অসিতের প্রতি বিরক্তি দমন করেন অতি সুকৌশলে। তাই তার ব্যক্তিত্ব নানা খণ্ডে বিভক্ত—এক এক পরিবেশে এক এক রকম। সুরপতি বর্তমান ধনবাদী সমাজব্যবস্থায় একটি সুন্দর প্রতিমূর্তি—এবং বোধ করি এমন ভিলেন চরিত্রের সাক্ষাৎ বাংলা সাহিত্যে কদাচ মেলে।

তবু লেখক "সহৃদয়া" উপন্যাসে আমাদের কিঞ্চিত হতাশ করেছেন। হতাশ করেছেন ঔচিত্য বোধের অভাব ঘটিয়ে। এবং এই অভাবের জন্য উপন্যাসটির সমাপ্তি ঘটে অতি নাটকীয় ভঙ্গিতে। "চেনামহল" উপন্যাসে প্রীতি বিজু, করবী অরুণ, রমা-অতুল এর প্রণয় আখ্যান অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ। "সহৃদয়া" উপন্যাসের শুরুতেই লক্ষ্য করি নায়িকা সুজাতা অবনীর প্রতি বিতৃষ্ণ। এই বিতৃষ্ণা কেন অবশ্য লেখক পরে সে কারন বর্ণিত করেছেন কিন্তু মাত্র এইটুকুর মধ্যে সুজাতা অবনীকে বিচার করার মধ্যে ঔচিত্যবোধের অভাব লক্ষিত হয়। এমনকি সুজাতা অসিতের প্রনয়োদ্দামও অতি মসৃণ রূপে অঙ্কিত। লেখকের অতিব্যস্ততার জন্য উপন্যাসটির শেষরক্ষা হয়নি যদিও এ-উপন্যাস নানা কারণে একটি বলিষ্ঠ উপন্যাস বলে বিবেচিত হতে পারত।

অন্যপক্ষে "শুক্লপক্ষ" উপন্যাসে মধ্যবিত্ত সমাজের অস্থির রূপটি প্রকটিত। সমাজের স্নায়ু শিথিল হয়ে গেলে অথবা স্নায়ু চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পেলে মানুষের অস্থিরতা যে বিকৃতির জন্ম দেয় এই সমস্যাটি "শুক্লপক্ষ" উপন্যাসের উপজীব্য। লেখকের কৃতিত্ব এইখানেই যে তিনি বিকৃতি-ব্যাখাতা নন, সেই বিকার থেকে সমাজের সুস্থ দৃষ্টি লাভের জন্য উন্মুখ। তাই বিকারগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে শৈলেন্দ্রনাথকে "ইউটোপিয়ান" বলে মনে হয়। সেবা স্বাভাবিকতা এবং সুস্থতা লাভে ব্যগ্র হয়ে উঠলেও বার বার অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়। মধ্যবিত্ত সমাজের আলেখ্য "শুক্লপক্ষ" উপন্যাসে এমন এক দ্বার উন্মোচন করল, যে দ্বারে দৃষ্টি পড়লে আমরা সচকিত হতে বাধ্য। মুখে যতই উদার বুলি আওড়াই না কেন, আমরা যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও সংকীর্ণমনা একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে।

বস্তুত "চেনামহল" "সহৃদয়া" এবং "শুক্লপক্ষ" উপন্যাসে নরেন্দ্রনাথ মিত্র একটি নতুন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন, যার সার্থক রূপায়ন সম্ভব হয়েছে "চেনামহল" উপন্যাসে। "শুক্লপক্ষ" উপন্যাসের কলেবর ক্ষুদ্র হলেও "সহৃদয়া" উপন্যাসের চেয়ে সার্থক ও সম্পূর্ণ। অথচ এই তিনটি উপন্যাসের মধ্যে "সহৃদয়া" উপন্যাসটি বক্তব্য, কলাকৌশলে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে বিবেচিত হতে পারত। লেখক-কে অনুরোধ জানাতে পারি অন্তত "চেনামহল"-এর দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি যেন উক্ত উপন্যাস সংস্কারে মনোযোগী হন।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বক্তব্যের পরিধি বিস্তৃত নয়, এ কথা স্বীকার্য। কিন্তু স্বল্প পরিসর বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত জীবনের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ও কুশলী দৃষ্টির পরিচয় আমরা যে কোন উপন্যাসে স্পর্শ করি। "নেহমন" "সঙ্গিনী" অথবা "গোধূলি"র সমস্যাগুলি বহু সময় আরোপিত। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ মিত্র সেখানেই সার্থক, যেখানে তিনি মধ্যবিত্ত সমাজ-কে সম্পূর্ণরূপে নাটকের আবহ সঙ্গীতের মত লিপিবদ্ধ করেন। আমরা সে-সুরারোপ উপলব্ধি করি কিন্তু কদাচ তা সোচ্চার। তার জন্যে তিনি একটি বিষয়-কে নানাদিকের আলোকে প্রতিফলিত করেন। নানা প্রেক্ষিতে স্থাপনা করে বিচারে ইচ্ছুক। এ ঘটনা বিশেষ দুর্লভ, কারণ এমন অন্বেষণে ফাঁকি নেই, বরঞ্চ জিজ্ঞাসার ব্যাপ্তি ও সীমা ক্রমেই ব্যক্তি-জীবন পরিত্যাগ করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রবেশ করে। "চেনামহল", "সহৃদয়া" প্রভৃতি উপন্যাসে এই ক্রমিক উন্নতি আমাদের আশ্বস্ত করে। তিনি সর্বদাই উত্তরণে প্রয়াসী, তাই "চেনামহলের" পারিবারিক পটভূমি, "সহৃদয়া"র বিস্তৃত। "চেনামহল" উপন্যাসে লেখক আর্থিক অস্বচ্ছলতা, অবক্ষয়ী সমাজের স্বরূপ অতি নিপুণভাবে নেপথ্যে উপস্থিত করেছেন এবং নিয়তির মতই এ সমাজ যে এমন বিকৃতি সৃষ্টি করেছে—একথা প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন। "সহৃদয়া"র বিপর্যয় সত্ত্বেও নরেন্দ্রনাথের অভিষ্ট গভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

তবু আমরা আশা করবো "চেনামহল"এর স্রষ্টার অভিজ্ঞতার দিগন্ত বিস্তৃত হোক এবং "দ্বীপপুঞ্জ" উপন্যাসের গ্রাম্য-জীবন, উপনগরের শ্রম-অঞ্চল আবার তাঁর উপন্যাসে ভাস্বর হয়ে উঠুক। বৈচিত্র্যের মধ্যে ক্ষমতার পরিচয় নেই, ক্ষমতার পরিচয় আছে অভিজ্ঞতার তন্নিষ্ঠ প্রয়োগে, অন্বেষার গভীরতায় এবং সামাজিক চেতনার তীক্ষ্ণতায়। আমরা তাঁর পূর্ণতম বিকাশের অপেক্ষায় থাকবো।

আলোচনা
সাহিত্য

যে-আঁধার আলোর অধিক : বুদ্ধদেব বসু : এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা ১২ ॥

একটি পরিবর্তন সহজেই চোখে পড়ে। চোখে পড়ে এই জন্য নয় যে আলোচ্য গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই সনেট। সনেট বুদ্ধদেব বসু এর আগেও অনেক লিখেছেন। কিন্তু সেগুলির জাত ছিল আলাদা ; সেগুলি ছিল, তাঁর তৎকালীন অন্যান্য রচনার মতোই, লবনগন্ধ। সে-উচ্ছ্বাস, উদ্দামতা আর নেই। তরঙ্গভঙ্গ স্তিমিত হ'য়ে এসেছে। বুদ্ধদেব বসু সমুদ্র থেকে হ্রদে এসে পৌঁচেছেন।

তাই, স্বভাবত:ই, আলোচ্য গ্রন্থের কবিতাগুলি অনতিব্যক্ত ; প্রগাঢ় তথা ঘনসংবদ্ধ। আবেগ এখানে চিন্তার বশীভূত। কবিতাগুলির গড়ন, সুতরাং, অনেকটাই প্রবন্ধের ; এবং পদক্ষেপ, বহুল যতিচিহ্নের দ্বারা, অন্তর লক্ষ্যাভিমুখী। লক্ষ্যটা যেহেতু শব্দের এবং অর্থের দ্বন্দ্বাতীত যথোপযুক্ততায় পৌঁছনো, তাই, এমনকি প্রথাসিদ্ধ ছন্দের খাতিরেও, বক্তব্যকে অযথা বিস্তারিত হতে দেওয়া হয়নি। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি :

শেষ, না আরম্ভ মাত্র ; কৈবল্য, না কুমারসম্ভব :
কেননা মহাকালের নৃত্যে নেই ভাবী ও সম্প্রতি

•

—'কিন্তু কোনখানে ?' হায়, সনাতন, শীর্ণ কৌতূহল !
বোঝে না, অনবরত অবসানে আরম্ভ গতির

•

বাসনা অপরিসীম, কিন্তু কত দুর্বল ইন্দ্রিয় !
হ'য়ে থাকি বধির, যতক্ষণ চক্ষু শ্রীয়মাণ

উদ্ধৃত অংশের শেষ পঙ্‌ক্তিগুলি নিশ্চয়ই প্রচলিত শাস্ত্রসম্মত নয়। 'কেননা মহাকালের' এবং 'বোঝে না অনবরত'—গুণতিতে ঠিক আছে। কিন্তু অক্ষর-বৃত্তে ৩।২।৩ মাত্রা, রবীন্দ্রনাথ 'রাতের লতাবিতান' লেখা সত্ত্বেও, চালু হয়নি। 'হ'য়ে থাকি বধির'-এ দৃশ্যত ১-মাত্রা কম রয়েছে। মজা এই যে, শাস্ত্রবিরোধী বলেই হয়ত, উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে তিন রকমের একটা স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, একটা অদৃশ্য সীমায় এসে গদ্য-পদ্য বাহুবদ্ধ হয়েছে। আরেকবার প্রমাণ করেছে যে, অক্ষরবৃত্ত অত্যন্ত ঘাতসহ ছন্দ। এই ছন্দে উচ্চারণের অবাধ সঙ্কোচন এবং প্রসারণ সম্ভব বলেই 'হ'য়ে থাকি'-কে ৩-মাত্রায় সংক্ষিপ্ত করা অথবা 'বধির'-কে ৪-মাত্রায় টেনে নিয়ে যাওয়া দুরূহ নয় এবং সেই জন্যই নিম্নের বাক্যগুলি রচিত হতে পারে :

মেয়েদের হাসির প্রস্রবণ শুনবে না আর।

অথবা

আমাকে দিয়ো না দৃষ্টি। বিচ্ছেদে ভ'রে আছে মন।

অথবা

সব নয় ক্রন্দন, আক্রমণ, বৃন্দাবনে মান-অভিমান।

বলা বাহুল্য, নিছক ছন্দের কেরামতি দেখানো বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্য নয়; সে-ছেলেমানুষী তাঁর একেবারেই অনভিপ্রেত। বাংলা কবিতার স্বাভাবিক ঝুমঝুমুনি ভাব থেকে সজ্ঞানে দূরে সরে এসে বক্তব্যকে সরাসরি সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত করার দরকারেই তাঁকে মনের মতো ক'রে ছন্দকে ঢেলে সাজাতে হয়েছে। তা না হলে, এমন বাহুল্যবর্জিত পঙ্‌ক্তিগুলি কিছুতেই জন্মলাভ করত না :

যীশু কি পরোপকারী
ছিলেন, তোমরা ভাবো? না কি বুদ্ধ কোনো সমিতির
মাননীয়, বাচাল, পরিশ্রমী, অশীতির
মোহগ্রস্ত সভাপতি?

সন্দেহ নেই, কোনো প্রথাবাধ্য কবি 'মাননীয়, বাচাল, পরিশ্রমী, অশীতির' লিখতে সাহসী হতেন না। কানুন রক্ষার প্রয়োজনে তাঁকে হয়ত 'পরিশ্রমী'র জন্য প্রতিশব্দ খুঁজতে হত। অথচ, 'পরিশ্রমী' শব্দটাকে কি ৫-মাত্রায় উচ্চারণ করা সম্ভব নয়? সম্ভব তো বটেই, এমনকি, মনে হয়, ঠিক ওই শব্দটি না

থাকলে, বাক্যটিতে কবির অভিলক্ষিত গদ্যের কাঠিন্য তথা কথোপকথনের স্বাচ্ছন্দ্য আসতনা। এমনতর দৃষ্টান্ত একাধিক উপস্থিত করা যেতে পারে। ধরা যাক—

শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত, বর্ষার দিন আমি এতদিনে
তোমাদের বিরাট খামখেয়াল জয় ক'রে, হৃদয় সন্ধ্যায়
নিয়েছি সুযোগমুক্ত, হৃতভাগ্য শূন্যতারে চিনে—

প্রথাবাধ্য কবি দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটি লিখতে নিশ্চয়ই ইতস্তত করতেন। অথচ, ৪।৮।৪।৬ মাত্রায় বিভাগ করা সম্ভব বলেই শুধু নয়, যেমনভাবেই পড়ি না কেন, বাক্যটিতে আশ্চর্য একটা ঋজুতা এসেছে, যেমন এসেছে

এতে নয় জড়িত জনগণের বিরাট নিয়তি

কিংবা

বছরের ঢেউয়ের ঝাপসা ফেনা পার হ'য়ে এলো

ইত্যাদি এই গ্রন্থের অজস্র পদসমষ্টিতে। বলাই বাহুল্য অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রথমাংশের প্রচলিত ৮ মাত্রাকে ভেঙে ফেলাতেই এই সব বাক্য জন্মলাভ করেছে : এবং রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'তে এ-সম্ভাবনা উপ্ত ছিল।

শুধু ছন্দেই নয়, মিলের শৃঙ্খল থেকেও বুদ্ধদেব স্বাধীন হবার চেষ্টা করেছেন। এক-মাত্রার মিল এই গ্রন্থে অজস্র ছড়িয়ে রয়েছে : যেমন, 'পারি না'র সঙ্গে 'ঝরণা' এবং 'করুণা'র ; 'টেবিলে'র সঙ্গে 'গেলে'র ; 'বোঝেনি'র সঙ্গে 'বন্ধনী'র ; 'করেনি'র সঙ্গে 'যামিনী'র ; 'অনলে'র সঙ্গে 'হলে'র ; 'ফুরালো'র সঙ্গে 'ঘুলো'র ; 'হ'য়ে 'যা'র সঙ্গে 'বোঝা'র ইত্যাদি। শেষের দৃষ্টান্তটি মনে রাখবার মতো কুশলী নয় কি ? এবং গোপন মিলনের দৃষ্টান্তও এ-গ্রন্থে চোখে পড়ে : যেমন : 'নেও'-এর সঙ্গে 'বিনয়'। কিন্তু ছন্দেও যেমন, মিলেও তেমনি কবির আসল উদ্দেশ্য বক্তব্যের সহজ, সরল, নির্ভার উপস্থাপনা।

বুদ্ধদেব বসু আত্মকেন্দ্রিক কবি। এখানেই তাঁর সবলতা এবং দুর্বলতা ; কেননা এখানেই তিনি বিশিষ্ট। তাঁর জগৎ একান্তভাবেই একজন কবির জগৎ ; তাঁর চিন্তা এবং সমস্তাও, তাই শিল্পী এবং শিল্পগত। ছোটো, কিন্তু সুসম্পূর্ণ তাঁর চিত্রপট ; তাঁর অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ কিন্তু বিশুদ্ধ। স্বভাবতই বুদ্ধদেব বসু বিশ্বাস করেন যে, 'শুধু তা-ই পবিত্র, যা ব্যক্তিগত।'

উদ্ধৃত বিবৃতির ভিন্নতর অর্থ যা-ই হোক না কেন, এ-কথা ঠিকই যে

ব্যক্তিগত অনুভূতিতে আরিত না হলে কোনো অভিজ্ঞতাই কবিতা হ'য়ে উঠতে পারে না। এবং যে-অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগত অনুভূতিতে সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে, কবির কাছে তা অবশ্যতই পবিত্র, কেননা তা-ই একমাত্র তাঁর উপজীব্য। কবিতাই বুদ্ধদেব বসুর জীবনের তীব্রতম অভিজ্ঞতা, তাঁর সার্বিক অস্তিত্ব। সুতরাং তিনি যখন কবিতার উপরেই কবিতার পর কবিতা লিখে চলেন, তখন, মনে রাখতে হবে যে, কবিতা তাঁর কাছে শুধুমাত্র শব্দের অর্থময় ছন্দ কিংবা রসাত্মক বাক্য নয়

হ্লাদিনী, ব্যাধির বীজ, উন্মাদক, নিষ্ঠুর, অসুখী,
সরস্বতী, ভেনাস, ক্ষণিক লক্ষ্মী, অনন্ত বাসুকি

অর্থাৎ সর্বতোব্যাপ্ত একটা আবেগ। অতঃপর বুদ্ধদেবের কৌতূহল সীমাবদ্ধ বলে আক্ষেপ করার কিছু থাকে না।

অরুণকুমার সরকার



কবি ও কবিতা মেলা

ইদানীং এদেশে অন্য দেশের মতো অনেকগুলো সাহিত্য ও শিল্প সংস্থা গড়ে উঠেছে। সাহিত্যিক এবং কবিরা স্বভাবতঃ নিজেদের গণ্ডীর বাইরে সমাজে প্রাণখোলা গল্পগুজবে মাততে পারেননা। না পারেন তাদের ভাব ভাবনার সম্যক সমাদর ও সমর্থন পেতে। যদিও শিল্পী মাত্রেরই তাদের শিল্প-বস্তুকে সমাজের মধ্যে উপস্থিত করে দিলেই সেটা সমাজের রুচি দ্বারা আদৃত বা অনাদৃত হল কিনা সেটা মারাত্মক রকমের গ্রাহ্য চিন্তা হয়ে দাঁড়ায়। তবুও একথা কখনো ভুলে থাকা যায় না যে রসবস্তু কেবল রসিক ব্যক্তির ভাবনাতেই লালিত হয়, অন্যথায় নয়। বস্তুতঃ কবিরা আজকের দিনের একটা জরদগব সমাজে বাস করছেন এবং এ সমাজের সকলেই রসিক নন। মোটা ভাবনার গল্প বা গদ্য সাহিত্যের আজ যত চাহিদা কবিতার ততখানি নয় এবং এই ঘটনা কবিদের একাকিত্বকে প্রকট করে তুলেছে।

যেহেতু কবিদের শিল্পবস্তু একমাত্র কবিদের মধ্যেই গ্রাহ্য সে কারণে কবিরাও এদেশে 'কবিতা মেলা' নামে একটি সংস্থা গড়ে তুলেছে। কবিতায় যাঁরা লেখেন না অথচ যাঁরা কবিতার একনিষ্ঠ পাঠক তাঁরাও কবিদের সঙ্গ লাভে আগ্রহী এবং এঁরাও কবিদের সংস্থার সমর্থক।

কলকাতায় ১৯৫২ সালে কবি এবং কবিবন্ধু রাজপথে যে কবিতা পাঠের সূচনা করে' সমস্ত দেশের বিস্ময় প্রশংসা অর্জ্জন করেছিলেন তারই ফলে 'কবিত মেলা'র প্রতিষ্ঠা হল। ১৯৫৬ সালের মে মাসে রবীন্দ্র ভারতীতে কবিতা মেলার প্রথম বৎসরের অধিবেশন হয় এবং কেবলমাত্র কবিদের সংস্থার এরূপ অধিবেশন ভারতবর্ষে কেন সারা পৃথিবীতে আর একটিও হয়েছে বলে শোনা যায় নি।

বাংলা দেশের এ গৌরব তার আরও অনেক ঐতিহ্যের সঙ্গে একদিন যে

যথাযথ স্থান পাবে সেটা নিঃসন্দেহ। 'কবিতা মেলা'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের অধিবেশন স্পষ্ট প্রমাণ করেছে যে হুজুগ বা সম্মেলন বাতিকটা কবিতা মেলাকে স্পর্শ করেনি। কবিদের শান্ত অথচ গর্বিত এক সত্তার সঙ্গে কবিতা মেলা একটি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে উঠেছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল কারিগরী যুগটা যে কবিদের অস্তিত্বকে অনেকখানি জটিল করে তুলেছে তাঁদের প্রতিভার অসামান্যতা সে কারণে যে অনেকখানি ধার খুইয়েছে সেটা এ প্রসঙ্গে বলাটা হয়ত অবান্তর হবে না। মহৎ কবি বা কবিতার সম্ভাবনা আজকের কবিতায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কিন্তু এটাও কম আশার কথা নয় যে এই স্থূল গৃধ্নু হৃদয়হীন কালেও বাংলা দেশের কাব্যচর্চা নূতন নূতন লক্ষণে চিহ্নিত হল।

কবিসত্তা যে সমাজের শ্রেষ্ঠ মননের অধিকারী একথাটাও আজ আর ফিস ফিস করে বলতে হয় না। এমন একটা ভয়াবহ কালের কথা ভাবাও যায় না যখন রাষ্ট্র বিরোধ কূটনৈতিক ঠাণ্ডা লড়াই, বিজ্ঞানের মারাত্মক অগ্রগতি, অভাব ও প্রাচুর্য্যের বিকার, প্রভৃতি জীবনের জগদ্দলগুলি মানুষের অতি মহৎ ও সুন্দর ভাবনাগুলিকে কেড়ে নেবে। তখন হয়তো সত্য সত্যই কবিতার মৃত্যু হবে। ইতিমধ্যে সে বিষয়ে কবিরা যে ভাবিত নন সেটাও নয়, কিন্তু আগেই বলেছি এইসব ক্ষয়িষ্ণু লক্ষণগুলি কবিদের মনকে অনেকখানি অক্ষম করে তুলেছে। এই প্রসঙ্গে আমার কয়েকটি ভাবনার কথা লিখছি।

(১) কবিতা মেলার সার্থকতা হয়তো সেটুকু যতখানি এই সংস্থা কবিদের সৃষ্টিকর্মে সফলতা ও অসার্থকতা বিচার করতে সক্ষম হবেন। আত্মপ্রচারের চেয়ে সংবেদনার সফলতম পরিবেশনার অনুকূল একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতেই কবিতা মেলার প্রয়োজন অনেক বেশী। দুর্ভাগ্যতঃ এটা লক্ষ্য করা গেছে কিছু কিছু তরুণ কবি নিজেদের রচনা সম্পর্কে উদ্ধত আত্মসন্তুষ্টি বোধ করেন। আত্ম-সচেতন হওয়ার অর্থ এই নয় যে আত্মসমালোচনার প্রয়োজন একেবারেই নেই। কবিতামেলা এই সমালোচনার সূত্রপাত করতে পারেন; অবশ্য এই সমালোচনা সহৃদয়তা সহ সম্পন্ন হবে যে এটা বলাই বাহুল্য।

(২) কবিতামেলার অধিবেশন সহর বা যন্ত্রশিল্প অধ্যুষিত এই কলকাতা নগরীর আশপাশে না করে প্রকৃতি যেখানে এখনও বিস্তৃত সেইসব গ্রামাঞ্চলে করাটাই যুক্তিযুক্ত।

পরবর্তী বৎসরের অধিবেশনটি শান্তিনিকেতনে হলে কবিতামেলার উপরোক্ত

উদ্দেশ্যটি অনেকটা সাধিত হলে পারে। এজন্য উদ্যোক্তাদের এখন থেকে কাজ সুরু করতে হবে।

(৩) রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের একটি সরকারী কর্মসূচী ঘোষিত হয়েছে। কবিতামেলার সংগঠন শক্তিতে হয়তো সরকারী সমকক্ষতা নেই—না আছে তার আর্থিক সচ্ছলতা, তবু রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কবিতামেলার উপর পবিত্র দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। কবিতামেলা রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীকে কবিদের একটি সার্থক উৎসবের রূপ দিতে পারে তার জন্য এখনি একটি কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের বহু আলোচনা হয়েছে সেসব লেখার অনেকখানি স্কুলপাঠ্য ভূমিকা ছাড়া বিশেষ কিছু হয়ে উঠেনি। কেবলমাত্র কবিরাই হয়ত এ বিষয়ে একটি দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের অপরিমেয় প্রতিভার সম্যক রূপায়ণ হয়ত এযুগে সম্পন্ন হবে না। তবুও 'কবিতা মেলা' এ বিষয়ে যোগ্যতরভাবে কাজ করবার জন্য একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারে।

এ কাজে 'কবিতা মেলা'র একটি মুখপত্র প্রকাশনার প্রয়োজনও আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়

আলোচনা

বিদ্যাসুন্দর কাব্যে নারীগণের পতিনিন্দা

শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায় মহাশয় বিগত সংখ্যা 'উত্তরস্থরী'তে ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর" কাব্যে নারীগণের পতিনিন্দা নামক যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি তাঁহার আলোচনা প্রসঙ্গে যে আমার 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' বইখানির উল্লেখ করিয়াছেন, সেজন্য তিনি আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। তাঁহার আলোচনা সম্পর্কে আমার কয়েকটি বলিবার আছে, তাহা এখানে সংক্ষেপে নিবেদন করি।

আমি আমার 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'এ এ-কথা উল্লেখ করিয়াছি যে মঙ্গলকাব্যে নারীদিগের পতিনিন্দার বিষয়টি সংস্কৃত সাহিত্য হইতেই আসিয়া থাকিবে; ইহার কারণ প্রমাণস্বরূপ আমি 'কাদম্বরী'তে গুরুগৃহ প্রত্যাগত চন্দ্রাপীড়কে দেখিয়া বিদিশা নগর-রমণীগণের আলাপের কথা উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় ইহার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন যে 'সে আলাপে কোথাও পতিনিন্দা বা স্বামী দুর্ভাগ্যের কথা নাই, কেবলমাত্র সমবয়সী যুবতী-গণের মধ্যে চন্দ্রাপীড়ের রূপদর্শনে সাত্ত্বিক রসের উদ্রেক লইয়া উপহাস আছে।' পরপুরুষের রূপ দেখিয়া নারীর সাত্ত্বিক রসের উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক না হইতে পারে, কিন্তু সেই সাত্ত্বিক রসের মধ্যে যদি 'উপহাসে'র মনোভাব থাকে তবে তাহাই ক্রমে অবনমিত (degenerated) হইয়া পতিকেও আঘাত করা অস্বাভাবিক নহে। সুতরাং মনে হয়, সংস্কৃত সাহিত্যের এই সাত্ত্বিক রসটিই বাংলার সমাজ-জীবনের এক নৈতিক অধঃপতিত যুগে নারীর পতিনিন্দার রূপ লাভ করিয়াছে। সুতরাং ইহার মূল ভাবটি যে সংস্কৃত সাহিত্য হইতেই আসিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বিদ্যাসুন্দর বা কালিকা-পুরাণ রচনার দুইটি সুস্পষ্ট ঐতিহ্য (tradition) ছিল, একটি পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্য, অপরটি পূর্ববঙ্গের; তবে পূর্ববঙ্গের ঐতিহ্যটি

প্রধানতঃ চট্টগ্রাম অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ববঙ্গের বিদ্যাসুন্দরের ঐতিহ্যে নারীদিগের পতিনিন্দা নাই, কেবল-মাত্র পশ্চিমবঙ্গেই এই ঐতিহ্যটি গড়িয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য ইহা হইতে এ কথা মনে করা সঙ্গত হইবে না যে পূর্ববঙ্গের পতিগণ আদর্শ চরিত্র ছিলেন, পশ্চিম-বঙ্গের পতিগণ তদ্রূপ ছিলেন না বলিয়া পত্নীর নিন্দাভাজন হইয়াছেন। দেখা যায়, যে-অঞ্চলে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব বেশী, সেই অঞ্চলেই পতিনিন্দার বাড়াবাড়ি। মঙ্গলকাব্যের মূল কাহিনীর ধারায় ইহার যে কোন স্থান ছিল না, তাহা প্রাচীনতর মনসামঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে ইহার অভাব হইতেও বুঝিতে পারা যায়। মঙ্গলকাব্যগুলির উপর সংস্কৃত প্রভাব পরবর্তীকালেই অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই অত্যন্ত উৎকট আকার লাভ করিয়াছিল, সেইজন্য পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যেই পতিনিন্দায় নারীগণের উদ্দাম উল্লাস দেখিতে পাওয়া যায়।

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে দুই শ্রেণীর উপাদান পাওয়া যায়, প্রথমতঃ লোক-সাহিত্যের উপাদান, দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত সাহিত্যের উপাদান। লোকসাহিত্যের উপাদানকে ভিত্তি করিয়া সংস্কৃত কাব্যপুরাণের উপকরণ দ্বারা মঙ্গলকাব্যগুলি গঠিত হইয়াছে। নারীদিগের পতিনিন্দার বিষয়টি বাংলার লোক-সাহিত্যে কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না। মঙ্গলকাব্যের বারমাসী প্রমুখ রচনা মঙ্গলকাব্য ব্যতীতও যেমন স্বাধীন লোক-সঙ্গীত রূপে প্রচলিত আছে, পতিনিন্দা তেমন নাই। সেই জন্যই বুঝিতে পারা যায়, ইহা লোক-সাহিত্য হইতে আসে নাই, সুতরাং ইহা সংস্কৃত সাহিত্য হইতেই আসিয়াছে, এ কথা মনে করাই স্বাভাবিক। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় অভিযোগ করিয়াছেন যে আমি আমার উক্ত গ্রন্থে পতিনিন্দা বিষয়ক আলোচনায় 'বাস্তবকে উপেক্ষা' করিয়াছি। কিন্তু তিনি নিজে একথা চিন্তা করিয়া দেখেন নাই যে বিষয়টি আগাগোড়াই অবাস্তব। কারণ, প্রত্যেকটি পতিনিন্দার বর্ণনাই পুরুষ অর্থাৎ কোন না কোন পতিরই রচনা, কোন নারীর রচনা নহে; সুতরাং ইহাদের মধ্যে নারীমনের অন্তর্গূঢ় অনুভূতির বাস্তব পরিচয় কতদূর প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা কে বলিবে? বিশেষতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রায় প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যই পতিনিন্দায় সতীর দেহত্যাগের বৃত্তান্ত দিয়াই আরম্ভ হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের মধ্যেও ইহার কিছু মাত্র ব্যতিক্রম নাই। সুতরাং যে কাব্যের একাংশে

পতিনিন্দায় নারীর দেহত্যাগের বর্ণনা ও অপর অংশে নারীগণের পতিনিন্দা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহার স্ত্রীচরিত্র আনুপূর্বিক বাস্তবধর্মিতা রক্ষা পাইয়াছে বলিয়া মনে করা কঠিন। মঙ্গলকাব্য নারীগণের পতিনিন্দার প্রসঙ্গ সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণ-জাত একটি বহিরঙ্গগত রীতিহিসাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এক অধঃপতিত সমাজ-জীবনের আদর্শভ্রষ্ট পুরুষেই এই গতানুগতিক (conventional) রচনায় নারীজীবনের এত বড় একটা সমস্যার কোন বাস্তব পরিচয় প্রকাশ পাইতে পারে নাই। কালক্রমে মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে নারীগণের পতিনিন্দা একটি গতানুগতিক রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ভারতচন্দ্ররায়ই প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গের কবিগণের আদর্শ হইয়াছিলেন, পূর্বাচরিত রীতির মুখ রক্ষা এখানে যতখানি লক্ষ্য হইয়াছে, প্রত্যক্ষ ও বাস্তব জীবন এখানে তত লক্ষ্য হইতে পারে নাই। বরং নারীদিগের পতিনিন্দা অপেক্ষা পতির চিতাশয্যা পার্শ্বে শয়ন করিয়া জলন্ত অগ্নিতে আত্মাহুতি দান করা সে যুগে নারীর জীবনে অধিকতর বাস্তব ছিল, ইতিহাস তাহার পরিচয় রক্ষা করিয়াছে। সুতরাং পুরুষের রচিত মঙ্গলকাব্যের একটি নিষ্প্রাণ ও গতানুগতিক রচনার আঙ্গিক হইতে নারীমনের সুগভীর একটি অনুভূতির পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব নহে।

শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, নারীগণের পতিনিন্দার মধ্যে কবিদিগের 'নির্যাতিতা নারীর স্বপক্ষে মর্মবেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে।' কিন্তু তিনি যে সকল উদ্ধৃতি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা যে 'মর্মবেদনা'র ভাষা নহে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, ইহা নিতান্ত কৌতুকের ভাষা। সামাজিক অধঃপতনের দুর্গতির মধ্যে ইহার পৌরুষ যখন লুপ্ত হইয়া যায়, তখনই নারী সম্পর্কে পুরুষের হীন কৌতুকবোধ জাগ্রত হয়, কিন্তু নারী সকল দুর্গতির মধ্যে নিজের শক্তিতেই আত্মরক্ষা করে, তাহা না হইলে সমাজ সংসার পরিবার ধর্ম কিছুই রক্ষা পাইত না। শ্রীযুক্ত রায় লিখিয়াছেন, 'ভারতচন্দ্র মনস্তত্ত্ব বুঝিতেন।' কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্য যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এ কথা বলিবেন না; ভারতচন্দ্র দেহতত্ত্বের কবি, মনস্তত্ত্বের কবি নহেন। বীরবল বলিয়াছেন, ভারতচন্দ্র 'হাস্যরসের কবি।' জীবনের উপরিস্তর অতিক্রম করিয়া ভারতচন্দ্রের দৃষ্টি ইহার গভীরতম তলদেশে পৌঁছাইতে পারে নাই। একথা বাংলাসাহিত্যের সমালোচকগণ একবাক্যেই স্বীকার করিয়াছেন। পতিনিন্দার

manners for satire. His reference to bad taste and the examples by which he illustrated this were particularly useful. These examples viewed against the background of the best creations of the European satirists underline the fact that satire calls for sophistication and tolerance and good taste. Without these elements it is possible for writers to indulge in invective, to be vituperative, but not to write satire. There is another point perhaps which can be mentioned in this connection. Good satire postulates a degree of objectivity in the writer. Where he identified himself too closely with an object or a cause and allows himself to be worked up into a real passion, the upshot is likely to be a tirade without that touch of humour which constitutes the essence of satire.

Mr. Jyotirmoy Guha Thakurta made a valid point in the course of the discussion when he pointed out that what the East Pakistani writers lacked was a world vision, a philosophy in the light of which to judge values. If the purpose of satire is to attack vice and folly, this can only be done with reference to a scale of positive values in which the writer believes. If the writer has not clearly articulated views on man and society (and man in society is the real subject of satire) —his criticism would necessarily be unconvincing and sketchy. Without mentioning it specifically, this was the real flaw in East Pakistani satire that both Mr. Momen and Mr. Karim were driving at. It goes without saying that a satirist like any other writer has to be a skilled craftsman.

Dr. Shahidullah and Dr. Enamul Huq in their comments drew attention to the disadvantages arising from the lack of a scientific bibliography of Bengali literature. They maintained that discussions on literature, whether on satire or any other form, would improve in quality if such a bibliography could be prepared and made available to the public.

পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রনীতিতে যত অস্থিরতা থাকনা কেন বাংলা ভাষার শিল্পশৈলী নিয়ে এদেশে যে গভীর ভাবনার অন্ত নেই সমকালীন সাহিত্যে সে কথাটি স্পষ্ট হচ্ছে।

সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক টেম্পল প্রেস, ২, ন্যায়রত্ন লেন, কলিকাতা ৪ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।